মানুষের মন ও শিক্ষাপ্রসঙ্গ

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ, এম. এ.

নলেজ হোম
৫৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
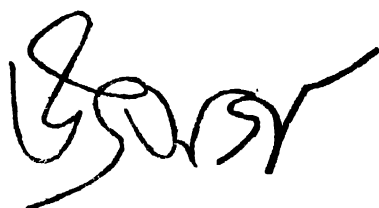
খ্যাতিমান্ শিক্ষাব্রতী, শিক্ষকদরদী, নির্ভীক, স্পষ্টবাদী যোদ্ধা, বন্ধুবৎসল, কর্তব্যবুদ্ধিতে অবিচল, নিরলস অক্লান্ত কর্মী সাধু পুরুষ শ্রীযুত মহীতোষ রায় চৌধুরী মহাশয়কে—শ্রদ্ধার সহিত এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানা উৎসর্গ করিলাম।

৭ জে, এস্ আর দাশ রোড
কলিকাতা-২৬

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ

ভূমিকা

গত পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে শিক্ষা জগতে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। 'শিশু শিক্ষা' এখন একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকা, প্রত্যেক বাপ মা, প্রত্যেক অভিভাবক অভিভাবিকা, শিক্ষাকে নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়ে দেখতে সুরু করেছেন। তাঁরা চিন্তা করছেন কি উপায় অবলম্বন করলে, কি পদ্ধতিতে শেখালে, শিক্ষাকে সহজ সরল এবং সরস করা যায়।

এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, যে শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হলে, শিক্ষাকে প্রকৃত কার্যকরী করতে হলে, শিশুকে জানতে হবে, শিশুকে চিনতে হবে, শিশুকে পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষণ করতে হবে। এক কথায় শিশুর মনকে বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার এই শিশুমনের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি গ্রন্থখানির নাম দিয়েছেন "মানুষের মন ও শিক্ষা প্রসঙ্গ।" নামটি সত্যই সমীচীন হয়েছে। আমি দেখে খুসি হয়েছি যে তিনি এই মনের কথা বলতে গিয়ে, অন্যান্য নানা প্রকার প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারনা করেছেন, যথা বুদ্ধির চাষ, নৈরাশ্য ও সংঘাত, মানসিক রোগ, ব্যতিক্রমের বিপদ, ইত্যাদি। বিশ্ববিখ্যাত মনঃ সমীক্ষক ফ্রয়েড্ ও ডাঃ কার্লগুষ্টাভ্ য়্যুঙ্গ প্রসঙ্গ নিয়ে গ্রন্থকার গল্পের ছলে বিস্তৃত আলোচনাই করেছেন। শিশুশিক্ষার নানা দিক যথা, শিক্ষা ও ইহার উদ্দেশ্য, শিশুর জীবনে প্রথম বৎসরটি, এক হইতে তিন বৎসর, নোতুন প্রফেসর এলেন, নোতুন ক্লাশ, প্রভৃতির আলোচনা অতি সরসভাবে non-technical ভাষা প্রয়োগ করে পুস্তক খানিতে সন্নিবেশিত হয়েছে, যাঁর দ্বারা যে কোন সাধারণ পাঠক বিনা ক্লান্তিতে এবং ধৈর্য না হারিয়ে এক নিশ্বাসে বইখানি পড়তে পারেন, এবং শিক্ষা সম্পর্কীয় অনেক জটিল তথ্য সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

আমার মনে আছে বিভুবাবুর পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ "শিক্ষায় পথিকৃৎ" বইখানির ভূমিকাতে আমি লিখেছিলাম যে ঐ গ্রন্থখানিতে B. T. Syllabus বহির্ভূত হলেও, শিক্ষাব্রতী জন্ লক, শিক্ষাগুরু জন্ কমেনিয়াস্ প্রভৃতি জগৎ বিখ্যাত আরও কয়েকজন শিক্ষাবিদ্ সম্বন্ধে আলোচনার অভাব

আছে। এই গ্রন্থে সে অভাব পূর্ণ হয়েছে। আমি দেখে আনন্দিত হয়েছি যে এই গ্রন্থখানিতে শাসন শৃঙ্খলাবাদের প্রতিনিধি শিক্ষাব্রতী জন্ লক্, সম্পর্কে এবং আমেরিকান শিক্ষাবিদ্ জন্ ডিউই ও উইলিয়ম্ হার্ড কিল্প্যাট্রিক সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ তিনি যোগ করেছেন।

শ্রীযুক্ত বিভুরঞ্জন গুহ শিক্ষা-সাহিত্য জগতে নূতন নন্। বিভুবাবু ইতিপূর্বেই শিক্ষা সম্পর্কে বাংলা ভাষায় একাধিক পুস্তক রচনা করে, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের কাছে ভালভাবে পরিচিত হয়েছেন। আমাদের মাতৃভাষায় লেখা শিক্ষা সম্বন্ধে ভাল বই অত্যন্ত কম। আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, তাঁর এই গ্রন্থখানি শিক্ষা-সাহিত্যের জ্ঞানভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ করবে।

১৬১, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড্
কলিকাতা-২৬
৩রা মার্চ, ১৯৬২

কে. কে. মুখার্জি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তত্ত্বের রীডার এবং টিচার্স ট্রেনিং বিভাগ ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা তত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ।

সূচনা

মানুষ তা চিত্তশক্তির বলে দূরতম জ্যোতিষ্ক থেকে ক্ষুদ্রতম পরমাণু সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করে বিবিধ বিজ্ঞান রচনা করেছে। কিন্তু আজো তার কাছে সব চেয়ে রহস্যময় তার নিজেরই মন। এবং বিজ্ঞানজগতে নূতন আগন্তুক মনোবিজ্ঞান—আজো তাকে বলা হয় "শিশু" বিজ্ঞান। অথচ, সকল মানুষের কাছে সমভাবে চিত্তাকর্ষক কোনও প্রসঙ্গ যদি থাকে, তা এই মানুষের মন এবং সকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার শিক্ষাসমস্যা।

স্বনামখ্যাত অধ্যাপক শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ মহাশয়ের "মানুষের মন ও শিক্ষা প্রসঙ্গ" পুস্তকে. সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যগুলি লেখকের অন্তর্দৃষ্টি ও ঘরোয়া উদাহরণের সাহায্যে আশ্চর্যরকম সহজ ও সরস হয়ে উঠেছে। শিক্ষক, পিতামাতা ও সাধারণ পাঠক থেকে সুরু করে শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের ছাত্র পর্যন্ত সকলেই বইটি পড়ে উপকৃত হবেন এবং আনন্দ পাবেন।

নলিনী দাস এম, এ

Principal : Institute of Education for Women

Hastings House.

Alipore.

15. 2. 52

মুখবন্ধ

অধ্যাপক বিভুরঞ্জন গুহ বাঙ্গালী পাঠকসমাজে, বিশেষত শিক্ষাব্রতীদের নিকট সুপরিচিত। অধ্যাপিকা শান্তি দত্তের সঙ্গে এক যোগে লেখা 'শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা' ও তাঁহার একক লেখা, 'শিক্ষায় পথিকৃৎ' শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে।

তিনি 'শিক্ষক' পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার অনেক রচনাই পড়িয়াছি ও আনন্দলাভ করিয়াছি। এই রচনাগুলি ও আরও কয়েকটি রচনা একত্র করিয়া 'মানুষের মন ও শিক্ষা প্রসঙ্গ' এই নামে তিনি যে একটি নূতন পুস্তক প্রকাশিত করিতেছেন, তার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় এ রকম পুস্তক ইতিপূর্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহা পাঠ্য পুস্তক রূপে কল্পিত হয় নাই। হয়ত সেই জন্যই তথ্যপূর্ণ হইয়াও, ইহা বেশ সুখপাঠ্য।

অধ্যাপক গুহ তাঁহার এই পুস্তকের সাহায্যে বাঙ্গালী পাঠক মাত্রকেই শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে আকৃষ্ট করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। শিক্ষক-শিক্ষণ মহা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্বেই শিক্ষক শিক্ষিকারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ রায় এম, এ
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, ডেভিড্ হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা।
অধ্যাপক, শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান গবেষণাগার, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা।

অভিমত

"মানুষের মন ও শিক্ষা প্রসঙ্গ" আমি আদ্যোপান্ত মনোযোগ দিয়া পড়িলাম। ইহাতে আধুনিক সাধারণ মনোবিজ্ঞান, শিশুমনোবিজ্ঞান, শিক্ষামনোবিজ্ঞান ও বিকৃতমনোবিজ্ঞানের কয়েকটি বিষয় সহজ ও সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। এই বিষয়গুলি শিক্ষক ও শিক্ষণ বিজ্ঞানে ছাত্রদিগের জানা অত্যাবশ্যক। ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও সরস। সাধারণ পাঠকদের পক্ষেও ইহা সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীযদুনাথ সিংহ এম, এ, পি এইচ ডি, পি আর এস।

৩৯, এস আর দাস রোড,
কলিকাতা-২৬
১. ৩. ৬২

নিবেদন

দুই বৎসর আগে উচ্চ রক্তচাপ, বিষম অনিদ্রা ইত্যাদি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া অধ্যাপনার কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক উদ্বেগ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে, কষ্ট হইলেও বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিয়াছি। দুঃখ দুর্দিনেই মানুষ আপনাকে চিনে—প্রকৃত বান্ধব কে তাহাও জানিতে পারে। একদিকে নিজের মানসিক দৌর্বল্যও যেমন লজ্জা দিয়াছে, তেমনি মুগ্ধ হইয়াছি আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী, আত্মীয় অনাত্মীয় বহু জনের অকৃত্রিম প্রীতির পরিচয়ে। তাঁহাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

দুঃখের দিনের ফসল এ প্রবন্ধগুলি দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে আজ সুধীজনের কাছে সাহস করিয়া উপস্থিত করিলাম। হয়তো বা কোন কোন লেখায় মানসিক শ্রান্তির ছাপ লাগিয়া থাকিবে।

বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন মেজাজে প্রবন্ধগুলি লেখা হইয়া 'শিক্ষক', 'বসুধারা', 'মন্দিরা' ইত্যাদি পত্রিকায় ছাপা হয়। তাই কখনো বা কাব্যভাষা, কখনো বা সাধুভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধই স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে কল্পিত হইয়াছিল এবং অনেক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু পরস্পর সংযুক্ত হওয়াতে কিছু পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে। যেমন যেমন পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে তেমনি তেমনি পুস্তকাকারে প্রবন্ধগুলি গ্রথিত হইয়াছে; সুতরাং প্রবন্ধগুলির ক্রম-বিন্যাসেও ত্রুটি রহিয়া গেল। প্রকাশক শ্রীশান্তি কুমার মজুমদার মহাশয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করিলে হয়তো এগুলি পুস্তকাকারে শীঘ্র রূপ পাইত না। সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও যদি এ লেখাগুলি কাহারও ভাল লাগে, কাহার ও আগ্রহ উদ্বুদ্ধ করে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

৭ জে, এস্, আর দাশ রোড্
কলিকাতা—২৬
১২।৩।৬২

বিনীত নিবেদক
বিভুরঞ্জন গুহ

সূচীপত্র

মানুষের মন

নারী চরিত্রের রহস্য নিয়া সব দেশ ও সবকালের কবি ও সাহিত্যিকেরা অনেক কথাই বলিয়াছেন। বহুপ্রচলিত সংস্কৃত প্রবচন 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্ পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ' সকলেরই পরিচিত। শ্রেষ্ঠ ইংরেজ নাট্যকার শেকস্পীয়র লিখিলেন "Frailty, thy name is woman।" মুদ্রারাক্ষস নাটকে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়া নাট্যকার বিশাখদত্ত লিখিলেন, "প্রকৃত্যা বা কাশপ্রভব কুসুমপ্রান্তচপলা পুরন্ধ্রীণাম্ প্রজ্ঞাপুরুষগুণ বিজ্ঞানবিমুখী" অর্থাৎ, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কাশবনে প্রস্ফুটিত কুসুমাগ্রভাগের মত (বায়ুভরে) সদা চঞ্চল এবং তাহা পুরুষের গুণ প্রকৃত নির্ধারণে বিমুখ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী' খণ্ড-নাট্যে অভিমানক্ষুব্ধা দেবযানী প্রেমাস্পদ কচকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন "জানো না কি রমণীর মন, সহস্র বর্ষেরই সখা, সাধনার ধন ?"

কবি ও সাহিত্যিকেরা যাহাই বলুন না কেন—রমণীর মনই কি শুধু রহস্যের আধার ? পুরুষের মন, শিশুর মনও কি একই প্রকার রহস্যময় নয় ?

যতই রহস্যময় হউক না কেন, মানুষের মন (এখানে মানুষ বলিতে নর, নারী ও শিশু সকলকেই বুঝাইতেছে) না জানিলে আমাদের চলে না। এ পৃথিবীতে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে হইলে আমাদের বহিঃপ্রকৃতিকে জানা যেমন প্রয়োজন, আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিকে জানাও তেমনি প্রয়োজন। হয়তো বা তাহার প্রয়োজন অধিকতর, কারণ আলো, বাতাস, তাপ ও পৃথিবীর বিবিধ জড়-পদার্থ আমাদের কাছে যতটা নিকট ও আপন, মানুষ তাহার চেয়ে অনেক বেশী নিকট ও আপন। আপনার মাথার উপর যে বৈদ্যুতিক পাখাটি ঘুরিতেছে অথবা যে কেদারায় বসিয়া আপনি লেখাপড়া করিতেছেন তাহার কলকব্জা ও নির্মাণ কৌশল আপনি না জানিলেও তত ক্ষতি নাই কিন্তু যে গৃহিণীকে নিয়া ঘর করিতেছেন—তাঁহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অনুরাগ, বিরাগ, মান-অভিমান সম্বন্ধে আপনি নিস্পৃহ থাকিতে পারেন না।

বহিঃপ্রকৃতিকে নির্ভুলভাবে জানিবার চেষ্টাতেই বিভিন্ন প্রকৃতি বিজ্ঞানের (natural sciences) জন্ম। তেমনই মানুষের মনকে নির্ভুলভাবে জানিবার কৌতূহল হইতে সৃষ্টি মনোবিজ্ঞানের ! গত দুশো বৎসরে বহিঃপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রকৃতি বিজ্ঞানের (natural· sciences) বিভিন্ন শাখার যে উন্নতি হইয়াছে তাহা বিস্ময়কর। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির গতি ও রীতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এমন স্তরে পৌছিয়াছে যেখানে মানুষ কৃত্রিম উপায়ে এই শক্তিগুলিকে নিজের সেবায় লাগাইতেছে। অন্তরীক্ষ পথে চন্দ্রলোকে ভ্রমণ মানুষের পক্ষে আজ শুধু কল্পনামাত্র নয়। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে যদিও মানুষের মন নিয়া নানা চিন্তা ও জল্পনা হইয়াছে তবুও এ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হয় নাই। তাহার একটি কারণ মানুষের মনও অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার (natural phenomenon) মত বিজ্ঞানের বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে এবং এ বিভাগেও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি ব্যবহার সম্ভব, এই স্বীকৃতি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মাত্র ঘটিয়াছে। তাহার পর হইতে এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন এমন হইল সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

মানুষের মন রহস্যময় (mysterious), তাহা দুর্জ্ঞেয়, তাহার প্রকৃতি, গতি ও রীতি জড়পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এই প্রাচীন ও বদ্ধমূলধারণা মনোবিজ্ঞানের অনগ্রসরতার জন্য অনেকখানি দায়ী। মানুষেব মন কি, সে সম্বন্ধে ধারণার ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। সেই ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিলে আমাদের এ কথাটি স্পষ্ট হইবে।

মন বলিতে প্রাচীন গ্রীসদেশে মানুষের দেহের অভ্যন্তরে একটি বায়বীয় বা তেজস্কর, নিয়তচঞ্চল ভৌতিক পদার্থ বুঝাইত। গ্রীসদেশে মৃতের ভস্ম বা অস্থির ধারক (urn) প্রাচীন মৃৎপাত্রে অঙ্কিত মনুষ্যদের হৃদ্দেশে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি আর একটি মনুষ্য অঙ্কিত দেখা যায়। ইহাই মন বা আত্মা (soul).। উপনিষদ ও গীতায়ও অঙ্গুষ্ঠাকৃতি জ্যোতির্ময় আত্মাপুরুষের উল্লেখ আছে। এই ভৌতিক পদার্থ দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালনের জন্য দায়ী এবং মানুষের সুখ-দুঃখ, কল্পনা, স্মৃতি, আবেগ ইচ্ছা ইত্যাদি পরিচালনা করিয়া থাকে। ইহা জড়পদার্থ নয় তাই আত্মা প্রত্যক্ষগম্য নয়, জল্পনার বিষয়। এই আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন জল্পনা করিয়াছিলেন এবং এ সব জল্পনার সত্যতা নির্ধারণের কোন উপায় ছিল না।

প্লেটোর (৪২৭-৩৪৭ খ্রীঃ-পূঃ) মতে সমস্ত দৈহিক ও চেতনক্রিয়ার মূলে আছে দেহাতীত বোধিশক্তি যাহাকে তিনি বলিলেন Idea। বাস্তবিক পক্ষে তিনি স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভু আত্মাপুরুষের স্থানে স্বয়ংক্রিয় Ideaকে স্থান দিলেন। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে দুইই সমান রহস্যময়, সুতরাং অসার্থক। এ্যরিষ্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রীঃ-পূঃ) আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সূত্রপাত করিয়া বলিলেন, মন একটি বস্তু (substance) নয়, দেহেরই ক্রিয়া (function of the body)। তিনি উপমা দিয়া বলিলেন 'চক্ষু যদি একটি জন্তু হয়, তবে দৃষ্টিশক্তি তার আত্মা'। তাঁহার উক্তির ইহাই মর্মার্থ যে মানুষের অভিজ্ঞতা ও ব্যবহার বুঝিতে হইলে দেহের যে ক্রিয়া হইতে ইহাদের উৎপত্তি তাহা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ এ্যরিষ্টটলই প্রথম বলিলেন মানসক্রিয়ার ব্যাখ্যা দৈহিকক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করিয়াই করিতে হইবে। সুতরাং মানুষের মনকে শরীরের ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ করা যায়। তিনি বলিলেন তাপ, আলো ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তি ইন্দ্রিয়াদির উপর ক্রিয়া করে, তাহার ফলে বিভিন্ন ধারণা (Ideas) সৃষ্টি হয়। এই ধারণাগুলির সংমিশ্রণই আমাদের বিভিন্ন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উৎস। এবং এই ধারণাগুলিদ্বারাই আমাদের ব্যবহার (behaviour) নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁহার মানবদেহ সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল এবং কখনো কখনো তাহা ভ্রান্তও ছিল,—যেমন, তিনি মনে করিতেন বাহ্য উত্তেজক (stimuli) ইন্দ্রিয়গুলিকে আঘাত করে এবং তাহা হৃদযন্ত্রে সঞ্চালিত হয় এবং সেখানেই সমস্ত ধারণার উৎপত্তি। তবে তিনিই প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর মনোবিজ্ঞানকে স্থাপিত করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোবিজ্ঞানের পথ প্রদর্শন করিলেন।

দেহযন্ত্র সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ প্রাচীন। কিন্তু পূর্বে বাহির হইতে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া অথবা অঙ্গুলিচালনা দ্বারা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদির আকার ও ক্রিয়া সম্বন্ধে জল্পনা করা হইত। ৩০০ খ্রীঃ-পূঃ এর আগে শব ব্যবচ্ছেদ ইয়োরোপে নিষিদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বৈদ্য চরক ও সুশ্রুত অস্থিসংস্থান, দেহের রক্তচলাচল ইত্যাদি বিষয়ে অবগত ছিলেন। শল্য-চিকিৎসারও (operations) উল্লেখ আছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রয়োজনেই দেহযন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হইয়াছিল। কিন্তু এই আলোচনার মধ্য দিয়া দেহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত মানসক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানও অগ্রসর হইতেছিল।

অবশ্য অনেক সময় এ সমস্ত প্রাচীন ধারণা অত্যন্ত স্থূল, অসম্পুর্ণ এমন কি হাস্যকরভাবে ভ্রমপুর্ণ ছিল—যেমন, মনে করা হইত যে যকৃৎ (liver) হইতে নির্গত পিত্তরস (bile) ক্রোধের মূল কারণ, চন্দ্রালোক মস্তিষ্কে বায়ুকে প্রকুপিত করে এবং তাহাতেই মানুষ উন্মাদ হয় ইত্যাদি। যাহা হউক, শব ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থার পর হইতে দেহযন্ত্র ও তাহার ক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমরা তাহাকেই বলিব যাহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, কিন্তু জল্পনা নিতান্তই কল্পনা ও অনুমানভিত্তিক। এ সম্পর্কে বেকন্ (১৬০৫ খ্রীঃ-অঃ) একটি কৌতুককর উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছিলেন। "১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতদের মধ্যে ঘোড়ার মুখে কয়টি দাঁত আছে, এই গুরুতর প্রশ্ন নিয়া তুমুল কলহ উপস্থিত হয়। তের দিন যাবৎ ইহা নিয়া বিরামহীন বিতর্ক চলে। বিভিন্ন পণ্ডিতের পক্ষ হইতে প্রচুর শাস্ত্রীয় প্রমাণ, প্রাচীন দার্শনিকগণের মতামত, বহু পুরাতন পুঁথিপত্র উপস্থাপিত হইল। কিন্তু প্রশ্নের কোন মীমাংসা হইল না। চতুর্দশ দিবস প্রাতঃকালে সভা পুনরায় সমবেত হইলে একজন সুদর্শন তরুণ সন্ন্যাসী (friar) অত্যন্ত বিনীতভাবে এ বিষয়ে সামান্য কিছু বলিবার জন্য গুরুজনদিগের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন ঘোড়ার কয়টি দাঁত আছে তাহার সহজ ও একমাত্র মীমাংসা হইতেছে ঘোড়ার মুখ খুলিয়া তাহার দাঁত কয়টি গুণিয়া দেখা। তাহার এই বীভৎস, অশ্রুতপূর্ব অর্বাচীন প্রস্তাবে সমবেত সজ্জনমণ্ডলী এমনই ক্রুদ্ধ ও অপমানিত বোধ করিলেন যে সকলে মিলিয়া উত্তম-মধ্যম দিয়া যুবকটিকে সভাক্ষেত্র হইতে বহিষ্কার করিয়া দিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন দুষ্ট শয়তান এই তরুণ বিদ্যার্থীকে উন্মার্গগামী করিয়াছে সেই জন্যই সে প্রাচীন ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইয়াছে। আরো বহু দিবস বিতর্ক ও জল্পনার পরে শান্তি-কপোত সভাস্থলে অবতীর্ণ হইল এবং সমবেত বিদ্বজ্জন ইহাই স্থির করিলেন যে এই গুরুতর প্রশ্নটি একটি গভীর চিরন্তন রহস্য এবং উপযুক্ত শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাবে ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব নয়। সভার কর্মবিবরণীতে ইহাই লিখিত হইল"।[১]

শরীরতত্ত্বের ক্রমশঃ উন্নতিসত্ত্বেও বহুকাল যাবৎ মনস্তত্ত্ব জল্পনা ও বিচার ভিত্তিক দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত হইয়াই রহিল। আধুনিক ইয়োরোপের

---

১ Quoted from C. E. Kenneth Mees, "Scientific Thought and social Reconstruction"—Electrical Engineering 1934, 53, P. 383-'84

চিন্তাজগতে রেণী দেকার্তে (১৫৯৬—১৬৫০) আবার নূতন করিয়া মনস্তত্ত্বকে শরীরবিদ্যার সহিত যুক্ত করিলেন। তিনি দেহ এবং মন দুটিকেই যন্ত্র হিসাবে গণ্য করিয়া তাহাদের ক্রিয়ার যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন দেহ একটি জটিল যন্ত্র বিশেষ। পরিবেশ ইহার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, পেশী ইত্যাদিকে সক্রিয় করে। যে শক্তির সাহায্যে ইহারা ক্রিয়াশীল হয় তাহা জড়শক্তি নয়, দেকার্তে তাহাদের বলিলেন জৈবশক্তি (animal spirits)। একটি ঘড়ির ক্রিয়া যেমন তাহার বিভিন্ন অংশের সম্পর্কের উপরই নির্ভর করে তদতিরিক্ত কোন রহস্যময় আত্মার কল্পনার প্রয়োজন হয় না, তেমনই দেহের বিভিন্নক্রিয়াও অনুরূপভাবে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্পর্ক জানিলেই ব্যাখ্যা করা যায়। জৈবশক্তি ও রক্তচলাচল ব্যতিরিক্ত অন্য কোন আত্মা বা প্রাণশক্তি কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। মস্তিষ্ক হইতে ইন্দ্রিয় ও পেশীসমূহ পর্যন্ত বহু শিরা বিস্তৃত আছে ইহাদের মধ্য দিয়া জৈবশক্তি প্রবাহিত হয়। এই শিরা হইতে জৈবশক্তি পেশীতে সঞ্চালিত হইলে পেশীর সঙ্কোচন ঘটে, এবং এই শক্তি মস্তিষ্কে প্রত্যাহৃত হইলে পেশী বিশ্রান্ত হয়। দেকার্তে মনে করেন দেহের সমস্তক্রিয়ার পিছনে যেমন রহিয়াছে জৈবশক্তি, তেমনই বোধ, বিচার, স্মৃতি, কল্পনার মূলে রহিয়াছে মন বা চেতন শক্তি। এই দুই শক্তি পৃথক ও বিপরীত হইলেও মস্তিষ্কের নিম্নে অবস্থিত পিনিয়াল গ্রন্থিস্থলে (pineal gland) এই দুইয়ের পরস্পর সংযোগ (interaction) ঘটে। এই জন্যই দেহ মনকে ও মন দেহকে প্রভাবিত করিতে পারে।[২] দেকার্তের মতে তাই মনস্তত্ত্ব আত্মাবস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণা নয়—মনের ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা।

মনস্তত্ত্ব ইহার পরেও বহুদিন পর্যন্ত দার্শনিক আলোচনার বিষয় হইয়া রহিল—অর্থাৎ মনস্তত্ত্ববিদ্ মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষদ্বারা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা না করিয়া মন-রূপ শক্তির স্বরূপ নিরূপণে ব্যস্ত রহিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইহা বুঝা যাইতে লাগিল যে মনস্তত্ত্বকে বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করিতে হইলে ইহাকে অন্যান্য বিজ্ঞানের মত প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে স্থাপন করিতে হইবে। আত্মা বা মন প্রত্যক্ষের বিষয় নহে এবং মনের প্রকৃতি সম্বন্ধে জল্পনার দ্বারা মানসিক প্রক্রিয়া সমূহের স্বরূপ নির্ধারণ করা যাইতে পারে না। তাই মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বাস্তব মানসিক প্রক্রিয়াসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন বাহ্যজগতের বস্তু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক

২ Fulton—Selected Readings in the History of Physiology P, 240.

তথ্য নিরূপণের উপায় বাহ্য প্রত্যক্ষণ (external observation), তেমনি মানসিক প্রক্রিয়া বুঝিবার উপায় হইতেছে অন্তর্দর্শন (introspection)। প্রত্যেকেই আমরা নিজেদের মানসপ্রক্রিয়াসমূহ কি, তাহাদের গতি ও পরিণতিই বা কি, তাহা লক্ষ্য করিতে পারি। এই প্রকারেই মানুষের মন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। সুতরাং মনস্তত্ত্বের নূতন সংজ্ঞা দাঁড়াইল, ইহা চেতনপ্রক্রিয়ার (processes of consciousness) অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ। এই অন্তর্দর্শনের পথেই মনস্তত্ত্ব বহুদিন অগ্রসর হইয়াছে—আজও এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় নাই। ইয়োরোপীয় দর্শনের ক্ষেত্রে কাণ্টের (Kant) স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার দার্শনিক মত আলোচনা আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। তবে মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাহার মত উল্লেখযোগ্য। তিনি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং আমাদের চেতনক্রিয়ার পশ্চাতে মনের নিয়ন্ত্রণও মানিয়াছেন কিন্তু তিনি বলিলেন এই মনপদার্থকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পথে জানিবার উপায় নাই। বিভিন্ন মানস প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া তাহার যে প্রকাশ তাহাই আমরা জানিতে পারি—এবং তাহাই হইবে মনোবিজ্ঞানের বিষয় বস্তু।[৩] তিনি মনের ক্রিয়াগুলিকে জ্ঞান (thinking), অনুভূতি (feeling) ও উদ্যম (willing) এই তিনটি প্রধান দলে ভাগ করিলেন। তাঁহার এই বিভাগ আজও মোটামুটি ভাবে অনুসৃত হইতেছে। তিনি মনকে নিষ্ক্রিয় (passive) পদার্থ বলিয়া মনে করেন নাই—মন ক্রিয়াশীল ও বুদ্ধিধর্মী। মনই বিচ্ছিন্ন সংবেদন (sensations) গুলিকে সুসংবদ্ধ করিয়া, দেশ, কাল, দ্রব্য, গুণ, কার্য-কারণ ইত্যাদি রূপ দান (forms and categories) করিয়া তাহাদের অর্থপূর্ণ (meaningful) করিয়া তোলে।

কাণ্টের পূর্বে বিশ্লেষণধর্মী মনোবিজ্ঞানীরা মনকে কতগুলি ক্ষমতায় (faculties) ভাগ করিয়াছিলেন। মনের এই মৌলিক কতগুলি ক্ষমতা দিয়াই তাঁহারা সমস্ত মানসক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিতেন। যেমন, আমরা অতীত ঘটনা মনে রাখি কেন? যেহেতু মনের স্মৃতি-শক্তি আছে; চোখে দেখি কেন? যেহেতু চোখের দর্শন করিবার ক্ষমতা আছে। এ জন্য এই মনোবিজ্ঞানকে faculty psychology বলা হইয়া থাকে। উল্‌ফ (Wolff) এ মতের প্রধান সমর্থক।

এই বিশ্লেষণের ধারা অনুসরণ করিয়া অনুসঙ্গ মতবাদ (Associationism) এর উৎপত্তি। হব্‌স ও লক্ এই মতবাদের গোড়াপত্তন করেন, তারপর হার্টলে

৩ McDougall—Psychology P. 15.

(Hartley) -এ মত সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করেন। ইহাদের মতে মন একটি আলাদা দ্রব্য নয়—ইহার নিজস্ব কোন গতিও নাই। কতগুলি চেতনক্রিয়া আমাদের অন্তরে চলিতে থাকে। এগুলি বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন। ইহারা নিজস্ব শক্তিতেই অনুষঙ্গের নিয়ম (Laws of Association) অনুসারে পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া ক্রমশঃ জটিলতর মানসিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা যেমন কতগুলি সরল মৌলিক পদার্থ হইতে বিভিন্ন জটিল যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় তেমনি সহজতম মানসক্রিয়া, যেমন, সংবেদন (sensations), কল্প (images), ইত্যাদির সংযোগে প্রত্যক্ষজ্ঞান (perception), ধারণা (concepts), চিন্তা (thought), বিচার (reasoning) ইত্যাদি উচ্চতর ও জটিলতর মানসক্রিয়াগুলি তৈরী হয়। তাই এই মতবাদকে মানসিক রসায়ন (mental chemistry) বলা হইয়াছে।[৪] কাণ্ট এ মত অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে মনের নিজস্ব সক্রিয় শক্তিই মানসিক অবস্থা (mental states) গুলির মধ্যে সংযোগস্থাপন করে।

ইতিমধ্যে শরীর বিজ্ঞান (physiology) ও পদার্থবিদ্যার (Physics) অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতে লাগিল যে মানসক্রিয়াগুলি শরীরক্রিয়া এবং বহির্জগতের শক্তিগুলির প্রভাবের উপর নির্ভর করে। দৃষ্টিশক্তির সন্তোষজনক ব্যাখ্যার জন্য চক্ষু-যন্ত্রটির গঠন ও ক্রিয়া এবং আলো ও রং এর স্বরূপ বিশ্লেষণও প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে মনুষ্যমস্তিষ্কের সম্বন্ধ যে অতিশয় ঘনিষ্ঠ তাহা ক্রমশই স্পষ্ট বোঝা যাইতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে গল (Gall) আবিষ্কার করিলেন যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ যুক্ত। তাঁহার অনুমান ছিল যে কোন মানসিক ক্ষমতা মস্তিষ্কে একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রের বিকাশের উপর নির্ভর করে। মস্তিষ্কে এরূপ কেন্দ্রের বিকাশের ফলে সে স্থানের বহিরাবরণ করোটিতে (skull) চাপ লাগিতে থাকে এবং সে স্থানটি স্ফীত হইয়া ওঠে। কাজেই তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন করোটি অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শ করিয়া কোন মানুষের কোন মানসিক শক্তি সমধিক বিকশিত, তাহা বুঝিতে পারা যায়, এবং ইহা হইতে ব্যক্তির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যও নির্ধারণ করা সম্ভব।[৫] তাঁহার এই সিদ্ধান্তটি ভ্রান্ত, কিন্তু মস্তিষ্কে

৪ Murphy—Historical Introduction to Modern Psychology P. 30.

৫ Woodworth—Contemporary Schools of Psychology P. 101.

মানসিক ক্রিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্র অবস্থিত এই অনুমান ভবিষ্যৎ মনোবিজ্ঞানের বিকাশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হেলম্‌হোৎজ্ (Helmhotz) শরীরবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার সাহায্যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বোধের (বিশেষ করিয়া দৃষ্টি ও শ্রবণ) সমস্যা সুসমাধানে সমর্থ হইলেন। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানকে পদার্থবিদ্যা ও শরীর বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইতে লাগিল। এই সঙ্গে স্বভাবতই মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রকৃতিবিজ্ঞানের মত পরীক্ষণ (experiment) পদ্ধতি ব্যবহারের চেষ্টা আরম্ভ হইল। এ বিষয়ে প্রথম পরীক্ষা করেন জার্মান পণ্ডিতদ্বয় ওয়েবার ও ফেক্‌নার (Weber and Fechner)। তাঁহারা পরীক্ষার ভিত্তিতে ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীক্ষ্ণতা (intensity of sensation) এবং তাহাদের উত্তেজকের (Stimulus) পরিমাণগত সম্বন্ধ নির্ণয়ের (Quantitative relation) নিয়মটি (law) আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ তাঁহারা পরীক্ষার পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া ইহা প্রমাণ করেন যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীক্ষ্ণতার বৃদ্ধির হার উত্তেজকের পরিমাণবৃদ্ধির হারের তুলনায় মন্থরতর। তাই উত্তেজকের পরিমাণ বাড়াইলেও সব সময় ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায় না। এই দুইয়ের বৃদ্ধির হার একটি নির্দিষ্ট নিয়মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মনোবিজ্ঞান সম্পর্কীয় সুসংবদ্ধ পরীক্ষা পরিচালনার জন্য ভুণ্ড (Wundt) প্রথম মনস্তত্ত্ব বিষয়ক গবেষণাগার স্থাপন করেন ১৮৭৯ সালে লাইপৎসিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভুণ্ড, মনস্তত্ত্ব চেতনপ্রক্রিয়ার বিজ্ঞান (Science of consciousness) এই সংজ্ঞা মানিয়া নিলেন কিন্তু তিনি চেতন প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে শরীরবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার বৈজ্ঞানিক রীতি মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রেও সুসংবদ্ধ ভাবে ব্যবহার (systematic use of scientific methods) করিয়া মনস্তত্ত্বকে বিজ্ঞানের পদবীতে উন্নীত করিলেন। তখন হইতে মনোবিজ্ঞান দর্শনের নাগপাশ হইতে বন্ধনমুক্ত হইয়া এবং জল্পনা কল্পনার বন্ধ্যা রীতি ত্যাগ করিয়া অন্যান্য বিজ্ঞানের মত নিজের স্বাধীন সত্তা ঘোষণা করিল। অবশ্য কোন বিজ্ঞানই দর্শনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিতে পারে না। প্রত্যেক বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব দার্শনিকচিন্তার উপর নির্ভরশীল এবং সমস্ত বিজ্ঞানের শেষফলকে সুসংবদ্ধ, সমন্বিত (co-ordination) করিয়া তাহাদের প্রকৃত মূল্য নিরূপণ (valuation) দর্শনের কাজ। ভুণ্ডও দর্শনকে অস্বীকার করেন নাই। তবে তিনি মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও সচেতন

ভাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রণালী ব্যবহার করিবার পথ দেখাইলেন। এই বৈজ্ঞানিক রীতি কি? "ইহার বিশেষত্ব হইতেছে (১) ইহা প্রত্যক্ষ নিরীক্ষার পদ্ধতি সুসংবদ্ধ ভাবে এবং নিষ্ঠার সহিত ব্যবহার করিবে। অসংযত ও বিচ্ছিন্ন নিরীক্ষার (unsystematic aimless observation) পদ্ধতি পরিহার করিবে। (২) গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গী নৈর্বক্তিক (impersonal) হইবে। তিনি পূর্বসংস্কার দৃঢ় করিবার জন্য বস্তু ও ঘটনার নিরীক্ষণ করিবেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য হইবে সত্য আবিষ্কারের জন্য প্রমাণযোগ্য তথ্য আহরণ। (৩) এই তথ্য আহরণ ব্যাপারে তিনি এমন পদ্ধতি ব্যবহার করিবেন যাহা অপরেও ব্যবহার করিয়া অনুরূপ ফলই পাইতে পারে।"[৬]

ভূণ্ড অন্তর্দর্শনের প্রণালীই ব্যবহার করিলেন কিন্তু তাহা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা রীতি অনুসারে বাহ্য ও অন্তর (external and internal) অবস্থার কঠিন পরিশাসনাধীনে। ইহাকে তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষারীতিসম্মত অন্তর্দর্শন পদ্ধতি (experimental introspection) বলিলেন। ইহাতে তিনি চেতনার মূল উপাদান যথা সংবেদন (sensations) কল্প (images) আবেগ (feeling) ইত্যাদি বিশ্লেষণ দ্বারা চেতনার (consciousness) স্বরূপ নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। ভূণ্ডের পরীক্ষারীতি অনুসারেও মনোবিজ্ঞানের কাজ হইল চেতনার উপাদান (contents of consciousness) নির্ণয়। ভূণ্ডের অনুবর্তীরা মন বা চেতনার গঠন (structure) নির্ধারণে উৎসুক, তাই ইহাদের Structuralists ও বলা হয়।

ইহাই স্বাভাবিক যে ভূণ্ড ও তাঁহার অনুগামী ছাত্ররা মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত পরীক্ষায় রত হন তাহা সবই ইন্দ্রিয়ানুভূতি সম্বন্ধে, কারণ এ সব অনুভূতির সহিত সংযুক্ত শারীরিক ও বাহ্য অবস্থাগুলিকে (physiological and physical conditions) বৈজ্ঞানিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ, এবং তাহাদের পরিবর্তনগুলির নির্ভুল পরিমাপ করা যায়। পূর্বেই ওয়েবার ও ফেকনারের পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ভূণ্ডের গবেষণাগারে সেই সম্পর্কে আরও পরীক্ষা চালানো হয় এবং ভূণ্ড আবিষ্কার করেন যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির তীক্ষ্ণতা একরকম নয়। উত্তেজক (stimulus) কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিলে তাহার কতটা সময় পরে ইন্দ্রিয়ানুভূতি জন্মে, তাহা নিয়াও তাঁহারা পরীক্ষা (Reaction time experiment) করিয়া নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছেন।

৬। N. L. Munn—Psychology. P. 5

মনোবিজ্ঞান 'চেতনপ্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক আলোচনা', এই সংজ্ঞায়,অধিকতর বৈজ্ঞানিক মনোভাবসম্পন্ন মনস্তত্ত্ববিদেরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন অন্তর্দর্শন প্রণালী দ্বারা চেতনার বিশ্লেষণ অত্যন্ত অনির্ভর-যোগ্য। প্রত্যেক মানুষের চেতনা তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব (purely subjective) কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ব্যক্তিমানস নিরপেক্ষ (objective)। তা ছাড়া চেতনা তো কোন দ্রব্য নয়, তাহা জীবন্ত বহমান স্রোত (a stream of consciousness)। তাহার ক্রমবিকাশের একটা ধারা আছে, সুতরাং বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার গঠন নির্ধারণের চেষ্টা নিরর্থক। জেমস্ (James) এঞ্জেল (Angell) ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানী তাই বলিলেন মন দেহের উপর কি ক্রিয়া করে (function) তাহা দিয়াই তাহার পরিচয়,—যে পরিবর্তন সে সাধন করে তাহা দিযাই মনকে জানা যায়—'The mind is what the mind does'। তাই এই মনোবিজ্ঞানীদের Functionalist বলা হয়। মন বা চেতনা সর্বদাই উদ্দেশ্যমুখী। জড়পদার্থ তা নয়। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী তাই গতিশীল (dynamic), ক্রমবিকাশানুসারী (evolutionary), ও উদ্দেশ্যমুখী (teleological)। মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা তাই অধিকতর পরিমাণে দেহাশ্রয়ী (physiological) হইতে লাগিল।

ক্রমেই মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এবিংহজ (Ebbinghaus) স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে অভিনব পরীক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করিলেন, তাহার নাম অর্থহীন বর্ণসমষ্টির সাহায্যে পরীক্ষা (non-sense syllable experiment)। মনোযোগের পরিধি কতটা (span of attention)? একসঙ্গে কতটা মনে রাখিতে পারি (span of memory)? পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা স্মৃতিশক্তির কতটা উন্নতি হয়? স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় কি (improvement of memory) এ সব সম্বন্ধে থর্ণডাইক্ (Thorndike) কোয়হ্লার (Kohler) প্যাভলভ (Pavlov) ইত্যাদি পণ্ডিতেরা উপযুক্ত পরিচালনাধীনে নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা মূল্যবান নির্ভুল তথ্য আহরণ করিলেন। জেমস্, শেরিংটন (Sherrington) ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানী আবেগের ব্যাখ্যাও শরীরের আভ্যন্তরীন পরিবর্ত্তনের সাহায্যে করিতে চেষ্টা করিলেন। বিনে (Binet) প্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুদ্ধিপরিমাপের উপায় আবিষ্কার করেন।

মনোবিজ্ঞানকে পুরাপুরি ভাবে প্রকৃতি বিজ্ঞানের পদবীতে স্থাপিত

করিবার সব চেয়ে সাহসিক চেষ্টা আসিল ব্যবহারবাদী (Behaviourist) নামে মনস্তত্ত্ববিদদের নিকট হইতে। তাঁহারা বলিলেন যত দিন মনোবিজ্ঞান মন বা চেতনারূপ অজড় (non-material) শক্তিতে বিশ্বাস করিবে ততদিনই ইহা 'রহস্যময়' থাকিবে এবং ইহা প্রকৃত বিজ্ঞানের প্রাপ্য সম্মান হইতে বঞ্চিত থাকিবে। মন বা চেতনা কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। যাহা প্রত্যক্ষ করা যায়, যাহার নির্ভুল পরিমাপ ও পরিচালনা সম্ভব তাহাই শুধু প্রকৃত বিজ্ঞানের বিষয় বস্তু হইতে পারে। যাহাকে আমরা মানস বা চেতনক্রিয়া বলি তাহা বাস্তবিক পক্ষে মস্তিষ্ক, স্নায়ুমণ্ডলী বা শরীরের কোন অংশে কোন পরিবর্তন। যেমন রাগ হইলে দেহের রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, কতগুলি গ্রন্থি (glands) হইতে অধিক পরিমাণে রসক্ষরণ হইতে থাকে, পরিপাকক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, কতগুলি শিরা স্ফীত হয়, মুখমণ্ডল ও চক্ষুতে রক্তের আধিক্য দেখা দেয়, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়, স্বরগ্রাম উচ্চতর হয়, আঘাত করিবার জন্য কতগুলি পেশী উত্তেজিত হয় ইত্যাদি। ব্যবহার বাদীরা বলেন ইহাই রাগের প্রকৃত বিশ্লেষণ। এই দৈহিক পরিবর্তন গুলির অতিরিক্ত কোন অদৃশ্য মন বা চেতনার 'কল্পনা' নিষ্প্রয়োজন এবং অবৈজ্ঞানিক। যে অন্তর্দর্শনকে পূর্ববর্তী মনস্তত্ত্ববিদেরা মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সর্বপ্রধান পদ্ধতি বলিয়া মনে করিতেন ব্যবহারবাদীরা তাহাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। ব্যবহারবাদীরা বলিলেন যে বৃক্ষলতা এমন কি পশুপক্ষীদের জীবন যখন বৈজ্ঞানিকেরা আলোচনা করেন তখন মন বা চেতনার কল্পনা ব্যতিরেকেই ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে মানুষের ক্ষেত্রেই বা ব্যতিক্রম কেন? মানুষও প্রাণী—অবশ্য অন্যান্য ইতর জন্তু হইতে সে উন্নততর, তথাপি মূলত প্রাণীজীবনের প্রকাশ যে ব্যবহার (behaviour), তাহার বিশ্লেষণ ও তাহার নিয়ম আবিষ্কার দ্বারাই মনোবিজ্ঞানকে অন্যান্য বিজ্ঞানের সমপদস্থ করা যায় এবং তাহাই করা উচিত। তা ছাড়া অন্তর্দর্শনের যে প্রণালীর উপর এ যাবৎ মনোবিজ্ঞানীরা নির্ভর করিয়াছেন বৈজ্ঞানিক রীতি হিসাবে তাহা নিতান্তই অ-নির্ভরযোগ্য (unreliable)। একই ঘটনা দেখিয়া বিভিন্ন জনে স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া তাহার যে বিবরণ দেন তাহা অনেক সময় পরস্পর বিরোধী। ইহার একটি চমৎকার উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। "গোটিন্‌জেন সহরে মনোবিজ্ঞান মহাসভার (Psychological congress) অধিবেশন চলিতেছে। হঠাৎ সভাগৃহে দ্রুতবেগে একটি ক্লাউন

ঢুকিল এবং ঠিক তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিল একটি কালো নিগ্রো। নিগ্রোটিকে ক্লাউনটি ধরিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল এবং তাহাকে মেঝেতে ফেলিয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিল। কতক্ষণ ধস্তাধস্তি চলিল এবং তাহার পর একটি পিস্তলের গুলির শব্দ শোনা গেল, ধস্তাধস্তিও শেষ হইল। ইহার পর ক্লাউনটি মাটি হইতে উঠিয়া ঘর হইতে সবেগে দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার পিছে পিছে নিগ্রোটিও ছুটিয়া বাহির হইল। এই ঘটনাগুলি ঘটিতে মোট বিশ সেকেণ্ডেরও কম সময় লাগিয়াছিল। সভাপতি এবার বিস্মিত ও উত্তেজিত সমবেত মনোবিজ্ঞানীদের জানাইলেন যে ঘটনাটি সম্পর্কে ফৌজদারী মামলা করা প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং তিনি অনুরোধ করিলেন উপস্থিত সভ্যরা প্রত্যেকেই যেন ঘটনার এক একটি বিবরণলিপি লিখিয়া পাঠান। ঘটনাটি কিন্তু পূর্ব হইতেই শেখানো ছিল এবং তাহার ফটোও আগেই তোলা ছিল।

চল্লিশটি বিবরণ পাওয়া গেল। এগুলির মধ্যে মাত্র একটি বিবরণী পাওয়া গেল যাহাতে মূল ঘটনা সম্বন্ধে শতকরা কুড়িটির কম ভুল ছিল। চৌদ্দটি বিবরণীতে ভুলের সংখ্যা ছিল শতকরা কুড়ি হইতে চল্লিশ। তেরোটি বিবরণীতে ভুলের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশের বেশী। চব্বিশটিতে শতকরা দশটি এমন ঘটনার উল্লেখ ছিল, যাহা নিতান্তই কল্পনা প্রসূত। বাস্তবিক পক্ষে দশটি বিবরণী ছিল নিতান্ত মিথ্যা, একেবারে কাহিনীর পর্যায়ের, চব্বিশটি ছিল অর্ধকাল্পনিক আর ছয়টিকে বলা যাইতে পারে ঘটনার বিবরণ হিসাবে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য"।[৭] সর্বোচ্চশিক্ষিত মনোবিজ্ঞানীদের অন্তর্দর্শনভিত্তিক বিবরণই যদি এত ভ্রমাত্মক হয় তবে সাধারণ মানুষের অন্তর্দর্শনের উপর আর কতটুকু আস্থা স্থাপন করা যায়?

এসব আপত্তি উত্থাপন করিয়া ব্যবহারবাদী ওয়াট্‌সন (Watson) বলিলেন "ব্যবহারবাদীদের চোখে মনোবিজ্ঞান হইতেছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি অংশ, যাহা শুদ্ধ বস্তুগত (purely objective) ও পরীক্ষণ-নির্ভর (experimental)। এ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইবে মানুষের ব্যবহার কি অবস্থায় কি হইবে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞানলাভ করা এবং তাহা নিয়ন্ত্রণ করা। এ বিজ্ঞানে অন্তর্দর্শন পদ্ধতির কোন মূল্য নাই। এই বিজ্ঞান এখন এমন স্তরে পৌছিয়াছে যে মনোবিজ্ঞানের পক্ষে চেতনা (conscious process) শব্দটি

৭ Walter Lippman—Public Opinion.

পরিত্যাগ করিতে হইবে। এখন মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা, 'চেতনা', 'মানসিকক্রিয়া', 'মন', 'অন্তঃকরণ', 'ইচ্ছা', 'কল্পনা' ও অনুরূপ কথাগুলি বাদ দিয়াও করা যাইতে পারে।"[৮] পিলস্‌বেরীও প্রায় একই কথা বলিলেন, "মনকে আমরা জানি মানুষের ব্যবহারের মধ্য দিযা। কাজেই মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা 'মানুষের ব্যবহার সম্বন্ধে বিজ্ঞান' দিলে ভাল হয়।…অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার মত মানুষকে বাহিরের দিক হইতে বস্তুগত ভাবে আলোচনা করা যায়। সে কি অবস্থায় কি করে এ কথা আলোচনা করিলেই তাহাকে আমরা বুঝিতে পারি। এদিক হইতে দেখিলে মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের সমস্ত কর্ম ও ব্যবহারকে বুঝিতে চেষ্টা করা।"[৯]

বর্তমানযুগের প্রধান মনোবিজ্ঞানীরা সকলেই অল্পবিস্তর ব্যবহারবাদ সমর্থন করেন—কিন্তু ম্যাকডুগ্যাল হইতে সুরু করিয়া, ল্যাসলী, উডওয়ার্থ, মান্‌ সকলেই মনে করেন ওয়াটসনের মত অতিভাষণ দোষদুষ্ট। মনোবিজ্ঞান হইতে চেতনক্রিয়া বা অভিজ্ঞতা (experience) বাদ দিলে তাহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়ে—মনোবিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ শরীরবিজ্ঞানের শাখাতে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। ওয়াটসন্‌ মানুষের শ্রেষ্ঠ চেতনক্রিয়া বস্তুবিরহিত মনন (abstract thinking)-কেও 'বাগযন্ত্রের অস্ফুটক্রিয়া মাত্র' (thought is but subvocal speech) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অধিকাংশ আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। ম্যাকডুগ্যাল ব্যবহারবাদ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ওয়াটসনের উগ্র মতবাদের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে মানুষের ব্যবহার জড় বা ইতর প্রাণীর ব্যবহার হইতে কোন কোন গুরুতর বিষয়ে পৃথক। মানুষের ব্যবহারের সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাখ্যা কখনও সম্ভবপর নয়। মানুষের ব্যবহার সর্বদাই উদ্দেশ্যমুখী (purposeful) সুতরাং মনোবিজ্ঞানকে 'উদ্দেশ্যপূর্ণ ব্যবহারের আলোচনা' বলিলে সংগত হয়। "ব্যবহারের চিহ্ন হইতেছে যে তাহাতে উদ্দেশ্যের লক্ষণ বা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আগ্রহ বা চেষ্টা স্পষ্ট দেখা যাইবে আর জীবিতপ্রাণীরই ইহা ধর্ম, যে তাহার ব্যবহার আছে।" তিনি একটি উদাহরণ দিয়া নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"বিলিয়ার্ড খেলার একটা গোলক খেলার

৮ Watson—Behaviourism : An Introduction to Comparative Psychology.

৯ Pillsbury—Essentials of Psychology.

টেবিলের পকেট হইতে তুলিয়া টেবিলের উপর রাখা যাক। যতক্ষণ পর্যন্ত বাহির হইতে কোন শক্তি ইহার উপর ক্রিয়া না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত গোলকটি সেখানেই থাকিবে। যদি কোন দিকে গোলকটিকে ধাক্কা দেওয়া যায় তবে যতক্ষণ না ধাক্কার শক্তিটা ফুরাইয়া যায় ততক্ষণ ইহা একদিকে গড়াইতেই থাকিবে। টেবিলের ধারের কুশনে লাগিলে অবশ্য তাহা অন্যদিকে যাইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে গোলকের গতিপথ বাইরের শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। এটা হইতেছে জড়ের যান্ত্রিক ক্রিয়ার লক্ষণ। ইহার সঙ্গে এবার জীবিত প্রাণীর ব্যবহারের তুলনা করা যাক।...ধরা যাক্ একজন মানুষ, তাহার দেশকে সে ভালবাসে। জীবিকা উপার্জনের জন্য তাঁহাকে দূর দেশে চাকুরী নিতে হইয়াছে...তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে দেশে ফিরিয়া গিয়া একটি মনের মত বাড়ী তৈরী করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থোপার্জন। তাহার সমগ্র কর্ম এই একটি উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।...এ ব্যক্তির ব্যবহারের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা (mechanical explanation) কখনই সন্তোষজনক হইতে পারে না। কেবলমাত্র শরীর ক্রিয়ার সাহায্যে যান্ত্রিক ব্যাখ্যায় মানুষের প্রাণবন্ত ব্যবহার বুঝিবার সাহায্য হয় না এবং তাহা নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব হয় না"।[১০] আধুনিক মনোবিজ্ঞানী উড্ওয়ার্থও মনোবিজ্ঞানকে কেবলমাত্র শরীরক্রিয়ামূলক ব্যবহারের শাস্ত্র বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার সংজ্ঞা হইতেছে 'Psychology is the science of the activities of the individual in relation to his environment—পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির সমগ্রক্রিয়া, এবং আরো ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন "এই বিজ্ঞানে শুধু মানুষের বিভিন্ন শরীরক্রিয়া যথা হাঁটা, কথাবলা ইত্যাদিই আলোচনা করিবে তাহা নয়, তাহার জ্ঞান ও বোধের বিভিন্ন ক্রিয়া, যেমন, দেখা, শোনা, মনে রাখা, চিন্তা করা এবং অনুভূতির বিভিন্ন প্রকাশ যেমন, হাসি, কান্না সুখী হওয়া, দুঃখিত হওয়া ইত্যাদিও আলোচনা করিবে"।[১১]

এই আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা প্রথম ছিল 'আত্মা বস্তুর সন্ধান' তারপর হইল 'মনের স্বরূপ নির্ণয়', তাহারও পরে হইল 'চেতন প্রক্রিয়া সমূহের আলোচনা. বর্তমানে দেখা যাইতেছে সংজ্ঞাটার

১০ McDougall—Psychology.

১১ Woodworth & Marquis—Psychology. P. 4.

ঝোঁক হইতেছে মানুষের ব্যবহারের আলোচনার দিকে। কিন্তু সে সংজ্ঞাও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মনে হইতেছে না।

মনোবিজ্ঞানের গতির ধারার যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহাকে একটি স্নিগ্ধ পরিহাসরসপূর্ণ ছত্রে এক মনোবিজ্ঞানী প্রকাশ করিয়াছেন—"First, psychology lost its soul, and then it lost its mind, then it lost consciousness. It still has behaviour of a kind."[১২]

ক্রমশই মনোবিজ্ঞানের পরিধি বিস্তারলাভ করিতেছে, মানুষের মনের বিভিন্ন দিক পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ইহাতে মনোবিজ্ঞানের মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমান শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল এবং নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অভূতপূর্ব ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আধুনিক কালে এ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার কিছু পরিচয় দেওয়া যাক্।

ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদের প্রভাব প্রাণতত্ত্বের (biology) গণ্ডী ছাড়াইয়া মনোবিজ্ঞানেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে এখন মনোবিজ্ঞানকে প্রাণতত্ত্বের নিবিড়সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোচনাই করা যায় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে মানুষের ব্যবহার উদ্দেশ্যমূলক। কি সেই উদ্দেশ্য ? বর্তমান পণ্ডিতদের ইহা সিদ্ধান্ত যে মানুষের সমস্ত চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তার। জীবনের ক্রমবিকাশের ধারার সর্বশেষ ফল মানুষের চেতনা। জীবন যতই জটিল হইয়াছে ততই ক্রমশ প্রাণীর মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটিয়াছে, চেতনা ক্রমশঃ আত্মবিকাশ লাভ করিয়াছে। উডওয়ার্থ বলিয়াছেন পরিবেশের সম্পর্কে মানুষের সমগ্র ক্রিয়াই মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। বাস্তবিক পক্ষে মানুষের মন আছে বলিয়াই সে সচেতন ও বিচিত্র উপায়ে পরিবেশের সঙ্গে আপনার সঙ্গতিসাধন করিতে পারে। তাই চেতনার প্রকাশ জীবনের প্রয়োজনেই এবং জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করিয়াই মানুষের চেতন ক্রিয়ার তাৎপর্য বুঝিতে হইবে।

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশবাদের প্রভাব অন্যভাবেও দেখা যাইতেছে। বর্তমান বিজ্ঞানীরা ইহা নিশ্চিত বুঝিয়াছেন মানুষের মন একটা আকস্মিক, বিচ্ছিন্ন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্রিয়া নয়। দেহের বিকাশের দিক দিয়া

১২ Quoted by Woodworth—Psychology.

যেমন, চেতনার বিকাশের দিক দিয়াও তেমনি মানুষ ইতর প্রাণী, এমন কি উদ্ভিদ, সরীসৃপ ও পক্ষীর সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে পারে না। সুতরাং মানুষের মনকে সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে তাহার ক্রমবিকাশের ধারাটি বুঝিতে হইবে। মানুষ একদিনে সভ্যতার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে নাই। আজিও বৃহৎ মনুষ্য সমাজে অনগ্রসর অসভ্য জাতি অনেক আছে। মানুষের জন্মগতসংস্কার (instinct), অভ্যাস (habit), শিক্ষা (learning), নানাপ্রকারের মানসিক বাধা নিষেধ (taboos) ইত্যাদির আলোচনা করিতে গিয়া আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বুঝিয়াছেন যে এ সমস্ত ব্যবহারের মূল গভীর অতীত ইতিহাসে খুঁজিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে লোয়েব্ (Loeb) প্রাণীর সহজাতক্রিয়া এবং উদ্ভিদের আলোর প্রতি অন্ধগতিকে সমশ্রেণীর বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।[১৩] জেমস্ ও লয়েড মর্গান (Lloyd Morgan) এবং অন্যান্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানী মানুষের সহজাত সংস্কারের ব্যাখ্যা পশুদের অনুরূপ সংস্কারের সঙ্গে তুলনা দ্বারা করিয়াছেন। থর্নডাইক ও প্যাভলভ শিক্ষার মূল সূত্র (Laws of learning) ইতর প্রাণীর উপর পরীক্ষা দ্বারাই আহরণ করিয়াছেন। প্রাণীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কৌতূহল এজন্য বর্ধিত হইয়াছে এবং পশুদের ব্যবহার বিজ্ঞান (Animal Psychology) এবং নৃতত্ত্ব (Anthropology) মানুষের মনের অনেক সমস্যা বুঝিবার কাজে সহায়ক হইতেছে।

অনুরূপ কারণে শিশু-মনস্তত্ত্বও নূতন মর্যাদা লাভ করিয়াছে। পরিণত মানুষের মন শিশুমনের সরলতা হইতে ধীরে ধীরে বহু স্তর অতিক্রম করিয়া ক্রমশ জটিলতা লাভ করে। রুশো প্রথম স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে শিক্ষা সফল হইতে হইলে শিশুমনের স্বাভাবিক বিকাশের ধারা অনুসরণ করিতে হইবে। বাল্য হইতে সুরু করিয়া যৌবন পর্যন্ত তিনি চারটি স্তরের উল্লেখ করিয়াছিলেন। রুশোর পর পেসতালৎসীও শিশুশিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের উপর স্থাপনের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন— I wish to psychologize education। শিশুমন সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা অনেকটা আন্দাজের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং শিশুমনের স্তরবিভাগও নির্ভুল ছিল না। কিন্তু তাঁহারাই শিশুমনের সমস্যার দিকে শিক্ষাব্রতীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পূর্বে মনে করা হইত শিশুদের মন বয়স্কমনেরই ক্ষুদ্রসংস্করণ

১৩ J. Loeb—Forced movements, Tropisms and Animal Conduct.

এবং তাহার বিকাশের পথের স্তরগুলি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারিতেছেন যে শিশুর মনের নিজস্ব প্রকৃতি আছে। তাহাদের ইচ্ছা, ভয়, ভাল লাগা, বিচারবুদ্ধি, ঠিক বয়স্ক মানুষদের মনের রীতি অনুসরণ করে না এবং তাহাদের দেহের বিকাশের ক্রমশ ও অবিচ্ছেদ্য ধারার সঙ্গে তাহাদের মনের বিকাশও একসঙ্গে চলে। তাহার মনের বিকাশের স্তরগুলি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন নয়। ক্রমবিকাশের মূল সূত্রগুলি এখানেও ক্রিয়া করে। দেহমনের একত্র ক্রমবিকাশের ধারানুযায়ীই এখন শিশুমনকে বুঝিবার ও ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস প্রচলিত বৈজ্ঞানিক রীতি (the organismic view)। বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধ নিরীক্ষণের ভিত্তিতে শিশুমন বুঝিতে চেষ্টা করেন সর্বপ্রথম প্রেয়ার (Preyer)। তিনি নিজ শিশু সন্তানের জন্মমুহূর্তের পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন (reflexes) হইতে সুরু করিয়া কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাহার দৈনন্দিন ব্যবহার ও পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করিয়া ১৮৮২ সালে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ The mind of the Child প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি শিশুর অনুকরণ-প্রবৃত্তি, অভ্যাসগঠন, ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতাবৃদ্ধি, বিভিন্ন আবেগের প্রকাশ ও বিচার-বুদ্ধির উন্মেষ ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে শিশুর মন নিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলিতে থাকে। ষ্ট্যান্‌লী হল্‌ (Stanley Hall) শিশুর ক্রমবিকাশ ও প্রকৃতি আলোচনাকালে এই মত প্রকাশ করেন যে শিশুর জীবনের বিভিন্ন স্তর সমগ্র মানবজাতির ক্রমবিকাশের ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি (Recapitulation theory)। এ মতটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হইলেও শিশুর জীবনে মানবের অতীত আদিম জীবন হইতে সুরু করিয়া বংশধাবাক্রমে পূর্বপুরুষদের প্রভাব সংক্রামিত হয় ইহা একটি মূল্যবান আবিষ্কার। শিশুর দেহ ও মন গঠনে বংশধারা (heredity) পরিবেশ (environment) কাহার প্রভাব বলবত্তর এ নিয়া আলোচনা বহুদিন হইতেই সুরু হইয়াছিল। Galton ও তাঁহার অনুবর্তী Karl Pearson বংশানুক্রমের প্রভাবকেই বড করিয়া দেখিয়াছেন। অন্যদিকে হেলভেসিয়াস্‌ (Helvetius), রবার্ট ওয়েন (Robert Owen), বাক্‌ল্‌ (Buckle) ইত্যাদি সমাজ সংস্কারক পরিবেশই বাস্তবিকপক্ষে শিশুর দেহমনকে গঠন করে এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। পূর্বে এই বিতর্কের ভিত্তি ছিল বিচ্ছিন্ন ও অসংবদ্ধ নিরীক্ষণ ও কল্পনা (speculation) কিন্তু বিংশ শতাব্দী

হইতে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা ,ইহাই বুঝা যাইতেছে যে এই দুইটির কোনটিরই প্রভাব উপেক্ষা করা যায় না। বংশানুক্রমের অনুকূল বা প্রতিকূল প্রভাব সম্পর্কে ডাগ্‌ডেল্ (Dugdale)[১৩] ইষ্টারব্রুক্ (·Easterbrook)[১৪] ও গডার্ড (Goddard)[১৫] এর দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধানের ফল অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ। ক্যাটেল্ (Cattell) আমেরিকার বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের জীবনকাহিনী সংগ্রহ করিয়া এবং তাহাদের বিশ্লেষণ দ্বারা এ জটিল প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন।[১৬] তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে কেবলমাত্র বংশধারার দ্বারাই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে বিদ্যাবত্তার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। আবার টারম্যান্ (Terman) কালিফর্ণিয়ার এক হাজার তীক্ষ্ণধী ছেলেমেয়ে এবং তাহাদের পিতামাতার বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধি ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া বংশধারার সপক্ষেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[১৭]

এ বিষয়ে বর্তমান কালে আরো বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে। তাহার মধ্যে অল্প কয়েকটির মাত্র নমোল্লেখ করা যাইতেছে। Miss Barbara Burks ২০৪টি ছেলেমেয়েকে পরীক্ষা করেন। ইহাদের অর্ধেক সংখ্যক শিশুকে এক বৎসর হইবার পূর্বেই অন্য পরিবারে পালনের জন্য দান করা হইয়াছে। ইহারা বড় হইয়া উঠিলে তাহাদের নিজ নিজ ভাইবোনদের বুদ্ধি, রুচি ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। কাজেই পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। Leahy, Freeman, Holzinger and Mitchell, Gordon, Asher, Gessell and Thompson, Goodenough, Jones and Terman ইত্যাদি আরো বহু পরীক্ষার উল্লেখ করা যায়। রাশিয়াতে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে Lysenkoর পরীক্ষা সাম্প্রতিক কালে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। মোটের উপর বলা যায় ধনতন্ত্রী দেশের (আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড) বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত বংশগতির সপক্ষে অন্য দিকে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত পরিবেশের প্রভাবের পক্ষে।

---

১৩ R. L. Dugdale—The Jukes 1877

১৪ Dr. A. H. Easterbrook—The Jukes 1915

১৫ A. H. Goddard—The Kallikaks family 1914

১৬ Cattell—A Statistical study of American Men of Science

১৭ Terman—A study of a Thousand gifted children in California.

শিশুদের বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী, কর্মক্ষমতা (activities), বুদ্ধি, আবেগ, ইচ্ছা, সহযোগিতা ইত্যাদির ক্রমবিকাশ, তাহাদের খাদ্য ও ব্যবহার সম্বন্ধে বহুতর সমস্যা নিয়া অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহার মধ্যে Dr. J. A. Hadfield, A. Bowley, Gessell, Dr. Benjamin Spock, Makarenko, Pinkevitch ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বয়ঃসন্ধি (Adolescence) ও অবাধ্যতা (Delinquency) সম্বন্ধে আলোচনা ক্রমশই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিতেছে। এ সম্বন্ধে, Stanley Hall, Cyril Burt, Healy, Bronner, Tredgold, Woodworth এ সামান্য কয়েকজনের নামোল্লেখ মাত্র করা গেল। (এ সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য—শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ ও শ্রীমতী শান্তি দত্ত প্রণীত 'শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা' এবং শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ প্রণীত অবাধ্য শিশু ও শিক্ষাসমস্যা)। শিশুর সুস্থ মানসিক বিকাশে তাহার আবেগের প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণের স্থান সম্পর্কে অনেক চিন্তাশীল মনীষী আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা বিশেষ দরদের সঙ্গে। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সুজান আইজ্যাক্স্, এ্যানা ফ্রয়েড্ ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পূর্বে মনোবিজ্ঞানের আগ্রহ ছিল মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার সাধারণ বিশ্লেষণেই যেমন, স্মৃতি, কল্পনা, আবেগ ইত্যাদির স্বরূপ নির্ণয়ে। কিন্তু ক্রমশই মনোবিজ্ঞানীরা বুঝিতে পারিলেন প্রত্যেক মানসক্রিয়াই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যতায় চিহ্নিত। যদিও সব মানুষের রাগ বা দুঃখ বা কল্পনায় কতগুলি সাধারণ অবস্থা উপস্থিত থাকে তথাপি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যটুকু না জানিলে কোন মানসক্রিয়ারই সম্যক ব্যাখ্যা হয় না। Ward তাই বলিয়াছিলেন Psychology is individualistic—মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-ভিত্তিক। ভুণ্ড এর একজন প্রথম ছাত্র, J. M. Cattell যখন প্রথম মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত পরীক্ষা আরম্ভ করেন তখনই তিনি লক্ষ্য করেন যে সব মানুষের ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা (sense acuity), প্রতিক্রিয়ার ক্ষিপ্রতা (reaction time) সমান নয়। ক্রমশ মানসক্রিয়ার অন্যান্য ক্ষেত্রেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা হইতেই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মাপকের (standardised tests) উৎপত্তি হয়। বিনে ও টারম্যানের বুদ্ধির মাপ এ ক্ষেত্রে প্রথম পথ প্রদর্শক। এ ধারার অনুসরণেই ক্রমশ বিভিন্ন ক্ষমতা ও রুচির পরিমাপের (Aptitude Tests) আবিষ্কার হইয়াছে। বিশেষত গত দুই মহাযুদ্ধের সময়

যখন লক্ষ লক্ষ লোককে সৈন্যদলে নেওয়া হয় তখন কোন্ লোক কোন্ কাজের উপযুক্ত তাহা নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে এ সব পরীক্ষা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় এবং এ সমস্ত পরীক্ষারীতির ও মাননির্ণয়ের প্রভূত উন্নতি হয়। এ সব পরীক্ষার পরিণতি হয় মানুষের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার (Tests of personality) ব্যবস্থায়। বর্তমান মনোবিজ্ঞানে এ সব পরীক্ষার ও তাহার ফলাফলের উপর ক্রমশই অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হইতেছে। এ বিষয়ে Allport, Murray, Woodworth and Marquis, Lewin, Murphy and Murphy, Rorschach ইত্যাদি বিজ্ঞানীর গ্রন্থাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

একদিকে যেমন ব্যক্তিমানস বুঝিবার চেষ্টায় ব্যক্তির বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিকে-মানুষের মনের গতি, বিকাশ ও পরিণতি যে সমাজ জীবনের উপর নির্ভরশীল এ তথ্যটিও মনোবিজ্ঞানীর নিকট গুরুত্ব লাভ করিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে সমাজতত্ত্ব (sociology) ও মনস্তত্ত্ব এখন অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই মনে করা হয় এবং সমাজ মনোবিজ্ঞান এখন যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করিয়াছে, এ বিষয়ে McDougall, Ahmed Sherif, Allport ইত্যাদি মনীষীর নানা আলোচনার উল্লেখমাত্র করা গেল। Le Bon ইত্যাদি বিজ্ঞানী জনতার মন সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন।

বর্তমান কালে মনোবিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে চেতনার রাজ্য হইতে অবচেতনার রাজ্যে। বিজ্ঞানীরা এখন বুঝিতে পারিতেছেন মানুষের মনের ক্রিয়ার সামান্য অংশই প্রকাশ্য ও গোচর। মনের অধিকাংশ অংশই চেতনার স্পষ্টালোকে উদ্ভাসিত নয়। মানুষের ইচ্ছা, বুদ্ধি, উদ্যম, অনুরাগ বিরাগের মূল গভীর অবচেতনার গহনে অবস্থিত সুতরাং পুরাতন মনোবিজ্ঞান যাহা কেবল চেতনপ্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ ও প্রকৃতিনির্ণয়ে ব্যস্ত তাহা মানুষের মনের রহস্যের মূলের সন্ধান পায় নাই। এ প্রায়ান্ধকার রাজ্যের সংবাদ জানিতে হইলে নূতন অনুসন্ধান পদ্ধতির ব্যবহার অপরিহার্য। এ পদ্ধতির নাম মনোবিকলন (psychoanalysis)। এই নূতন ধারা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। যিনি জীবনব্যাপী সহিষ্ণু ও অবিচল অনুসন্ধান দ্বারা মনোবিজ্ঞানের এই ধারাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাঁহার নাম সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)।

তাঁহার বৈপ্লবিক মতবাদ তুমুল বিরুদ্ধতা ও বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং আজও তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। তথাপি ইহাও সত্য যে মানুষের স্বপ্ন ও মনের নানা বিকারের ব্যাখ্যা ও চিকিৎসায় ফ্রয়েডের মত একটি বিপুলসম্ভাবনাপূর্ণ নূতন পথের নির্দেশ. দিয়াছে। আজ ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের libido, repression, complexes ইত্যাদি শব্দ বর্তমান সাহিত্য এমন কি মনোবিজ্ঞান অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের কথাবার্তায় পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে। যে দুইটি বিষয়ে ফ্রয়েডের মত সবচেয়ে বেশী নিন্দা ও সমালোচনার বিষয় হইয়াছে তাহা হইতেছে (১) কামই (sex) হইতেছে জীবনের সমস্ত উদ্যম, শক্তি ও ক্রিয়ার উৎস। মানুষের চেতন ও অবচেতন সমস্ত ক্রিয়ার মূলে আছে কাম আকাঙ্ক্ষা (libido)। (২) এই যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রথম উদ্ভব শৈশবেই এবং শৈশবের যৌন আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক তৃপ্তিসাধনের অভাবই পরিণত জীবনের সমগ্র মানসিক বিকারের কারণ। (এ সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য 'ফ্রয়েড প্রসঙ্গে' প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য)। Freud-এর সহকর্মী ও অনুগামীদের মধ্যে য়ুঙ্গ (Jung) ও এ্যাডলার (Adler) ফ্রয়েডীয় মতবাদের অনেক পরিবর্তন সাধন করেন। ফ্রয়েডের অসংখ্য ছাত্র ও অনুবর্তীদের মধ্যে Hart, Ernest Jones, Melani Klein, Anna Freud, Stekel ইত্যাদি বিশিষ্ট কয়েকজনের মাত্র নাম করা গেল।

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর একটি সম্ভাবনাপূর্ণ নূতন দিগন্তের (a new horizon) সন্ধান দিয়াছেন Rhine ও তাঁহার সহকর্মীরা। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে যাহারা আছে তাহাদের আমরা প্রত্যক্ষ করি ইহা অতিশয় সহজ কথা কিন্তু কখনো কখনো আমরা বহুদূরে অবস্থিত ব্যক্তি বা দ্রব্যের উপস্থিতিও অত্যন্ত অদ্ভুত ও স্পষ্টভাবে জানিতে পারি। আবার দূরে অবস্থিত মানুষের মনের কথাও কেমন করিয়া দেশ ও কালের দুস্তর বাধা অতিক্রম করিয়া আমাদের মনে আসিয়া জানান দেয় (telepathy)। এতদিন পর্যন্ত অতিপ্রাকৃত (super-natural) শক্তির সাহায্যেই এ সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা হইত। কিন্তু Rhine তাঁহার New Frontiers of the Mind গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে আমাদের অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের (Extra-sensory perception) ক্ষমতা আছে। এ বিষয়ে আরো অনুসন্ধান চলিতেছে এবং এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে

পৌঁছিবার সময় আসে নাই। যাহা হউক ইহা একটি নূতন পথের ইঙ্গিত ইহাতে সন্দেহ নাই।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ততই মনোবিজ্ঞানকে আমাদের জীবনের নানা বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহারের চেষ্টা সফল হইতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ রুশো হইতেই আমরা স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই। তাহার পর হইতে সমস্ত উল্লেখযোগ্য শিক্ষাব্রতীই মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষার সৌধ গঠনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কমেনিয়াস্, পেৎস্তালৎসী, হার্বার্ট, জন লক্, এবং বর্তমান যুগে ফ্রোয়েবেল্, মন্তেসরী, জেমস্, ডিউই, কিল্প্যাট্রিক্ সকলেই শিশুমনের উপযোগী করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রণালী প্রণয়নের চেষ্টা করিয়াছেন। বুদ্ধির মাপ, মনোযোগের শ্রেষ্ঠ উপায়, পাঠ্যপুস্তক রচনা, বিস্মৃতির কারণ, শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ সৃষ্টি (motivation), শৈশব কৈশোরের নানা সমস্যা, বিকলাঙ্গ, ক্ষীণবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণধীদের সুশিক্ষার উপায় ('ব্যতিক্রমের বিপদ' শীর্ষক প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য) বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠ উপায়, বিদ্যালয় পরিচালনা, পুরস্কার ও শাস্তি, অবাধ্যতা সংশোধন ও ভবিষ্যৎ জীবিকা নির্বাচনে সদুপদেশ (child guidance) ইত্যাদি শিক্ষার সমগ্র ক্ষেত্রেই আজ মনোবিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ দেখা যাইতেছে।

চিকিৎসার ক্ষেত্রেও মনোবিজ্ঞানের ব্যবহারের অগ্রগতি বিস্ময়কর। পূর্বে উন্মাদ রোগ ও কঠিন মানসিক বিকারকে ভূত, প্রেত ইত্যাদির কুদৃষ্টি জনিত বলিয়াই মানুষ এই সমস্ত হতভাগ্যদের ভয় করিত এবং এ সব রোগ কদাচিৎ দৈব চিকিৎসা (ঝাড়ফুঁক, মাদুলী, জলপড়া ইত্যাদি) দ্বারা আরোগ্য হয় এ কথা মনে করা হইত। কিন্তু দেড়শত বৎসর পূর্বে ফরাসী দেশের মহামতি সমাজসংস্কারক পিনেল্ (Pinel) প্রথম উন্মাদাগারের বন্দীদের মনুষ্যোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। ইতিপূর্বে উন্মাদদের পাগলা গারদে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। অতি অল্প ও কদর্য খাবার দেওয়া হইত এবং তাহাদের উপর অকথ্য শারীরিক অত্যাচার করা হইত। লোকের বিশ্বাস ছিল এই রকম উৎপীড়ন করিলে ভূত রোগীর দেহ ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে। পিনেল্ সাহস করিয়া বিশ্বাস করিলেন আবেগঘটিত মানসিক আঘাতের ফলে উন্মাদ রোগ সৃষ্টি হয়, ইহা একপ্রকার কঠিন মানসিক 'রোগ'। তিনি উন্মাদের শৃঙ্খল মোচন করিলেন তাহাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন এবং সদয় ব্যবহার এবং

ধৈর্যশীল অনুসন্ধান দ্বারা প্রত্যেকটি রোগীর মানসিক বিকারের কারণ নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিলেন। তাহার ফলে বহু রোগী নিরাময় হইল। পিনেল্‌কে তাই রোগের মানসিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের (Psychiatry) জনক বলা হয়। ফ্রয়েড ইত্যাদির অনুসন্ধানের ফলে আজ এই বিজ্ঞান বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। ইতিপূর্বে হিষ্টিরিয়ার চিকিৎসায় মেস্‌মার্‌ (Mesmer), শাঁরকোঁ (Charcot), ব্রুয়ার (Breuer) ইত্যাদি চিকিৎসক সম্মোহন শক্তি (hypnotism) ব্যবহার দ্বারা কিছু সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। ফ্রয়েড্‌ কিছুদিন সারকোঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রথমদিকে তিনিও রোগের চিকিৎসায় সম্মোহনক্রিয়া ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন এ চিকিৎসাপদ্ধতি নির্ভরযোগ্যও নয় নিরাপদও নয়। তা ছাড়া এই পদ্ধতিপ্রয়োগে আরোগ্যও অনেকক্ষেত্রে স্থায়ী নয়। তা ছাড়া ইহাতে রোগের কারণ নির্দ্ধারিত হয় না। তাঁহার বৈজ্ঞানিক মন সম্মোহনক্রিয়াদ্বারা কেন হিষ্টিরিয়া রোগ আরোগ্য হয় ইহা না জানা পর্যন্ত অন্ধভাবে এ পদ্ধতি ব্যবহারে উৎসাহিত হইতেছিল না। তিনি বহু অনুসন্ধান ও চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে বাল্যকালে কোন তীব্র আবেগ অবদমিত হইলে তাহা চেতন মানস হইতে অপসৃত হইয়া গভীর অবচেতনায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। ইহাই সমস্ত মানসিক বিকারের কারণ। যে সমস্ত আবেগ অবদমিত হয় তাহা মূলতঃ যৌনিজ ও অসামাজিক, সুতরাং এ আকাঙ্ক্ষাগুলি ব্যক্তির সামাজিক মন (super ego) তাহাদের সবলে চেতনার তল হইতে নির্বাসন দেয়। ব্যক্তিও তাই এই অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলি সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু অবচেতন মনের বিশৃংখল জটিলতা ও দ্বন্দ্বের মীমাংসা না হইলে নানা মানসিক অশান্তি ও বিকারের আকারে চেতন মনে আত্মপ্রকাশ করে। এ অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইবার উপায় অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে চেতন মনে আনিয়া তাহার সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া তাহার শৃংখলমোচনের ব্যবস্থা করা। বহু পরীক্ষাদ্বারা ফ্রয়েড দেখিলেন যে অবদমিত কামেচ্ছার বন্ধন মোচনের (catharsis) সর্বাপেক্ষা নিরাপদ, নির্ভরশীল এবং স্থায়ী ফলদায়ক উপায় হইল মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণালী (Free association method) দ্বারা মনোবিকলন (psycho-analysis)। স্বপ্নও অবদমিত আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির একটি সহজ উপায় এবং এখন ফ্রয়েডীয় দর্শন অনুযায়ী অনেক অদ্ভুত স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা (Interpretation of

dreams) সম্ভব হইতেছে। এবং মানসিক রোগের চিকিৎসায় বর্তমানে মনোবিকলন পদ্ধতি প্রায়শঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহা স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে।

বর্তমানে শিল্প (industries) বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। শ্রমিক ও কর্মীদের কাহার রুচি কোন দিকে, কাহার দক্ষতা কতখানি এ সব জানিবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা হওয়াতে বহু শ্রমের অপচয় নিবারিত হইতেছে। তাহা ছাড়া বুদ্ধিমান শিল্পপতিরা সন্তুষ্ট শ্রমিকদের সাহায্যে কি করিয়া উৎপাদন ও লাভ বৃদ্ধি করা যায় তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য মনোবিজ্ঞানীর দ্বারস্থ হইতেছেন। ফ্যাসান ও বিজ্ঞাপন আজ একান্তভাবে মনোবিজ্ঞানাশ্রয়ী মনোহরণের শিল্প (the art of attraction)। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'ওরা কাজ করে' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। আজ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) এবং শিল্প-মনোবিজ্ঞান (Industrial psychology) বর্তমান জীবনের পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক নানা সমস্যা সমাধানের জন্যও আজ মনোবিজ্ঞানীর ডাক পড়ে। প্রেম ও বিবাহের বহুবিধ সমস্যা আলোচনা এবং বিরোধ ও সন্দেহ নিরসনের জন্য আজ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় মনোবিজ্ঞানীদের অজস্র উপদেশাগার (counselling bureaus) আছে। বিভিন্ন পত্রিকায়ও এজন্য পৃথক বিভাগ থাকে। সেখানে ব্যক্তিগত সমস্যা জানাইলে মনোবিজ্ঞান সম্মত সমাধানের উপায় বলিয়া দেওয়া হয়। এ সব সমস্যা কত বিচিত্র রকমের! এক মেয়ে জানাইলেন যে তাহার জন্মদিনে বেগুনী রংয়ের টাই পরিয়া আসিয়াছিল প্রণয়ী, যদিও বহুদিন পূর্বে একবার সে প্রণয়ীকে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিল যে বেগুনী রং তাহার অপছন্দ। এ ক্ষেত্রে সে আর প্রণয়ীকে প্রশ্রয় দিবে কিনা? এক বিবাহেচ্ছু যুবক জানাইলেন যে যে মেয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে সে একজন সুপুরুষ অবিবাহিত শিল্পপতির অফিসে টাইপিষ্ট এবং সেই উপরওয়ালা তাহার ভাবী পত্নীকে (fiance) মাঝে মাঝে ফুল উপহার দেন। এ ক্ষেত্রে তাহার এ মেয়েকে বিবাহ করা নিরাপদ হইবে কিনা? আর এক তরুণী পত্নী প্রশ্ন করিলেন তাহার স্বামী শনিবার সন্ধ্যায় কিছু বেশী মাত্রায় মদ্য পান করেন, কিন্তু প্রতিবারই বাড়ী ফিরিয়া অত্যন্ত অনুতাপ প্রকাশ করেন এবং

স্ত্রীকে মূল্যবান কিছু উপহার দেন, এ অবস্থায় সে স্বামীর মদ্যপানে বাধা দিবে কিনা?

আজ সাহিত্যের উপজীব্য মানুষের চেতন ও অবচেতন মনের বিচিত্রলীলা। মহৎ জীবনের আখ্যান বা বৃহৎ আদর্শের জয়গান আজ আর সাহিত্যকে উদ্বুদ্ধ করে না। মানুষের জটিল মনের কুটিল পথ অনুসরণেই সাহিত্যিকের কৃতিত্ব। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও আজ মনোবিজ্ঞান অপরিহার্য। প্রত্যেক রাষ্ট্রই আজ কোন না কোন অর্থ নৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় আদর্শের (ideology) সমর্থক। এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ অস্তিত্বরক্ষার জন্য এবং গৌরববৃদ্ধির জন্য তাহার অধীনস্থ নাগরিকদের অকুণ্ঠ সমর্থন দাবী করে। ইহার জন্য চাই সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত প্রচার (propaganda)। এই প্রচার সফল হইতে হইলে তাহা মনোবিজ্ঞানের রীতিসম্মত হইতে হইবে। তাই রাষ্ট্ররূপ সর্বগ্রাসী সংস্থার প্রত্যেক স্তরে কত ব্যাপক ও সুকৌশল মনোবৈজ্ঞানিক অভিযান। সোভিয়েট রাশিয়া স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছে যে তাহার সমগ্র সমাজ-জীবন পরিচালনা এবং শিক্ষাব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য কম্যুনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী নাগরিক সৃষ্টি করা। অনুরূপ ভাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও বিশ্বাস করে ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক গণতান্ত্রিক কাঠামোই শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং সেই উদ্দেশ্যেই পৃথিবীর "স্বাধীন" সমস্ত মানুষের কাছে এই আদর্শের জয়গান ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্য রাষ্ট্রের বিপুল প্রচার যন্ত্রের পৃথিবীব্যাপী ব্যবহার। এই যুগের দুই অমিত শক্তিশালী রাষ্ট্রগোষ্ঠির মধ্যে যে 'ঠাণ্ডা লড়াই' (cold war) চলিতেছে তাহাও মনোবৈজ্ঞানিক যুদ্ধের (psychological warfare) প্রকাশ্য ভদ্ররূপ। আজ রাষ্ট্রের এই সর্বগ্রাসী দাবীতে (totalitarianism) ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন। ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও ইচ্ছা রাষ্ট্র সচেতন চেষ্টা দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত (regimentation) করিতেছে। এ্যাটম্ বোমার চেয়ে এই মনোবৈজ্ঞানিক অস্ত্রের শক্তি কম নয়। জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার On liberty গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন যে পৃথিবীর সভ্যতার ক্রমোন্নতির মূলে সর্বদাই আছে অসাধারণ মানুষের স্বাধীন মৌলিক চিন্তা। যে সমাজ ও রাষ্ট্রে এই খাপছাড়াদের (eccentric) সম্মান নাই তাহার অবনতি অপরিহার্য। বর্তমানে রাষ্ট্রের ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিবার যে সক্রিয় উদ্যম দেখা যাইতেছে তাহাতে পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা (যথা রাধাকৃষ্ণন, বার্ণার্ড শো, বারট্রাণ্ড রাসেল্) আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। ডীন্ ইঞ্জ (Dean Inge) একদা

সর্বনাশের পথে বিজ্ঞানের অগ্রগতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "Science should take a holiday"—আজ মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও বোধ হয় অনুরূপ সাবধানবাণী উচ্চারণের সময় আসিয়াছে। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানীকেও শপথগ্রহণ করিতে হইবে যে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় কল্যাণ উদ্দেশ্যেই এই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করিতে হইবে।

পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের পথে মনের রহস্য উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত। বাস্তবিকপক্ষে 'রহস্য' কথাটি কোন বিজ্ঞানের সম্বন্ধে ব্যবহারই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কাছে আপত্তিজনক। কারণ 'রহস্যময়' (mysterious) কথাটির তাৎপর্য হইতেছে যাহা যুক্তিগত বিশ্লেষণ বহির্ভূত—যাহা কোন অপ্রাকৃত (supernatural) বা ভৌতিক শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যাহার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নির্দেশ সম্ভবপর নয়। মনোবিজ্ঞানী বলিবেন মানুষের মনের ক্রিয়া অতিশয় জটিল,—বিচিত্র তাহার গতি—বহুবিস্তৃত তাহার শাখাপ্রশাখা, কিন্তু তাহা কারণহীন নহে, তাহার যুক্তিগত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা (rational analysis and explanation) দুরূহ হইলেও অসম্ভব নহে। মানুষের মনের বিচিত্র গতি অনুসরণে বিজ্ঞানী নিত্যনূতন সত্য আবিষ্কার করিতেছেন। ইহার বহুস্তর বা বিভাগের সন্ধান পাইতেছেন কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহারা আজ নিশ্চিত যে মানুষের মন দেহাশ্রয়ী এবং শরীরক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করিয়াই মনের বিচিত্র লীলার ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

ভারতীয় দর্শন মনকে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির সামান্যমাত্র অংশ মনে করে। ভারতীয় দার্শনিক মনকে একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া গণনা করেন। ইহা অন্তরিন্দ্রিয়। ইহা বুদ্ধি ও অহংকারের ভৃত্যমাত্র। মানুষ আত্মবিস্মৃত—মায়াচ্ছন্ন। তাহার অন্তরে বিভিন্ন কোষের দ্বারা আবৃত কত মহৎ শক্তি লুক্কায়িত আছে সে সম্বন্ধে সে সচেতন নয়। যোগদর্শন মানুষের 'চিত্তবৃত্তি'র যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। তন্ত্রশাস্ত্র ও বৌদ্ধ দর্শনে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ও তাহার বিভিন্ন স্তর ও ক্রিয়ার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণকে হার মানায়। তবে ভারতীয় দর্শনের আলোচনার পথ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতীয় দর্শন প্রত্যক্ষ ও অনুমানের পথে শুধুমাত্র বুদ্ধির পরিতৃপ্তিই (intellectual satisfaction) খোঁজে না। তাহার উদ্দেশ্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির পথে আত্মোপলব্ধি। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানী মনকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে চান,

ব্যবহারিক জীবনে সুখ ও আরামের জন্য। ভারতীয় দর্শন ব্যবহারিক জ্ঞানকে গৌণ এবং সাংসারিক সুখকে তুচ্ছ বলিয়া গণ্য করেন। 'আত্মানং বিদ্ধি'—সাংসারিক সুখ ভোগের জন্য নয়, নিজের মধ্যে ব্রহ্মকে আবিষ্কারের জন্য। তাহাই পরাবিদ্যা—সমস্ত অপরাবিদ্যার তাহাই শেষ উদ্দেশ্য। তপশ্চর্যার দ্বারা আপনাকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও শান্ত করিতে পারিলে তবেই প্রকৃত জ্ঞানের দ্বার অবারিত হইবে। যিনি নিজেকে জয় করিয়াছেন সমস্ত সিদ্ধি তাহার করায়ত্ত। ইহা অলীক কল্পনা নয়—ভারতীয় ঋষিরা সেই সাধনার পথ নিজের জীবনে অনুশীলন করিয়া দেখাইয়াছেন। সেই ঋষিপ্রবর্তিত পথে চলিয়া যুগে যুগে মানুষ পরম শান্তির আস্বাদ লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের, উপযুক্ত পরীক্ষা ব্যতীত, সেই প্রাচীন পন্থাকে উপহাস ও উপেক্ষাদ্বারা অস্বীকারের অধিকার নাই।

বুদ্ধির চাষ

নিজেদের বুদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের সবারই একটা গর্ব আছে। এবং সহজে অন্যকে নিজের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্ বলে স্বীকার করতে আমরা চাই না। অপরের মধ্যে বুদ্ধির লক্ষণ দেখে আমরা ঈর্ষান্বিত হই. মোট কথা, 'বুদ্ধি' জিনিসটাকে আমরা যথেষ্ট দামী বলে মনে করি। নিজের স্ত্রী আর চাকরের বুদ্ধি একটু কম থাকুক এটাই আমরা মনে মনে চাই—তা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই আমরা বুদ্ধিমান্ মানুষ পেলে খুসী হই। আমরা বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতী ছেলে-মেয়ে চাই—বুদ্ধিমান্ শিক্ষক চাই, বুদ্ধিমান্ শাসক চাই, বুদ্ধিমান্ এন্‌জিনীয়ার চাই, বুদ্ধিমান্ ডাক্তার চাই, বুদ্ধিমান্ বন্ধু ও সুহৃদ চাই। বুদ্ধি সুলভ নয়—বুদ্ধি বাস্তবিকই দামী পদার্থ।

ভবিষ্যৎজীবনে যাঁরা প্রতিভাসম্পন্ন হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন, অনেক সময় বাল্যেই তাঁদের অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেছে। বালক বিদ্যাসাগর পথের ধারে ধারে মাইল-স্টোনে—পাথরে খোদাই ইংরেজী সংখ্যা দেখে দেখে, ইংরেজী না জানা সত্ত্বেও ইংরেজী সংখ্যা-রীতি শিখে ফেললেন। মেকলে তিন বৎসর বয়স থেকেই বই নিয়ে পড়তে ভালবাসতেন এবং সাত

বৎসর বয়সে তিনি যে কবিতা লিখতেন তাতে যথেষ্ট ভাষাজ্ঞান ও বিকশিত ঐতিহাসিক কল্পনার আভাস পাওয়া যায়। একটু নমুনা দিচ্ছি—

Day set on Cambria's hills supreme
And, Menai, on thy silver stream,
The star of day had reached the West,
Now in the main, it sank to rest.
Shone great Eleindyn's castle tall
Shone every battery, every hall.

গ্যেটেও সাত বৎসর বয়সে চমৎকার রসপূর্ণ সংলাপ রচনা করতে পারতেন। নয় বৎসর বয়সে তিনি নিজস্ব বুদ্ধিতে দেবপূজার এক বেদী রচনা করেন এবং পুরোহিতের সাহায্য ব্যতিরেকেই ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তির জন্যে এক নূতন রহস্যময় ধর্মের প্রচলন করলেন।

রবীন্দ্রনাথের একেবারে শৈশবে রচিত কবিতাও কম রসাশ্রয়ী নয় এবং তাতে পরিণত ছন্দজ্ঞানের পরিচয় মেলে—

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি,
তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে;
হাপুস্ হুপুস শব্দ
চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

পাস্ক্যাল শিশুকালেই নানারকম রেখাঙ্কন ভালবাসতেন এবং তাঁর ভীষণ আগ্রহ ছিল বীজগণিত ও জ্যামিতি শিখবেন। কিন্তু বাপ বললেন গ্রীক ল্যাটিন আগে ভালো করে শেখো। ছেলে গ্রীক ল্যাটিন শেখেন, আর ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে মেঝেতে খড়ি দিয়ে নানা ছবি এঁকে এঁকে নিজে নিজেই ইউক্লিড-এর ৩২ প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত আয়ত্ত করে ফেললেন।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ চার বৎসর বয়সে গ্রীক ল্যাটিন ও ইতিহাস শিক্ষা সুরু করেন। ছয় বৎসর বয়সে তিনি রোমের একটি ইতিহাস রচনা করতে সুরু করলেন। তার গোড়ার কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, তাতেই তাঁর বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বালক মিল্ লিখেছিলেন—

"We know not any part, says Dionysius of Halicarnassus, of the history of Rome till the Sicilian invasions. After the expulsion of the Sicilians, Iberian Kings reigned for several years, but, in the time of Latins...

আর উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে কি ?

বর্তমানে বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক পরিমাপের যে ব্যবস্থা আছে তাতে উপরের কয়টি উদাহরণের প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই বুদ্ধি বড মাপের। সাধারণ মানুষের বুদ্ধির মাপ ধরা হয় ১০০, আর এঁদের সকলেরই বুদ্ধির অঙ্ক ১৪০-এর কোঠা পেরিয়ে। এঁদের বুদ্ধি দেখে আমরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। এমন বুদ্ধির দীপ্তি আমাদের ঈর্ষার উর্ধ্বে।

এর বিপরীত উদাহরণও যে না আছে তা নয়। আমাদের কবি-রাজচক্রবর্তী কালিদাস নাকি যে গাছের ডালে বসে আছেন তারই গোড়া কুড়ুল দিয়ে কাটতে উদ্যত হয়েছিলেন, আর 'উষ্ট্র' উচ্চারণ করেছিলেন একবার 'উষ্ট', আর একবার 'উট্র'।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারুইন সম্বন্ধে তাঁর শিক্ষকদের ধারণা ছিল ছেলেটি একটি 'বুদ্ধু'—আস্ত হাঁদারাম।

গান্ধীজী তাঁর আত্মজীবনীতে নিজের বাল্যজীবনের অনেক বোকামি ও দুষ্টুমির কথা উল্লেখ করেছেন।

এঁরা তাহলে বুদ্ধিমান্ হলেন কি করে ?

সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখ আছে কালিদাস নাকি সরস্বতীর বর পেয়ে মহাকবি হয়েছিলেন। গান্ধীজীরও ধারণা 'রাম নাম' তাঁকে রক্ষা করেছে দুর্দৈব থেকে।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে দেবতার বর বা নাম-মাহাত্ম্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসাবে অচল। তাই এসব ক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে—এঁদের কি নূতন করে বুদ্ধি গজিয়েছিল ? নাকি এঁদের বুদ্ধি প্রতিকূল অবস্থায় আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়নি, শেষে অবস্থা অনুকূল হওয়াতে কৃতবিদ্য শিক্ষকের যত্নে সুপ্তবুদ্ধি নিজেকে প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়ে আত্মবিকাশ করেছে ? যদি বুদ্ধি গজায়, তবে তা কি করে গজায় ? যদি সুপ্তবুদ্ধিই আত্মপ্রকাশ করে থাকে, তবে বুদ্ধির চাষের উপায়টা কি ?

শিক্ষকের কাছে এ প্রশ্নগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক হিসাবে আমাদের

এ বিশ্বাস বদ্ধমূল, সুশিক্ষার ফলে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে—বোকা ছেলেও চালাক হয়। এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই আমরা অনেক সময় সাধ্যাতীত খরচ করেও আমাদের ছেলে-মেয়েদের 'ভালো স্কুলে' পাঠাই—ভালো গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করি। শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখি, যাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ তাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন এজন্যে যে, তাঁরা পথনির্দেশ করেছেন—কি ভাবে ভালো করে, আরো ভালো করে শেখানো যায়।

তবে কি একথা সত্য যে শিক্ষাদ্বারাই বুদ্ধি বাড়ে? শিক্ষক আর তাঁর প্রণালীর উপরই নির্ভর করে ছাত্রের মানস-উৎকর্ষ?

এ বিষয়ে খুব জোরে 'হাঁ' বা 'না' বলবার পথে কতকগুলি বাধা আছে।

এ কথা বিশ্বাস করবার সঙ্গত হেতু আছে যে, 'বুদ্ধি'র মৌলিক শক্তি (তা এক, না বহু, এ নিয়ে তর্ক আছে) জন্মগত। সব ছেলে সমান বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় না—সবার বুদ্ধির বিকাশের হার সমান নয়—সবার উন্নতি সমান হয় না। একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই বুদ্ধি শিক্ষার দ্বারা বিকশিত হতে পারে। একই ভালো বা মন্দ স্কুলে একই বয়সের বহু ছেলে-মেয়ে একই ধরণের শিক্ষা পায়, কিন্তু সব ছেলে-মেয়েই বুদ্ধিতে সমান হয় না। আবার কোনো কোনো পরিবারের ছেলে-মেয়েরা অন্যের তুলনায় লেখাপড়ায় ভালো এটাও দেখা যায়। অবশ্য লেখাপড়ায় ভালোমন্দই 'বুদ্ধি'র একমাত্র লক্ষণ নয়।

ইংল্যাণ্ডে ফ্রান্সিস গ্যালটন ও কার্ল পিয়ার্সন দুজনে মিলে ওয়েজউড-ডারুইন-গ্যালটন নামে তিনটি নিকটতম সম্বন্ধযুক্ত পরিবারের একহাজার বৎসরের বংশতালিকা সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন যে, এই তিনটি পরিবারে বিভিন্ন পুরুষে বহু বহু বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মেছেন—যাঁরা রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যে কীর্তি অর্জন করেছেন।

ডাগ্‌ডেল নিউ ইয়র্কের ষ্টেটের কারাগারসমূহের বড়কর্তা ছিলেন। অনেক বৎসরের কয়েদীদের নাম-লেখা খাতা দেখতে দেখতে তাঁর খেয়াল হল একটা বংশপদবী বারে বারেই পাওয়া যাচ্ছে। তিনি কয়েক বৎসর ধরে এই বংশের মানুষদের বিভিন্ন পুরুষের তালিকা ও পরিচয় সংগ্রহ করে দেখলেন—এটি একটি 'দাগী' বংশ—এই বংশের বহু বহু লোক চোর, ডাকাত, খুনে—এদের পরিবারে মেয়েদের মধ্যেও দুশ্চরিত্রা, কলহপরায়ণা, চৌর্য ও অন্যান্য অপরাধে অভিযুক্তাদের সংখ্যা সাধারণত অনেক বেশী। ডাগ্‌ডেল 'দ্য জুকস' (The Jukes 1877) এই ছদ্মনামে এই বংশের ইতিহাস প্রকাশ করেন।

আর একটা ব্যাপারও লক্ষণীয়। বুদ্ধি 'পরিমাপের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা বহু পরীক্ষার পর দেখা গেছে যে বিভিন্ন বয়সে, বারে বারে পরিমাপে, একই ব্যক্তির বুদ্ধির মানের (I. Q.) মোটামুটি খুব বেশী পরিবর্তন হয় না।

একই পিতামাতার যমজ দুটি ছেলেমেয়ের একটিকে অন্য পরিবারে শিশু-কালেই বিচ্ছিন্ন করে অধিকতর সুষ্ঠু শিক্ষার সুযোগ দিয়ে বহুবৎসর পরীক্ষার পর দুই যমজ ভাইবোনের বুদ্ধির মানের খুব বেশী পার্থক্য দেখা যায় না। ইতি-মধ্যে যাঁরা যমজদের একটিকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নিজেদের বহুবৎসর পরে একটি সন্তান হ'লে, সে সন্তান যখন স্কুলে যাবার মতো বড় হলো তখন তার বুদ্ধির মাপ নিয়ে দেখা গেল—সে দত্তক-পুত্রটির চেয়ে বেশী 'বুদ্ধিমান', যদিও দত্তক-পুত্র অনেক বেশীদিন তার পালক পিতামাতা ও সুশিক্ষকের কাছে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। এরকম বিভিন্ন পরিবারে পালিত যমজ সন্তানদের সম্পর্কে আমেরিকায় মিস্ বারবারা বার্কস্ এবং তার পর মিনেসোটাতে লীহি অনুসন্ধান করে প্রায় একই রকম সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। মিস্ বার্কস্ বলেছেন "বংশগতির মোট প্রভাব সম্ভবত শতকরা ৭৫ থেকে ৮০"।

ইংলণ্ডে প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ সীরিল্ বার্ট-ও সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বুদ্ধির পরিমাণ প্রধানত বংশগতির উপরই নির্ভর করে। লণ্ডন নগরীতে ছোট শিশুদের সরকারী বিদ্যালয়ে অপরাধপ্রবণ শিশুদের সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করে। তখন কর্তৃপক্ষ সীরিল বার্টের উপর ভার দেন এ বিষয়ে কারণ অনুসন্ধান ও ত্রুটি সংশোধনের উপায় নির্ধারণের। প্রায় অনুরূপ কারণেই কয়েক বৎসর পূর্বে প্যারী ম্যুনিসিপ্যাল স্কুলগুলিতে ছাত্রদের পেছিয়ে-পড়ার হেতু অন্বেষণ করার কাজে রত ফরাসী মনোবিজ্ঞানী বিনে বুদ্ধি-পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক রীতি আবিষ্কার করেছিলেন। সীরিল্ বার্ট উচ্চবংশজাত, উচ্চশিক্ষিত, বিখ্যাত ডাক্তারের ছেলে। কিন্তু তথ্যানুসন্ধানের জন্যে তিনি পরিচয় গোপন করে সাদাসিধে পোশাকে বহু সহস্র কিশোর অপরাধীদের সঙ্গে মিশে বহু মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হন। তাঁর বহু বৎসরের অন্বেষণ ও চিন্তার ফল তিনি তাঁর বহুপ্রশংসিত বিখ্যাত গ্রন্থ The Young Delinquent-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে তিনি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, স্বল্পবুদ্ধি অপরাধ-প্রবণতার একটি মূল কারণ। যদিও অপরাধী হয়েই বা অপরাধপ্রবণ মন নিয়েই শিশু জন্মগ্রহণ করে না, কিন্তু বুদ্ধির স্বল্পতা এবং অনুভূতির ক্ষেত্রে

অস্থিরতা (emotional instability) জন্মগত, এবং অধিকাংশ অপরাধীর মধ্যেই এ দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিকাগো সহরে অপরাধীদের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে ডাঃ হীলি-ও একইরূপ সিদ্ধান্তে পৌছেন। ডাঃ গোরিং বিলাতের বহু জেলখানার কয়েদীদের সযত্ন পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেছেন—"The one characteristic common to the offences of 90 p. c. of 150,000 persons convicted to prison every year—the one characteristic apart from their intolerableness to a well-ordered society—is the incredible stupidity of these offences."

বুদ্ধির উন্নতি শুধুই কি বংশগতির উপর নির্ভর করে? বিপরীত সিদ্ধান্ত করেছেন অনেক মনীষী ব্যক্তি—তাঁদের মধ্যে লক্ ও হেল্‌ভেসিয়াসের নাম করা যেতে পারে। লক্ বলেছেন—সমস্ত জ্ঞান-ই বাইরের থেকে শিশু আহরণ করে—যত বেশী জ্ঞান সে আহরণ করবে ততই তার বুদ্ধি বাড়বে। তার সুশিক্ষা মানে তাকে অধিক হতে অধিকতর জ্ঞান-আহরণের সুযোগ দেওয়া। হেল্‌ভেসিয়াস বলেছেন—বুদ্ধি জন্মের থেকেই নির্দিষ্ট, এটা ঠিক নয়—উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত যত্ন ও চেষ্টার ফলে বুদ্ধির বৃদ্ধি ঘটে।

এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার কথা উপেক্ষা করা যায় না। খারাপ ছেলে (মানে, পিছিয়ে-পড়া ছেলে) ভালো স্কুলে ভালো শিক্ষকের সাহচর্যে অনেকখানি উন্নতি করে, আবার ভালো ছেলেও ভালো স্কুল থেকে খারাপ স্কুলে বদলি হলে অনেক সময় ভোঁতা হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের ফলও বিবেচ্য। ইতিপূর্বে জ্যুকস্-পরিবারের ইতিহাস বর্ণনা করেছি। প্রতিকূল বংশগতির ফল সেখানে সুপরিস্ফুট। এই জ্যুকস্-রা পরবর্তীকালে নিজেদের সংকীর্ণ গ্রামের গণ্ডী ছেড়ে অন্যত্র অনুকূল পরিবেশে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। সেখানে তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং ভালো পরিবারে তারা বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করে। দুইপুরুষেই তাদের পরিবারের কলঙ্কিত ইতিহাস লুপ্ত হয়ে নূতন উদ্যম ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যুক্‌স্‌দের এই পরবর্তী ইতিহাস সংগ্রহ করেন ডাঃ ইষ্টাব্রুক, ১৯১৫ সালে। এখানে অনুকূল পরিবেশের ফলে বুদ্ধি ও চরিত্রের উন্নতি লক্ষণীয়।

পরিবেশবাদের পরিপোষক কিছু বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফল উল্লেখ করা যাচ্ছে। গ্যাল্‌টন একই বংশে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনী সংগ্রহ করে প্রমাণ করলেন—উন্নত বুদ্ধি বংশগত। কিন্তু আমেরিকাতে ক্যাটেল্

সে-দেশে বহু বিজ্ঞানীদের জীবন আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন—"দেশের বিভিন্ন অংশে যে বিজ্ঞানীরা আছেন, অঞ্চল-বিভেদে তাঁদের সংখ্যার যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। গ্যাল্‌টনের সিদ্ধান্ত, যে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির উৎকর্ষের জন্য বংশগতিই দায়ী, উপরোক্ত ঘটনা তার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি। বৈজ্ঞানিক ও অন্য বিষয়ে বুদ্ধির উৎকর্ষ লোকবসতির ঘনতা, বিত্ত, উপযুক্ত সুযোগ, প্রয়োজনীয় সরঞ্জামপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, সামাজিক আচার, বিশ্বাস ও আদর্শের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

ফ্রীম্যান্‌, হোলৎসিঙ্গার ও মিচেল্‌ কয়েক জোড়া ছেলে-মেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন। তাদের মধ্যে একজন নিজ পিতামাতার কাছেই বড় হয়, আর একটি অন্য পরিবারে দত্তক হিসাবে গৃহীত হয়। তাঁদের পরীক্ষার ফলে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভালো পরিবারে যত্নের সঙ্গে পালিত হলে, দত্তক সন্তানদের, নিজ পরিবারের সন্তানদের চেয়ে অনেক বেশী উন্নতি হয়।

ইংল্যাণ্ড বংশগতির আপেক্ষিক গুরুত্বে অধিকতর আস্থাশীল। তাঁরা রক্ষণশীল, উচ্চবংশের উৎকর্ষে তাঁদের এখনও যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি আছে। তাঁদের দেশের বিজ্ঞানীদের, পরীক্ষার ফলও মোটামুটি তাঁদের এই ধারণার পোষক। তাই সে-দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চবংশীয়দের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা সে-দেশের মানুষ মেনে নিয়েছে। ইটন, হ্যারো ইত্যাদি পাবলিক স্কুলের দ্বার এখনও দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের সন্তানদের জন্য রুদ্ধ। পাবলিক পরীক্ষাতে খুব ভালো ফল করে বৃত্তি পেলে তবেই উচ্চবংশীয় ছেলেদের সঙ্গে পাবলিক-স্কুলে প্রবেশের অধিকার জন্মে।

আমেরিকার ঐতিহ্য অধিকতর ডেমোক্র্যাটিক—সেখানে বংশের ভিত্তিতে জাতিভেদ নেই। কিন্তু বুদ্ধি-বিচারের ভিত্তিতে তাঁরা ভালো, মন্দ, মাঝারী বাছাই করে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী। তা ছাড়া বুদ্ধির পরীক্ষায় কার কোন্‌ দিকে রুচি, আগ্রহ ও দক্ষতা এটা তাঁরা গোড়াতেই পরীক্ষা করে সে অনুযায়ী ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াটা সঙ্গত মনে করেন।

রাশ্যার নতুন সোভিয়েট সমাজ বংশমর্যাদার ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁরা এ মত প্রচার করতে চান যে, মানুষে মানুষে প্রভেদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসাম্যের জন্যেই ঘটে থাকে। উপযুক্ত যত্ন ও সুযোগ পেলে আপাতদৃষ্টিতে ভোঁতা ছেলেরাও চালাক হয়ে ওঠে। তাঁরা বুদ্ধি-পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতিকে ক্যাপিটেলিস্টদের ভাঁওতা মনে করে সন্দেহের চোখে দেখেন। তাঁরা মনে করেন, প্রত্যেক শিশুর আত্মমর্যাদা-বোধ জাগ্রত করে তার বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ দিলে তার বুদ্ধির উন্নতি হবেই। তাঁরা মনে করেন, বুদ্ধি ব্যক্তিত্বের একটা ক্ষুদ্র অংশ—সেটাকে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড অতিরিক্ত মূল্য দিচ্ছে। তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তিত্ব-বিকাশের প্রধান উপায়—বই-পুস্তক-অঙ্ককষা শুভঙ্করী মুখস্থ করা নয়। এর প্রধান উপায় হচ্ছে প্রচুর দৈহিক পরিশ্রম—দেশের বাস্তব কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত নানা গঠনাত্মক কাজে সহযোগিতার ভিত্তিতে কর্মোত্তম। পশ্চিমী সমাজের ব্যক্তিগত উৎকর্ষের দিকে যে ঝোঁক, তা প্রতিযোগিতামূলক,—তাই সেখানে বুদ্ধির অতিরিক্ত দাম। সোভিয়েট সমাজে সমষ্টিগত উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি, তাই তা গঠনাত্মক ও সহযোগিতামূলক এবং সেখানে তাই শ্রমের এত মূল্য। এ বিষয়ে গান্ধীজীর বেসিক এডুকেশনের আদর্শের সঙ্গে রাশ্যার আদর্শের মিল আছে। রাশ্যাতে তাঁরা এই সহযোগিতা-মূলক গঠনাত্মক কাজে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ও আত্মমর্যাদার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির সুযোগ দিয়েই দেশ থেকে শিশু-অপরাধ (Child delinquency) সমস্যার সমাধান করেছেন।

মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত—বুদ্ধির উৎকর্ষ সম্বন্ধে বংশগতিবাদ ও পরিবেশবাদের মধ্যে সমন্বয়-স্থাপনের পক্ষপাতী। বুদ্ধি মূলত জন্মগত এবং তার উৎকর্ষ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। গাধা পিটিয়ে মানুষ করা চলে না। নিতান্ত যে বোকা (idiot) ছেলে, সে শত চেষ্টাতেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি (superior) ছেলেতে পরিবর্তিত হবে না। বুদ্ধি জন্মগত হলেও অপরাধপ্রবণতা ও রোগ সম্ভবত জন্মগত নয়। মদ্যপ ও আর্থরাইটিস্ রোগীর ছেলেও অনুরূপ হবে এমন কোনো কথা নেই। উপযুক্ত যত্ন, খাদ্য, সহানুভূতি-সম্পন্ন ব্যবহার, প্রশংসা, সুযোগ, বন্ধু ও প্রিয়জনের কল্যাণ-প্রত্যাশা, বিশুদ্ধ ও উৎসাহপূর্ণ পরিবেশে অনেক সুপ্তগুণ প্রকাশ পায়—বুদ্ধির অনুকূল বিকাশ ঘটে। কিন্তু এ উৎকর্ষ-সাধন সীমাহীন নয়। ব্যক্তির জন্মগত বুদ্ধি ও শক্তির সীমার মধ্যেই তার উন্নতি ঘটে। ডারুইনকে তাঁর বাল্যকালের শিক্ষকেরা বোকা বলে উপেক্ষা করেছিলেন—তাঁর মধ্যে যে ক্ষমতা ছিল তা উপযুক্ত যত্ন ও আগ্রহের অভাবে বিকশিত হয়নি, তা অনাবিষ্কৃত ছিল। পরে অনুকূল সুযোগ পেয়ে তা আত্মপ্রকাশ করে। এখানেই গুরুজন ও শিক্ষকের মস্তবড় দায়িত্ব—ছাত্রের শক্তি ও রুচিকে আবিষ্কার করা ও উপযুক্ত যত্ন দ্বারা তা

বিকশিত করা। বর্তমান শিক্ষা ও শক্তির বিকাশে ব্যক্তির আগ্রহ ও উদ্যম উদ্বোধনের (motivation) প্রয়োজনীয়তার উপর ক্রমশ বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে। আর একটা কথার উপরও বিজ্ঞানীরা জোর দিচ্ছেন—তা হচ্ছে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য। প্রত্যেক ব্যক্তি তার দোষগুণ শক্তির সমন্বয়ে বিশেষ—সে অন্য সকলের চেয়ে পৃথক্। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মবিকাশের গতি ও ধারা বিভিন্ন। সকলের বুদ্ধি সমান তালে বাড়ে না—একদিকেও বাড়ে না। ব্যক্তির বিকাশের ধারাকে—তার স্বভাবকে, শিক্ষা অনুসরণ করবে রুশোর এই মৌলিক আবিষ্কার আজও সত্য। বুদ্ধির চাষের সাহায্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশই শিক্ষকের কাজ। সে কাজ সোজা নয় বলেই, আমাদের দায়িত্ব বেশী। গাধাকে ঘোড়া করা যাবেনা ব'লে, হাল ছাড়লে আমাদের চলবে না। যত্ন দিয়ে, সুশিক্ষা দিয়ে ছাত্রের উন্নতি করা যায়, এ সামান্য আশার কথা নয়। মারফী ও মিউকোমের মতোই আমরা বলব—"আজ গণতন্ত্রের পরীক্ষা চলছে—আজ শিক্ষক ও সমাজসেবীর দৃষ্টিতে এ উন্নতির সম্ভাবনার মূল্য সামান্য নয়। যদিও প্রত্যেক ঝাড়ুদারের ছেলে বড় ইন্‌জিনীয়ার হয়তো হ'তে পারবে না, কিন্তু (বুদ্ধির উন্নতির ফলে) সে সার্ভেয়ার বা ডাক-বিভাগের কেরানী নিশ্চয় হতে পারে, এবং সমগ্র জনসাধারণের বুদ্ধির হার পাঁচ অঙ্কও যদি (যেমন ১০০ থেকে ১০৫) উন্নত করা যায়, তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী।" সর্বশেষ শিক্ষককে মনে রাখতে হবে—বুদ্ধির চাষের চেয়ে, সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ অনেক বড় আদর্শ, এবং সেই আদর্শে শিক্ষককে অবিচল থাকতে হবে।

নতুন প্রফেসর এলেন

'নতুন প্রফেসারের গলাটা বেশ গম্ভীর।'

'উচ্চারণও খুব ভালো—চমৎকার ইংরিজী বলেন।'

'চেহারাটা কিন্তু একটুও ভালো নয়—সুরেনবাবুর চেহারা ছিল ফিট্‌ফাট্‌, নতুন জামাইটির মতো।'

'এর নামটা কে জানে কি হবে? Routineএ তো দেখছি Initial P. M. G.।'

'আরে P. M. G. তো Post Master General। সে তো সাহেব। আর আমাদের ইনি তো নিশ্চিতই 'বাঙাল'!'

'আমার কিন্তু বুড়ো মানুষটিকে দেখে বড মায়া লাগছিল—কেমন যেন অসহায় ভাব—আমাদের ক্লাশই খুঁজে পাচ্ছিলেন না! কেমন খুব আপন আপন ভাব— চেহারাটা গম্ভীর হলেও ভয় করে না।'

'আসল কথা কেমন পড়াবেন। Course তো আর্দ্ধেকেরও বেশী এখনও বাকী। এক মাস তো কোন প্রফেসরই ছিলেন না—আমাদের কি যে হবে, কে জানে?'

'বেশ সোজা করে শক্ত জিনিষও বোঝান। সুরেনবাবু তো এসেই Hudson থেকে গড় গড় করে মুখস্থ বলে যেতেন—প্রশ্ন করলেই চটে যেতেন। একে দেখে তো ভরসা হয়, প্রশ্ন করা চলবে।'

'Head of the Department সেদিন বললেন না 'নূতন প্রফেসর তোমাদের যিনি আসছেন, তিনি first class, first'—ভালই পড়াবেন মনে হচ্ছে, আজ ভালই তো পড়ালেন।'

'হ্যাঁ first class না হাতী! ওই চেহারায় first class হয় না!'

'তুই যেন বড় জানিস? আমার দিদি ওঁর ছাত্রী ছিল—সত্যিকারের বিদ্বান্‌ মানুষ।'

কলেজে নতুন প্রফেসর এসেছেন। প্রথম দিন ক্লাশ নেবার পরে তাঁর বিষয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা আলোচনা কচ্ছে, চায়ের ষ্টলে, কমন রুমে—বাড়ীতে গিয়েও হয়তো।

বড়রা হয়তো জানেন না, তাঁদের সম্বন্ধে ছোটরা একেবারে উদাসীন নয়। তারা বড়দের কথাবার্তা, কাজ, ব্যবহার সবই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে, তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করে। তাদের তরুণ মতামত অনেক সময়ই নির্মম ও চূড়ান্ত। ছোটরা বড়দের খুব বড় করে দেখতেই ভালবাসে। মনে মনে বড়দের তারা ভয় করে, কিছু ঈর্ষাও করে। বড়দের ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখলে তারা প্রথমটা আহত হয়—তাদের কাছে বড়দের স্খলন তাদের প্রতি বিষম বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করে ক্ষুণ্ণ হয় এবং এর প্রতিশোধ তারা তোলে নিষ্ঠুর সমালোচনায়।

কাজেই নূতন শিক্ষককে যথেষ্ট সাবধান হতে হবে। শিক্ষককে ছাত্রেরা তাদের তারুণ্যের কল্পনা দিয়ে মস্ত আদর্শের প্রতীক্ হিসাবে দেখতে চায়। শিক্ষক যে পরিমাণে তাঁদের সেই অর্পিত বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে সক্ষম হবেন সে পরিমাণেই তিনি সাফল্য লাভ করবেন।

নূতন শিক্ষকের পক্ষে প্রথম ক'টা দিন বিশেষ সঙ্কটের সময়। বিদ্যালয় যেন একটি বৃহৎ সংসার বা ক্ষুদ্র সমাজ। এখানে নূতনের আবির্ভাব স্বভাবতই কৌতূহল উদ্রেক করে। কিছুটা বিরূপতাও আবার থাকে নূতনের প্রতি—তাকে কতকটা ভয় ও অবিশ্বাসের সঙ্গেই দেখে পুরোনোর দল। আদিম মানবের এটি প্রাচীনতম অভ্যাস—এটা তার নিরাপত্তার জন্যে অবশ্য-প্রয়োজন ছিল। অরণ্যচারী গুহাবাসী আদিম মানুষের জীবন ছিল পদে পদে বিঘ্ন-সংকুল। তাই তাকে সাবধান হতে হত। যা অপরিচিত, তা সম্ভবত বিপদের বার্তাবহ। তার সম্বন্ধে আদিম মানবের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি হচ্ছে সংশয় ও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি। সে আদিম মানুষের অভ্যাস সভ্য মানুষ আজও ত্যাগ করতে পারে নি। তাই বাড়ীতে নূতন বৌ এলে সে শুধু কৌতূহল জাগায় না, তার সম্বন্ধে একটা অবচেতন বিরুদ্ধতাও থাকে। নূতন শিক্ষকের বেলায়ও তাই। তিনি এলেই ছাত্রদের অবচেতন মন প্রশ্ন করে—"ইনি কেমন মানুষ? আমাদের দলের, না, আমাদের বিরোধী?" এ সংশয় ও অবচেতন বিরোধ অস্বাভাবিকও নয়, অন্যায়ও নয়। এর জন্য শিক্ষককে প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি শিক্ষক পূর্বকল্পিত বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়ে নতুন ক্লাশের সামনে দাঁড়ান তবে ছাত্রছাত্রীদের মনেও বিরুদ্ধতা কঠিনতর হবে। সহজ হয়ে মিলবার পথটি শিক্ষককেই প্রথম প্রস্তুত করে দিতে হবে। পুরোনোর দলের মধ্যে তাঁর নিজের ঠাঁইটি করে নিতে হবে। পুরোনোর দলের দাবী পাকা হয়ে গেছে—তারা

জানে তারাই কলেজ—কলেজ তাদেরই। কাজেই নতুন প্রফেসর, যিনি এলেন তাকে নানা ভাবে যাচাই করেই তারা গ্রহণ বা বর্জন করে। যে শিক্ষক এই প্রথম ক'দিনের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ছাত্রছাত্রীরা নানা পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে যাকে গ্রহণ করে নিলো তিনি আপন হলেন—দলের একজন হলেন। কিন্তু যিনি ধৈর্য হারিয়ে বা সাহস হারিয়ে চটাচটি করলেন বা শৃংখলা রক্ষায় হাল ছেড়ে দিলেন, তাঁর কপালে দুঃখ আছে। প্রথম দিকেই 'নাম খারাপ' হ'লে, হৃতসম্মান উদ্ধার তাঁর পক্ষে শক্ত। সব চেয়ে শক্ত হয় যদি ছাত্রেরা নতুন প্রফেসরের একটি হাস্যকর নামকরণ করে দেয়। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের আসল নামটি লুপ্ত হয়ে অবমাননাকর ডাকনামটিই অক্ষয় হয়ে টিকে থাকবে।

বিদ্যালয় সমাজ জীবনেরই একটি অঙ্গ। সমাজ তাকেই সহজে গ্রহণ করে যে অনেকাংশে তাদেরই মত। তাই নূতন শিক্ষকের কথাবার্তা, পোষাক, আচরণ, মুদ্রাদোষ সবই ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে। ছাত্রদের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পশ্চাতে সর্বদাই এই প্রশ্নটি ক্রিয়া কচ্ছে, "মানুষটা কেমন? আমাদের দলের, না আমাদের বিরোধী?" যদি কলেজের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী খাস কলিকাতার অধিবাসী হয় তবে নতুন 'বাঙাল' শিক্ষকের নোয়াখালিয়া বা শিলেটি বা ঢাকাই কথার টান তৎক্ষণাৎ ছাত্রদের মনে একটি সকৌতুক অবজ্ঞার ভাব সৃষ্টি করবে। যদি কলেজের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী হয় দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পরিবারের তবে নতুন শিক্ষকের দামী বিলিতী স্যুট, কোট, টাই একটি শ্রেণীবোধভিত্তিক বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি করবে। অবশ্য এগুলি অনেকটা বাহ্য। তবু এগুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নয়। সব ছাত্র-ছাত্রীই শিক্ষকের প্রত্যেক গুণ বা দোষকে ঠিক একই চোখে দেখে না। শিক্ষকের জামার হাতায় কালির দাগটি হয়তো কোন ছাত্রীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায় নি। তার কিশোর মনের পরিচ্ছন্নতা বোধ ক্ষুণ্ণ হ'ল। সে ধরে নিলো নতুন মাষ্টার মশাই অগোছাল প্রকৃতির লোক; তার মনটা কিছু বিমুখ হ'ল। আবার এই কালির দাগ দেখেই হয়তো একটি স্নেহশীলা কিশোরীর বাৎসল্যভাব উদ্রিক্ত হ'ল; সে ভাবলে 'আহা বেচারী!'

প্রত্যেকের আলাদা আলাদা মন ও আলাদা আলাদা বিচার সত্ত্বেও সমস্ত ক্লাশটিরও যেন একাত্মতা আছে—এই বোধ ও গর্ব আছে 'এটা আমাদের ক্লাশ।' নতুন শিক্ষকের সেই সম্মিলিত বিচারের সম্মুখীন হ'তে হবে। তাঁর

কথা, ব্যবহার, ভাবভঙ্গীর মধ্য দিয়ে এ অ-বলা কথাটি ব্যক্ত হওয়া চাই "আমিও তোমাদের।" এ কথাটি আন্তরিক হওয়া চাই। তা হ'লেই তিনি ছাত্রদের সংসদে গৃহীত হলেন।

এটাই সকলের বড় কথা ছাত্রদের হৃদয় জয় করা চাই। আমাদের ছাত্রেরা তাদের হৃদয় দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই থাকে। সামান্য একটু স্নেহ প্রীতি ভালবাসা দিয়েই আমাদের ছাত্রদের মন পাওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষকের অন্তরে ছাত্রদের জন্য স্বাভাবিক প্রীতি না থাকলে শিক্ষক কখনো সাফল্য অর্জন করতে পারবেন না। যেখানে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সহজ মানবিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে সেখানে শিক্ষার কাজও সহজ ও প্রীতিপ্রদ হয়। আর যেখানে সেটি না হয় সেখানে শিক্ষাদান শুধু জীবিকা অর্জনের উপায়; তা কঠোর ও নিরানন্দ কর্তব্যসম্পাদন মাত্র। ছাত্রদের সম্বন্ধে প্রকৃত শ্রদ্ধা না থাকলে সে কর্তব্যসম্পাদন কখনো সুষ্ঠু হতে পারে না। এ শ্রদ্ধা মানে, শিক্ষককে এ কথা মনে প্রাণে বুঝতে হবে যে ছাত্রেরা প্রাণবন্ত, আদর্শপিপাসু, উৎসুক ব্যক্তিসমষ্টি। ভুল-ত্রুটি, অতিরিক্ততা, অসংযম সত্ত্বেও তাদের মতামত, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষার দাম আছে। যিনি সুশিক্ষক তিনি প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ব্যক্তি হিসাবেই জানতে, বুঝতে, ভালবাসতে চেষ্টা করেন। তখনই শিক্ষকের সঙ্গে শ্রেণীর সম্বন্ধটি সহজ হবে, যখন প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী এ কথা বুঝতে পারবে, এ কথা বিশ্বাস করতে পারবে, যে তাদের প্রত্যেকের দাবী আছে শিক্ষকের ওপর; অধিকার আছে অসঙ্কোচে তাঁর সমীপবর্তী হওয়ার—তাঁর উপদেশ, নিদেশ পাবার—তাঁর স্নেহের অংশ গ্রহণ করবার।

ছাত্রছাত্রীরা যে শিক্ষককে বিচার করে সেটা কিন্তু নিতান্ত হাস্যকর বা ভ্রান্ত নয়। তাদের অপরিণত বুদ্ধি ও অনিয়ন্ত্রিত অনুভূতি দিয়ে তারা শিক্ষক সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনির্ভরযোগ্য নয়। কতকটা অন্ধভাবে হ'লেও এ বিচারের ক্ষেত্রে তারা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

প্রথমত তারা লক্ষ্য করে শিক্ষকের পোশাক, চাল চলন, দৈহিক আকৃতি বা বিকৃতি, মুদ্রাদোষ ইত্যাদি। এ বিচার অনেকটা বাহ্য।

দ্বিতীয়ত তারা দেখে শিক্ষকের আচরণ, তাঁর মেজাজ, দুর্বলতা, পক্ষ-পাতিত্ব, ন্যায়নিষ্ঠা। এখানে তারা বিচার কচ্ছে শিক্ষকের মনটিকে।

তৃতীয়ত তারা ইচ্ছে করেই পরীক্ষা করে শিক্ষকের বিদ্যাবত্তা, (এটা কি

fallacy হবে, স্যার ?) বুদ্ধিমত্তা, (proxy দেওয়া ধরে ফেলেছেন কিন্তু, সাবধান!) তাঁর রসবোধ (চটে যাবেন নাকি রে?)। এখানে তারা বিচার কচ্ছে তাঁর চরিত্র।

সব মিলিয়ে তারা বিচার করে শিক্ষকের সমগ্র ব্যক্তিত্ব, খোঁজে এ প্রশ্নের জবাব "মানুষটা কেমন ?"

কোন্ শিক্ষককে ছাত্রছাত্রীরা পছন্দ করে? এ বিষয়ে কিছু কিছু মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয়েছে। শিক্ষকের চেহারা বা পোষাক প্রথমেই ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সত্য; কিন্তু বিচারের ক্ষেত্রে একে খুব গুরুত্ব ছাত্রেরা দেয় না। এ বিষয়ে মেয়েরা বেশী কৌতূহলী ও সমালোচনা-প্রবণ। তারা অপরিচ্ছন্নতা অপছন্দ করে, আবার বেশী ফ্যাসান করাকেও নিন্দার চোখে দেখে।

যিনি ভাল পড়াতে পারেন, ছাত্রছাত্রীরা তার প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। ভাল যিনি পড়ান, তাঁর অন্য বিষয়ে অনেক ত্রুটিও ছাত্রেরা সহ্য করে নেয়।

যে শিক্ষকের রসবোধ আছে, ছাত্রেরা সহজেই তাঁর বশ হয়। যিনি অতিরিক্ত পরিমাণে গম্ভীর, ছাত্রেরা তাঁকে এড়িয়ে চলে। আবার যে শিক্ষক অতিমাত্রায় চপল ও লঘু ছাত্রেরা তাঁকে মনে মনে অশ্রদ্ধা করে।

যে শিক্ষক স্নেহশীল, অপক্ষপাত, বুদ্ধিমান, বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ, যিনি দ্বিধাগ্রস্ত নন, যিনি প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারেন তিনি সহজেই ছাত্রদের চিত্তজয় করতে পারেন।

জারসিল্ড্ লীডস ও কুক্ ছাত্রেরা শিক্ষকের কোন কোন গুণ বা দোষ দ্বারা আকৃষ্ট কি অনাকৃষ্ট হয় গুরুত্ব অনুযায়ী তার চারটি শ্রেণী বিভাগ করেছেন—

১। মানবিক গুণ:—(human qualities) সহানুভূতি, সহজ আন্তরিকতা, ছাত্রদের অসুবিধা বুঝতে চেষ্টা করা, ভাল মেজাজ ইত্যাদি—

২। শিক্ষকতা গুণ:—(teaching qualities) বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, উৎসাহ, মনোজ্ঞ প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদি—

৩। শৃংখলা-রক্ষা সংক্রান্ত গুণ:—(disciplinarian qualities) নিয়মনিষ্ঠা, অপক্ষপাতিত্ব, দৃঢ়তা, অনির্মমতা ইত্যাদি—

৪। দৈহিক গুণ (physical qualities) ভাল চেহারা, পরিচ্ছন্ন পোষাক, সুন্দর উচ্চারণ ইত্যাদি।

পরীক্ষার ফলে এটা দেখা যায় যে শিক্ষকের মানবিক গুণই ছাত্রদের উপর

সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ। লীডস্ ও কুক্ দেখেছেন, যে সব শিক্ষক অযথা বকাবকি করেন, বেশী শাস্তি দেন, পক্ষপাতিত্ব করেন, বেশী চাল মারেন, তাদের ছাত্রেরা সব চেয়ে বেশী অপছন্দ করে। আমাদের দেশের ছাত্রদের সম্পর্কে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তারা শিক্ষকের নৈতিক চরিত্রগুণের প্রতি সব চেয়ে বেশী শ্রদ্ধান্বিত।

যে শিক্ষক জীবনের বিরূপ অভিজ্ঞতায় বিষাক্ত, সন্দিগ্ধ, মানুষের মহত্ত্বে শ্রদ্ধাহীন, যিনি নিজেকে প্রবঞ্চিত মনে করেন, সমাজ জীবনের সঙ্গে যাঁর মিল হচ্ছে না, সংসারের সংগ্রামে যিনি অতিমাত্রায় ক্লান্ত ও বিব্রত তেমন শিক্ষক ছাত্রদের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি খিটখিটে মেজাজ, ছাত্রদের সততায় অবিশ্বাসী, নির্মম ও নেতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন হন এ সম্বন্ধে বয়ন্টন্, বারুচ স্নাইডার ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানী নানা পরীক্ষার ফলে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন, যে অসন্তুষ্ট সন্দিগ্ধ, অশ্রদ্ধাশীল শিক্ষক ছাত্রদের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-গঠনে বাধাই সৃষ্টি করেন এবং ছাত্রদের মানসিক বিকৃতির জন্য এঁরা অনেক সময় দায়ী। গ্ল্যাডষ্টোন কিন্তু কতকটা বিপরীত সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি বলেন অনেক সময় দেখা যায় যে সব শিক্ষক জীবনের বিরূপ অভিজ্ঞতার আগুনে পোড খেয়েছেন তাঁরাই বেশী যত্নবান হন ছাত্রদের অনুরূপ দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করতে। তাঁরা নিজেরা সমাজ বিচ্ছিন্ন বলেই এর কারণ ও এর বিপদ সম্বন্ধে বেশী সচেতন। তাই ছাত্রদের সম্বন্ধে এঁদের দরদ ও সাবধানতাও বেশী। দ্বিতীয় মতটা কখনো কখনো সত্য হতে পারে কিন্তু প্রথম মতটাই বেশী সত্য বলে মনে হয়।

সুশিক্ষক হওয়া সহজ নয়—বর্ত্তমান সর্বব্যাপী প্রতিকূল অবস্থায় তা আরো অনেক বেশী কঠিন। তবু সুশিক্ষকই দেশের ভবিষ্যতের একমাত্র আশা। যিনি ধৈর্য্য হারিয়েছেন, বিশ্বাস হারিয়েছেন, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান হলেও তিনি সুশিক্ষক হতে পারেন না। অন্তরের যে স্বাভাবিক প্রীতি, বাৎসল্য ও নিষ্ঠা সু-শিক্ষকের মূলধন তা ভগবানের দান, কিন্তু বহু শ্রম, সাধনা দ্বারাই বিদ্যার তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করা যায়। জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রের চেয়েও শিক্ষার ক্ষেত্রে মহাপুরুষের এ বাণী অনেক বেশী সত্য "চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না।"।

নতুন ক্লাশ

শিক্ষকের সম্পর্কে ছাত্রদের যেমন কৌতূহল থাকে, ছাত্রদের সম্পর্কেও তেমনি শিক্ষকের কৌতূহল ও আগ্রহ থাকে। শিক্ষকের কৌতূহল সচেতন এবং তার পেছনে থাকে ছাত্রদের সম্পর্কে তাঁর দায়িত্ব-বোধ। মনস্তাত্বিক হিসাবে তিনি ছাত্রদের মন জানতে চান, তাদের প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করতে চান, তাদের বুদ্ধি, স্বভাব ইত্যাদির বিচার করতে চান। সব সময়ই যে এ বিশ্লেষণের কাজ তিনি সচেতন ভাবে করেন তা নয় এবং এটা একদিন বা এক মুহূর্ত্তের ব্যাপার নয়। ছাত্রদের নিয়ে তাঁর কারবারে এ ক্রিয়াটি নিত্যই তাঁর অবচেতন মনে কাজ করতে থাকে।

ছাত্রদের মনের যে দিকটার প্রতি শিক্ষকের প্রথম আগ্রহ, সেটা হচ্ছে তাদের বুদ্ধি সম্বন্ধে—কতটা এদের শেখানো যাবে সে সম্বন্ধে। শিক্ষক তো একটা দম দেওয়া কলের গানের যন্ত্র মাত্র নন—তাঁর একটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ আছে। যেদিন পড়ানোটা ভালো হয়, ছেলেরা মন দিয়ে শোনে, সেদিন শিক্ষকের আত্মতৃপ্তি স্বাভাবিক। যত খারাপ শিক্ষকই আমরা হই না কেন সবাই আমরা চাই ছাত্রদের প্রশংসা। ছাত্ররা যখন বলাবলি করে "উনি কি চমৎকার পড়ান! তখন শিক্ষকের যে বিমল আনন্দ হয় তার কোন তুলনা নেই। কিন্তু ছাত্ররা প্রশংসা করবে তখনই, যখন তারা বিষয়টি বুঝতে পারবে, তাতে রস পাবে—শিক্ষক যা শেখাচ্ছেন তা গ্রহণ করবার শক্তি তাদের থাকবে। এবং এই গ্রহণ করবার শক্তিকেই বলে বুদ্ধি। কাজেই শিক্ষকের কাছে ছাত্রদের বুদ্ধির প্রশ্নটা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়। নূতন ক্লাশ নিয়েই শিক্ষকের এই প্রশ্ন মনে জাগে—"কতদূর এই ছেলেমেয়েদের শেখাতে পারবো—বিষয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারবো?"

মস্ত বড় ক্লাশ। এত বড ক্লাশে ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখা, শাসন শৃঙ্খলা বজায় রাখাই মস্ত কঠিন কাজ।

"এবারে ক্লাশের ছাত্রদের মধ্যে বেশী বয়সের ছাত্র কম।"

"দ্বিতীয় বেঞ্চের ও ছেলেটির চোখ দুটি বেশ উজ্জ্বল, সম্ভবতঃ ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান হবে।"

"এদের সকলের মুখগুলি মনে রাখতে কিছু সময় নেবে।"

সামনের বেঞ্চে যে ছেলে দুটি খুব গলা বাড়িয়ে শুনছে ওরা ওদের নিজেদের যতটা, যতটা বুদ্ধিমান বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা কচ্ছে, মুখ দেখে মনে হয় ওদের বুদ্ধি ততটা নয়।"

"ওই কোণের ছেলেটা বেশী ফাজিল।"

"তোমার নাম কি? সোজা হয়ে দাঁড়াও। কোন স্কুল থেকে এসেছ?"

একটা নতুন ক্লাশের সাথে পরিচয়ের সাথে সাথেই শিক্ষক ছাত্রদের মোটামুটি ভাগ করে নিচ্ছেন ভাল, মন্দ, মাঝারীতে। তাঁর যে কাজ, মানে শিক্ষণ, তার জন্যেই এই শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন।

বুদ্ধির প্রাথমিক এই বিচার স্বভাবতঃই গৌণ ও পরিবর্তন সাপেক্ষ। এ রকম একটা মোটামুটি ভাগ না করে নিলে পরিশ্রমের বহু অপচয় ঘটে। সাধারণতঃ ছাত্রদের চেহারা ও চাল-চলন দেখেই প্রথমতঃ শিক্ষক ছাত্রদের বুদ্ধি অনুসারে ভাগ করে থাকেন। যেমন "ও ছেলেটা বোকা, চোখ দুটী কেমন পিট্ পিট্ করে তাকায়।" "ও ছেলেটির কপাল বেশ প্রশস্ত, ছেলেটি সম্ভবতঃ বেশ বুদ্ধিমান।" "ওই ছেলেটির কান যেন গাধার মত বড় বড়—সম্ভবতঃ অঙ্কে কাঁচা।" "ওদিকের ছেলেটা বেশ চটপটে—নিশ্চয়ই চালাক শহুরে ছেলে।" এ সব বিচারে বুদ্ধির প্রশ্নটাই বড় যদিও ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দোষগুণের বিচারও এর মধ্যে থাকে।

বাস্তবিক পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষির পূর্বে মানুষের বুদ্ধি বিচার সম্বন্ধে প্রথম বৈজ্ঞানিক চেষ্টা যেগুলি হয় সেগুলি (গল্, ল্যাভেটর ইত্যাদি) মস্তিষ্কের গঠন দেখেই করা হোত। এর পর থেকে বুদ্ধির বিচারে ইন্দ্রিয়াদি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির ব্যবহারে সূক্ষ্মতা ও নির্ভুলতার উপর করা হতে থাকে :—যেমন একটা ছবিতে অনেকগুলি পশু বা পাখী আঁকা আছে। এক নজরে দেখে যে ছেলে বেশী তৎপরতার সঙ্গে শুদ্ধ উত্তরটি দিতে পারবে সে বেশী বুদ্ধিমান। অথবা স্কাউটদের মধ্যে দড়ির বিভিন্ন গিঁটগুলি দেওয়া শিখতে যে ছেলেরা থতমত খায়, বারে বারে ভুল করে তারা তুলনায় বেশী বোকা।

বুদ্ধির এ বিচারের প্রণালী সম্পূর্ণ খামখেয়ালী নয় এবং বহু পরীক্ষা ও গবেষণাদ্বারা দেখা গেছে এগুলি সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্যও নয়। কিন্তু শুধু জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের ক্ষিপ্রতা, সূক্ষ্মতা ও নির্ভুলতাই বুদ্ধি বিচারের উপায় নয়। স্মৃতিশক্তি; বিশুদ্ধচিন্তা, তুলনা, বিচ্ছিন্নকে সংযোজন ও তার মধ্যে

সম্বন্ধ স্থাপন ইত্যাদি মানসিক ক্ষমতার উৎকর্ষও বুদ্ধির বিচারের নির্ভরযোগ্য উপায় (CAVD)। শিক্ষক মশাই যখন ছাত্রদের এ সব বিষয়ে সাফল্য বা অসাফল্য দিয়ে তাদের বুদ্ধির বিচার করেন তখন তিনি তাঁর নিজের এবং তাঁর পূর্বস্থরীদের পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর কচ্ছেন—যদিও অবশ্য এ বিষয়ে সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকতে পারে।

"আমি একটা ছোট গল্প বলব—তোমরা তার পরেই আমাকে গল্পটা খাতায় লিখে দেবে। দেখবো কতটা তোমরা মনে রাখতে পারো।"

"আমি 'ফল' এ কথাটা বলার সঙ্গে তোমাদের মনে কোন ছবি (image) উদয় হয়?"

"বরফ ঠাণ্ডা, আর আগুন—?"

"কাল রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হয়েছিল—তাই ঘরটা পুড়ে গেল।" এ কথাটার মধ্যে অসঙ্গতি কোথায়?

"৫, ১৩, ৯, ২৭, ২, ২২ এ সংখ্যাগুলির মধ্যে কোন্‌টী সব চেয়ে বড? গুরুত্ব অনুসারে সংখ্যাগুলিকে সাজাও।"

এ প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য বুদ্ধির বিভিন্ন দিক পরীক্ষা।

মানসিক গুণগুলির মধ্যে কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি বুদ্ধিবিচারের পক্ষে বিশেষ উপাযাগী তা নিযে মতভেদ আছে। তা ছাড়া বুদ্ধি একটা সাধারণ শক্তি, না কতগুলি বিচ্ছিন্ন শক্তির যোগফল মাত্র, তা নিয়েও বহু বিতর্ক হয়েছে। সম্ভবতঃ এ সব বিষয়ে কোন চরম মত গ্রহণ না করাই বিধেয়।

এবিংহজ মনে করেন বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে বিভিন্ন বস্তু, ঘটনা বা গুণকে মনের মধ্যে সংযোগের ক্ষমতা। স্পীয়ারম্যান্‌ জ্ঞানলাভ বা বুদ্ধিবিকাশের তিনটি সূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ—(১) নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলি লক্ষ্য করবার ক্ষমতা, (২) প্রত্যক্ষলব্ধ বা চিন্তালব্ধ জ্ঞানের বিষয়গুলির মধ্যে মৌল সম্বন্ধ আবিষ্কারের ক্ষমতা এবং (৩) বিপরীত বা অনুরূপ বিভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপনের ক্ষমতা। প্রথম ক্ষমতাটির কাজ হচ্ছে অভিজ্ঞতার তাৎপর্যবোধ—apprehension of experience। দ্বিতীয়টির কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সম্বন্ধস্থাপন—education of relations। আর তৃতীয়টির কাজ হচ্ছে—কোন ঘটনা বা গুণের বিপরীত বা অনুরূপ কি তা বলতে পারা education of correlates। টারম্যান্‌ বিমূর্ত্ত চিন্তার ক্ষমতাকেই বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ পরিচয় মনে

করেছিলেন—An individual is intelligent in proportion as he is able to carry on abstract thinking.

বুদ্ধির লক্ষণ এই যে তা আমাদের মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়াগুলিকে উদ্দেশ্যসাধনের উদ্দেশ্যে চালিত করে। তার একটা কার্যকারিতা বা সামাজিক মূল্য আছে। এ সম্বন্ধে থার্সটোন, বার্ট, ষ্টার্ন, বা গডার্ডের মোটামুটি মিল আছে—যদিও অন্যান্য নানা বিষয়ে তাঁদের অমিলও সামান্য নয়। পূর্বসূরীদের বুদ্ধি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের একটা সমন্বয় ও মীমাংসার চেষ্টা করেছেন রেক্স নাইট—তিনি বল্লেন—ও উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী রচনাত্মক সংযোগ করণের ক্ষমতাকে বুদ্ধি বলে—Intelligence is the capacity of relational constructive thinking, directed towards the attainment of some end.

পূর্বেই বলেছি শিক্ষক যখন প্রথম একটি নূতন ক্লাশে গিয়ে তাঁর ছাত্রদের একটা মোটামুটি বুদ্ধির বিচার করেন তখন এসব বিভিন্ন মতামতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকা সম্ভব। তথাপি তাঁর বিচারে তিনি পণ্ডিত গবেষকদের অনুসরণই করেন দেখা যায়। কিছুদিন তাঁর ক্লাশটির সঙ্গে পরিচয় ঘটলে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ন। তিনি তখন জানেন অথবা, মনে করেন জানেন, যে কোন্ গরুতে কতটা দুধ দেয়। কিন্তু তাঁর এ নিশ্চিন্ততা বাস্তবানুগ নাও হতে পারে। শিক্ষক যখন চেহারা দেখে ছাত্রদের বুদ্ধির বিচার করছেন তখন তা ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পূর্ব্বসংস্কার (preconceptions) দ্বারা প্রভাবান্বিত। হয়ত শিক্ষকমশাইয়ের 'কবি'দের সম্বন্ধে একটা বিরাগ আছে। (যৌবনকালে তিনি কিছুদিন কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিলেন, কয়েকটি লেখা বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠিয়েও ছিলেন—কিন্তু কোনটি ছাপা হয়নি)। তাই যে ছেলেটির চুল বেশ লম্বা লম্বা, এবং যার বেশবাস বেশ পরিচ্ছন্ন, তাকে তিনি গোড়া থেকেই বিদ্বেষের চোখে দেখতে পারেন—এবং তার বুদ্ধি সম্বন্ধে বিবেচনায় তিনি অবিচার করতে পারেন। হয়ত আর একটি ছেলেকে তিনি একটু অতিরিক্ত প্রীতির চক্ষে দেখেন, কারণ ছেলেটির বাড়ী ছিল বরিশালে—সেটা ছিল মাষ্টার মশাইয়ের শ্বশুরবাড়ী। কাজেই বুদ্ধির বিচারে (এবং অন্য যে কোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিচারে) ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগ (personal factor) যতটা সম্ভব বর্জ্জন করতে না পারলে তা যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য হয় না।

অবশ্য তিনি ছেলেদের চেহারা ও চালচলনই শুধু দেখেন না,—তিনি তাদের কাজও (performance) পরীক্ষা করেন। এবং তিনি মনে করতে পারেন তাঁর পরীক্ষালব্ধ বিচার নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ। কিন্তু এখানেও বিপদ আছে। হয়ত স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে তিনি পরীক্ষার খাতা দেখতে বসলেন এবং তাঁর মনের ঝালটা, প্রথম যে আট খানা খাতা দেখলেন সে বেচারিদের উপরই ঝাড়লেন। তারা তাদের প্রাপ্যের চেয়ে কম নম্বর পেলো। আবার ক'খানা খুব খারাপ খাতার পর একখানা মোটামুটি ভাল খাতা পেলে হয়ত তাঁর মনটা অতিরিক্ত খুসী হয়ে যায়, (সেদিন ক্লাশে এ বিষয়-পড়াতে যে নতুন pointগুলি বলেছিলুম এ ছোঁড়া তার কটা point লিখেছে—বেশ মনোযোগী ও বুদ্ধিমান ছেলেটা, কাজেই) সে ছেলেটা অতিরিক্ত বেশী নম্বর পেয়ে গেল। খাতা দেখতে দেখতে মাষ্টার মশাইয়ের পরীক্ষার মান অনেক সময় পরিবর্তিত হয়। যদি খাতাগুলি উল্টেপাল্টে বিভিন্ন অবস্থায় দেখা হয় তবে পরীক্ষার ফল বিভিন্ন হয়। তাই খুব উঁচু পরীক্ষাগুলিতে একাধিক শিক্ষক দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে average করে দুইয়ের মাঝামাঝি নম্বর নেওয়া হয়। তা ছাড়া মাষ্টার মশাইয়ের বিচারটি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। এটাতে ঠিক বৈজ্ঞানিক বিচার হয় না। বৈজ্ঞানিক বিচারে বহুব্যক্তির এবং বৃহৎ সংখ্যা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার তুলনামূলক বিবেচনা প্রয়োজন। কিন্তু নীচু ক্লাশে যেখানে অনেক ছাত্র সেখানে এ রকম পরীক্ষা করানো সম্ভবই হয় না। কাজেই আমাদের দেশে বর্তমানে যে পরীক্ষাপদ্ধতিটি স্কুল ইত্যাদিতে চলছে তা মোটেই বস্তুনিষ্ঠ নয়। অথচ বৈজ্ঞানিক বিচারে ব্যক্তিকে যথাসম্ভব বাদ দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। তাই অন্যান্য দেশে পরীক্ষাপদ্ধতির নানা সংস্কার হচ্ছে, আমাদের দেশেও এ নিয়ে আলোচনা সুরু হয়েছে। তবে এটা নিঃসন্দেহে মানুষের বুদ্ধিই হোক বা অন্য কোন গুণই হোক, তার বিচার সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ও নৈর্ব্যক্তিক হতেই পারে না।

বিজ্ঞানসম্মত, কার্যকরী ও নির্ভরযোগ্য বুদ্ধির পরীক্ষা (Intelligence Test) প্রথম আবিষ্কার করেন ফরাসী মনস্তত্ত্ববিদ্ বিনেঁ তাঁর সহযোগী সিমন্ এর সহায়তায়, ১৯০৫ সালে। তারপর তাঁরা এ নিয়ে বহু পরীক্ষা চালান। আরো বহু পরিবর্ত্তনের পর ১৯১০ সালের কাছাকাছি সিমন্ বিনেঁর আদর্শ বুদ্ধির মাপ (Simon—Binet Standard scale) য়ুরোপের বহু দেশে

ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। ১৯১১ সালে বিনে মারা যান, কিন্তু তিনি বুদ্ধি পরিমাপের যে ধারা প্রবর্ত্তন করে যান তা অনুসরণ করে আরো নানা রকমের বুদ্ধির পরীক্ষা আবিষ্কৃত হয়। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী এই পরীক্ষা ব্যাপারে য়ুরোপে অগ্রণী। তারপর অ্যামেরিকায় এ ঢেউ এসে পৌঁছানোর পর এত বিবিধ রকমের পরীক্ষার রীতি আবিষ্কৃত হয় যে এখন শতাধিক বিভিন্ন রকমের Tests প্রচলিত হয়েছে। Simon Binet Scale এর বহু সংস্কার হয়েছে। সর্বশেষ সংস্করণ এখন প্রায় সর্বদেশে গ্রাহ্য তা হচ্ছে Terman Merril Scale. ক্রমেই বোঝা যাচ্ছে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরীক্ষা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। এত বারে বারে যে বুদ্ধির মাপগুলির সংস্কার হচ্ছে তার কারণ বৈজ্ঞানিকেরা যথাসম্ভব নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য বুদ্ধি পরিমাপের যন্ত্র (instrument) বা উপায় আবিষ্কার করতে চান। আধুনিক পরীক্ষাগুলি যে সত্য ও নির্ভরযোগ্য তার প্রমাণ হচ্ছে যে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন অবস্থার, একই বয়সের ছেলেমেয়েদের উপর ইতিমধ্যে এ স্কেলগুলি ব্যবহার করে একরকমের ফলই পাওয়া যায়। এজন্য বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন অবস্থানুসারে স্কেলগুলির কিছু পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হয়। যাতে বুদ্ধির পরীক্ষা নির্ভুল হয় সেজন্যে বৈজ্ঞানিকদের প্রতি এ উপদেশ—একই পরীক্ষা অল্পদিন বাদে বাদে অন্ততঃ দু'বার একই ছাত্রের উপর ব্যবহার করে যদি দুই পরীক্ষার মধ্যে খুব নিকট মিল (high co-efficient of correlation) পাওয়া যায় তাহলে পরীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য। অথবা একই পরীক্ষার দুটী অংশ, যেমন: টারম্যান মেরিল সংশোধিত Test এর L এবং M form একই দল ছাত্রের উপর ব্যবহার করে যদি একই রকম ফল হয়, তবে পরীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য। যদি দুই পরীক্ষার ফলের মিলের পরিমাণ (co-efficent of correlation) '৯০র নীচে হয় তবে পরীক্ষাটীর নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা বিধেয়।

বর্ত্তমান শিক্ষানীতিতে তুলনামূলক আংকিক পদ্ধতি (Statistical methods) শিক্ষকের ব্যক্তিগত অনুরাগ বিরাগ দ্বারা পরীক্ষা প্রভাবান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে দূর করে। সাধারণবুদ্ধিতেই আমরা জানি—সব ছেলের বুদ্ধি সমান নয়, তাদের মধ্যে ভাল, মন্দ, মাঝারির প্রভেদ আছে। আংকিক পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন পরীক্ষা ব্যবহারের ফলগুলি যদি একটি লেখ (graph) দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় তাহলে দেখা

যায়—মাঝারিদের সংখ্যা অর্দ্ধেকের বেশী এবং অতিবুদ্ধিমানদের বা অতি-বুদ্ধিহীনদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমে এসেছে, কাজেই লেখটির চেহারা একটি নিটোল ঘণ্টাকৃতি (the normal distribution curve)। কোন বুদ্ধির পরীক্ষায় যদি এর খুব বেশী ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহলে তার নির্ভুলতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা উচিত।

এ প্রকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিমাপ-পদ্ধতি শিক্ষকের কাজের পক্ষে খুবই সহায়ক। এখন আর শিক্ষককে আন্দাজে ছাত্রদের বুদ্ধির বিচার করতে হয় না। ব্যক্তিগত বিচারের তুলনায় এ বৈজ্ঞানিক বিচার অনেকটা বেশী নির্ভুল। **এ পরীক্ষাগুলি দ্বারা ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ করে তাদের যোগ্যতানুযায়ী পাঠ্যবস্তু স্থির করলে বেশী সুফল পাওয়া যেতে পারে। শিক্ষকের অনেক অযথা পরিশ্রম অপচয়ের সম্ভাবনা কমতে পারে।** বাস্তবিকপক্ষে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে এই বুদ্ধির মাপক দিয়ে বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) নির্ণয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার বলেই শিক্ষাবিদ্‌রা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তারপর দুই বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন কাজের লোক বাছাইয়ের জন্য এই Test-গুলি বহুলপরিমাণেই এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে এ Test-গুলির কার্য্যকারিতা যেমন প্রমাণিত হয় তেমনি এদের নানাভাবে সংস্কারের সুযোগও পাওয়া যায়। য়ুরোপ ও অ্যামেরিকায় এখন সমস্ত স্কুল কলেজে ছাত্রভর্তি ও তাদের পাঠ্যবস্তু নির্দ্ধারণের ব্যাপারে এ Test-গুলি সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়। এতে ফল ভালই পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে স্কুল কলেজে এ বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতির ব্যবহার এখনও খুবই সীমাবদ্ধ। তবে প্রতিযোগিতামূলক সরকারী চাকুরীতে (competitive examinations) লোক বাছাইয়ের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিপরীক্ষার পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে।

কিন্তু এই বুদ্ধির পরীক্ষা দ্বারা ছাত্রদের শিক্ষা সম্বন্ধে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল অথবা শিক্ষকদের কর্ত্তব্যও তিরোহিত হয়ে গেল—এমন আশা করা নিতান্ত ভুল। কোন যান্ত্রিক উপায়ই—তা সে যত নির্ভুলই হোক না কেন, সুশিক্ষক সৃষ্টি করতে পারে না অথবা তাঁর স্থান নিতে পারে না। বুদ্ধি ছাত্রের একটি প্রয়োজনীয় গুণ. কিন্তু বুদ্ধি ও চরিত্র এক নয় এবং বুদ্ধিও সমগ্র ব্যক্তিত্বের সামান্য অংশ মাত্র। তাই কোন ছাত্র বুদ্ধির পরীক্ষায় 'উত্তম' মার্ক পেলেও শিক্ষকের তাতে

নিশ্চিন্ত বোধ করবার কারণ নেই এবং কোন ছাত্র এ পরীক্ষায় 'নিরস' বিবেচিত হলেও তার সম্পর্কে হতাশ হবার হেতু নেই। কারণ শিক্ষকের কাজ ছাত্রদের বুদ্ধিকে শুধু শাণ দেওয়া নয়, তাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশসাধন। এখানেই সুশিক্ষকের কৃতিত্ব ও দায়িত্ব। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের কৃতিত্ব, তাঁর সহানুভূতি, ন্যায়পরায়ণতা, দূরদৃষ্টি, শিক্ষার বিষয়বস্তুতে অধিকার—এরই দাম সবচেয়ে বেশী। যে শিক্ষক তাঁর শুচিশুদ্ধ চরিত্র দিয়ে তাঁর ছাত্রদের হৃদয়কে কল্যাণের পথে আকর্ষণ করতে পারেন তিনি 'অধম' ছাত্রকেও উন্নতির পথে অনেকখানি এগিয়ে দিতে পারেন। তাঁর অন্তরের মমতা ও উৎসাহ যদি তিনি তাঁর ছাত্রদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে পারেন তবেই শিক্ষা সার্থক হবে—তাঁর ছাত্ররা তীক্ষ্ণ মেধাবী না হলেও। বুদ্ধির মাপ তো ছাত্রের মানসিক শক্তির সম্ভাবনার সীমাই শুধু নির্দেশ করে—বাস্তবক্ষেত্রে কতটা বিকশিত হবে তা বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে—শিক্ষক সম্বন্ধে শ্রদ্ধা এবং শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব।

বুদ্ধির পরীক্ষাগুলির পিছনে দুটি কথা মেনে নেওয়া হচ্ছে। প্রথম কথাটা হচ্ছে যে, বুদ্ধি জন্মগত এবং দ্বিতীয় যে বুদ্ধি অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু বর্ত্তমানকালে বহু মনীষী এ দুটি কথা সম্পূর্ণ সত্য মনে করেন না। মোটামুটিভাবে ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা বুদ্ধিকে জন্মগত মনে করেন এবং তাই এই দুই দেশে বংশগতির (heredity) উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। বুদ্ধি জন্মগত হলে তা মোটামুটি অপরিবর্তনীয়। 'গাধাকে পিটিয়ে ঘোড়া' করা সম্ভব নয়। কিন্তু রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা বুদ্ধিকে জন্মগতও মনে করেন না, অপরিবর্তনীয়ও মনে করেন না। তাঁদের মতে বুদ্ধির বিকাশ—মানুষের আরো অন্যান্য দোষ-গুণের মতই 'পরিবেশ-নির্ভর! উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে নিতান্ত পেছিয়েপড়া ছাত্রেরও প্রভূত উন্নতি হতে দেখা যায়। **'মানুষ তৈরী করতে গেলে—সামাজিক পরিবেশ নির্মল, উৎসাহশীল সতেজ হওয়া চাই—এমন হওয়া চাই যাতে ছাত্রের আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়।** এ ব্যাপারে দেশের সরকারের মস্ত দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় দায়িত্ব পিতা, মাতা ও শিক্ষকের। বর্তমান সমাজবুদ্ধি-সচেতন যুগে এ মত নতুন মর্যাদা পেয়েছে আর নতুন মর্যাদা পেয়েছেন নিষ্ঠাবান্ ও মরমী শিক্ষক।

নৈরাশ্য ও সংঘাত

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের ভোগের বস্তু ও উপকরণ সহস্র গুণ বেড়েছে—মানুষের শক্তি ও আকাঙ্ক্ষাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জীবনের জটিলতাও অনেক বেড়েছে—ভোগের উপকরণ সংগ্রহের জন্যে প্রতিযোগিতা অনেক বেশী তীব্র হয়েছে—জীবন সংগ্রাম বিষমতর হয়েছে। তাই একদিকে মানুষের সুখ ও সাফল্যের সম্ভাবনা যেমন বেড়েছে, তেমনি অসাফল্যের বেদনাও তীব্রতর হ'য়েছে, দুঃখের পরিধিও মানুষের অনেক বিস্তৃততর হয়েছে। এ যুগ সফলতা দিয়েই জীবনের মূল্য নির্ধারণ করে, সুতরাং যারা সফল হোল না তারা যেমন সমাজে উপহসিত, তেমনি আত্মধিক্কারের গ্লানিতেও তারা দগ্ধ হয়। এর ফলে আগের তুলনায় অনেক বেশী লোক মানসিক অসুস্থতা ভোগ করছে—জীবনে অস্থিরতা (tension) বেড়েছে। সভ্য মানুষ তাই আগের তুলনায় অনেক বেশী পরিবেশের সঙ্গে সংঘাত ও আত্মদ্বন্দ্বে নিপীড়িত হচ্ছে। সমস্ত সভ্য দেশে মানসিক রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু বর্তমান যুগের সভ্য মানুষ এ কথা বিশ্বাস করে যে, বিজ্ঞানই কেবলমাত্র আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধানের, সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের পথ বলে দিতে পারে। তাই আজ সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী সর্বব্যাপী নৈরাশ্য (frustration) ও সংঘাত (conflict) এর বিশ্লেষণ ও হেতু নির্ণয়ে আগ্রহশীল। হেতু নির্ণয় হলে তবেই সুচিকিৎসা সম্ভব।

জীবনে আমরা অনেক জিনিষ চাই। এ চাওয়ার বস্তু কখনও সহজ, কখনও জটিল, কখনও তা দেহের কোন অবস্থা বা পরিবর্তন, কখনও বহির্জগতের কোন বস্তু। পড়াশুনা করছি, সন্ধ্যা হয়ে আঁধার হয়ে এল, আলোর অভাব বোধ করে বিজলী বাতির সুইচটি টিপলুম। এখানে অভাবটা সহজ এবং অভাব দূরীকরণের উপায়ও প্রায় নির্দিষ্ট! কিন্তু জীবনে যদি যশ প্রতিপত্তি চাই, তাহলে তার পথ সোজা নয়—উপায়ও একটিমাত্র নির্দিষ্ট বস্তু নয়।

প্রাত্যহিক জীবনের হাজারো অভাবের অনেকগুলিই সহজে মেটানো যায়। সব অভাব দূরীকরণই অল্পবিস্তর চেষ্টাসাপেক্ষ। এ সব সহজ অভাব দূর করবার চেষ্টা আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হয়, তাই জীবনটা

দুঃসহ ও দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু অনেক সময় আমাদের চেষ্টা সহজে সফল হতে চায় না, অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়। তাতে মন অশান্ত হয়, আমরা বিরক্ত হই, উদ্বিগ্ন হই। যেমন: পোষ্টাফিসে গিয়ে খাম টিকিট কিনতে গরমের মধ্যে লম্বা লাইন দিতে হয়। এই যে অপেক্ষা করতে হয়, এতে আমাদের ধৈর্যের উপর চাপ পড়ে—ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাই—অফিস না বন্ধ হয়ে যায়—মনে একটু মৃদু উদ্বেগ বোধ করি। যাই হোক, প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক বিরক্তি এবং উদ্বেগ কোন গভীর দাগ মনের মধ্যে রাখে না।

কিন্তু কখনো কখনো আমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা মেটাবার কোন উপায় থাকে না। হয় বহির্জগতে কোন বাধা, নয় নিজের অক্ষমতা, অথবা নিজের অন্তরের মধ্যেই কোন কঠিন সংশয় বা দ্বন্দ্ব—লাঞ্ছিত দ্রব্য পাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয়। মনের সেই যে অপ্রীতিকর অবস্থা, তাকেই বলি নিরাশা বা frustration।

Clifford T. Morgan বলেছেন, '......If the goals are not achieved soon enough, the motives go unsatisfied. A motive not satisfied within a reasonable time is a frustrated motive.' অর্থাৎ লক্ষ্যে শীঘ্র পৌছিতে না পারলে প্রেষণা অতৃপ্ত থেকে যায়। যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রেষণা পরিতৃপ্ত হল না তাকেই ব্যর্থ প্রেষণা বলে।[১]

সমস্ত নিরাশার পশ্চাতেই থাকে কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা—তীব্র অথচ তা পরিতৃপ্তির পথ রুদ্ধ—এ ক্ষেত্রেই আসে নিরাশা। এর ফল মানসিক বিষাদ বা মানসিক দ্বন্দ্ব। Munn তাই লিখেছেন, '......in some cases strong motives are blocked by impossible barriers, which it seems impossible to overcome. It is with reference to such situations that frustration, stress or conflict arises. The frustrating situation may be called a barrier or obstacle and the frustrating experience is sometimes referred to as mental distress or mental conflict.' অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে বলবতী প্রেষণা এমন সব বাধার দ্বারা বিঘ্ন প্রাপ্ত হয় যা অতিক্রম করা অসম্ভব মনে হয়। এই অবস্থাতেই নৈরাশ্য, ব্যর্থতা ও সংঘাতের উৎপত্তি হয়। এই ব্যর্থকরী অবস্থার নামই বাধা এবং এই

১ C. C. Morgan. Psychology. P. 248

ব্যর্থতায় অভিজ্ঞতাকেই সময়ে সময়ে মানসিক বেদনা বা মানসিক সংঘাত বলে অভিহিত করা হয়।[২]

এ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম কোন বাহ্য অবস্থা হতে পারে। অনেক দিন পর অতি প্রিয় বন্ধু দেশে ফিরে আসছে—তোমাকে চিঠি লিখেছে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকতে কারণ তার অপেক্ষা করবার উপায় নেই —পরদিন উত্তর প্রদেশে চাকুরিতে যোগ দিতেই হবে। তুমি ষ্টেশনে যাবার জন্যে খুবই আগ্রহান্বিত, কিন্তু গাড়ী আসবার দু'ঘণ্টা আগে থেকে প্রবল জল-ঝড় সুরু হয়ে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। কোন রকম যানবাহন পাওয়া গেল না—তোমার বন্ধুর সাথে দেখা করা হোল না—মন খারাপ করে ঘরে বসে রইলে।

আবার বাধাটা মনুষ্যসৃষ্টও হতে পারে। অফিসের তরুণী এক বান্ধবীকে সন্ধ্যার শো-তে সিনেমায় নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছ—টিকিট কেনা হয়ে গেছে। কিন্তু বাড়ী ফিরে এসে শুনলে—গৃহিণীর মাস্‌তুতো বোনের বিয়েতে তাঁকে নিয়ে অবশ্যই যেতে হবে কাশীপুর! গৃহিণীরা এমনই অবিবেচক, অথচ সিনেমায় যাওয়ার কথা তাঁকে বলবারও উপায় নেই।

অনেক সময় বাধাটা সামাজিক। তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, অবস্থাপন্ন ঘরের। একটি দরিদ্র অথচ মেধাবী সুন্দর সাহা ছেলেকে ভালবেসেছ। তাকে বিয়ে করতে চাও। কিন্তু তোমার পরিবার এর ঘোর বিরোধী। তাঁরা বাধা দিলেন।

এ বাধাগুলো হলো বাইরের। কিন্তু বাধা থাকতে পারে ব্যক্তির ভেতর থেকেই। নিজের পারিবারিক ও মানসিক অসামর্থ্য অনেক সময় আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে। দৌড়ের বাজিতে প্রথম হবার প্রচণ্ড লোভ থাকলেও যোগ্যতর প্রতিযোগীদের কাছে হেরে গেলাম। কবি হতে পারলাম না, সুবক্তা হতে পারলাম না, ক্লাশে পড়াশুনায় ভালছেলে বলে নাম কিনতে পারলাম না। এ সব ক্ষেত্রে নিজের অক্ষমতার জন্য মনস্তাপ হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে দুঃখ গভীরতর, কারণ বাইরের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা পীড়া দিলেও তাকে মেনে নেওয়া ভিন্ন পথ থাকে না; কিন্তু নিজের অসামর্থ্য নিজের কাছে স্বীকার করে শান্ত হয়ে থাকা কঠিন।

কিন্তু সবচেয়ে মানসিক অশান্তি ও দ্বন্দ্বের কারণ হয় যখন মনের মধ্যে

২ N. L. Munn—Psychology. P. 136

বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা বা ভয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণের সুসমন্বয়ের অভাবে মন দিশেহারা হয়, যখন দ্বিধা-সংশয়ে মন দোদুল্যমান, যখন 'মনস্থির' করতে পারি না। Munn বলছেন—'Inability to make up our mind' on some issue demanding decision exemplifies such coflict,—the presence of conflicting possibilities of action may be more frustrating than any of the barriers already mentioned.?[৩]

সব ব্যক্তিই একই ভাবে বাধা ও সংঘাতের সম্মুখীন হয় না। এখানেই ব্যক্তিত্বের প্রভেদ ও চরিত্রের পরীক্ষা। কোন কোন ব্যক্তি বাধামাত্রকেই ভয় পায়। এরা দুর্বলচিত্ত। কেউ বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সংগ্রাম করে জয়ী হয়, কেউ বা নির্বোধের মত বাধার শক্তি নিরূপণে অথবা নিজ অক্ষমতা নির্ধারণে অক্ষম হয়ে জেদী একগুঁয়ে ভাবে পাথরের দেয়ালে মাথা কুটে বিক্ষত হয়, কেউ বা এই সংঘাত ও সংগ্রামে মানসিক সুস্থতা হারিয়ে গুরুতর মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়। খুব সামান্য কয়জন আত্মসংযমী যোগী পুরুষ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাতেই শান্ত নিরুদ্বিগ্ন থাকেন। নিজ আকাঙ্ক্ষাকে তাঁরা পরিমিত করেন। স্থির বিচার দ্বারা বাধার পরিমাণ ও নিজ শক্তির উপযুক্ততা বিবেচনা করে কাজে প্রবৃত্ত হন। তাঁরা কেবল স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত হন না, তাঁরা আদর্শানুযায়ী কল্যাণ বুদ্ধি দ্বারা নিজের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সমস্ত কর্মফল ভগবানে অর্পণ করে সর্ব অবস্থাতেই অচঞ্চল থাকতে পারেন।

অধ্যাপক কার্ট লিউয়িন বাধা ও সংঘাতের ক্ষেত্রে মানুষের ব্যবহার এক অভিনব দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করেছেন এবং এ বিষয়ে ব্যাখ্যা পদার্থবিদ্যা ও বলবিদ্যার ভিত্তিতে করতে চেষ্টা করেছেন। কোন জড়দ্রব্যের ক্রিয়া নির্ভর করে সেই দ্রব্যের উপর বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়ার উপর। প্রাণীর ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। সমস্ত প্রাণীর ব্যবহারই (behaviour) বিভিন্ন শক্তির আকর্ষণ বিকর্ষণের দ্বারাই নির্ণীত হয়। বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধে প্রাণীর আকর্ষণ বিকর্ষণের সম্বন্ধকেই জড় বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় valency এবং বিভিন্ন শক্তির প্রভাবের ফলে বস্তু (বা প্রাণীর) ব্যবহারের গতিতে বলা হয় vector। বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে বস্তুর আকর্ষণ বিকর্ষণের সমস্ত সম্বন্ধ জানা থাকলে কোন বিশেষ অবস্থায় সে বস্তুর গতি কি হবে তা আঙ্কিক ভাবে নির্ধারণ করা

৩ N. H. Munn—Psychology. P. 137

যায়। লিউয়িনের মতে প্রাণীর ব্যবহারও বল-বিদ্যার একই মৌলিক নিয়মগুলি অনুসরণ করে। যথা: একই বস্তুর উপর দুটি বিপরীত অথচ সমান আকর্ষণশক্তি ক্রিয়া করলে বস্তু ন-যযৌ: ন-তস্থৌ: অবস্থায় কখনো এদিকে কখনো ওদিকে সামান্য একটু হেললেও একই স্থানে স্থির থাকে। তেমনি, দার্শনিক বুড়িডানের গর্দ্দভ সম্বন্ধে এ গল্প প্রচলিত আছে যে, এই গর্দ্দভের দুই পাশে সমান লোভনীয় সমপরিমাণ খড়-বিচালির দুই বোঝা রাখাতে বেচারী 'দার্শনিক' গর্দ্দভ কোন্ বোঝাটা আগে খাবে তা স্থির করতে না পেরে অনাহারেই অগত্যা প্রাণত্যাগ করল।[৪] এটা হাস্যকর অতিশয়োক্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষের জীবনেও কি এমন ঘটে না? 'Holiday-on-Ice' দেখতে যাবে, না 'মরুতীর্থ হিংলাজ' দেখতে যাবে—এই দোটানায় পড়ে হয়ত শেষ পর্যন্ত সাতটা বেজে গেল, কোথাও যাওয়া হল না। আবার যেখানে একদিকে আকর্ষণ আর এক দিকে বিকর্ষণ, সেখানে দ্রব্য আকর্ষণের শক্তির কাছেই সহজেই আত্মসমর্পণ করে। মার কাছে গেলে বকুনি, আর বাবার কাছে গেলে আদর, ইস্কুল থেকে দেরীতে ফেরা মেয়ের সামনে এই যদি প্রশ্ন দাঁড়ায় তবে সে বাবার কাছেই যাবে, এতে আর সন্দেহ কি? এখানেও তার ব্যবহার জড়বিদ্যার মৌলিক নীতিই অনুসরণ করছে। আর দুই বিরুদ্ধ প্রবল শক্তি কোন দ্রব্যের উপর ক্রিয়া করলে এ দ্রব্য এ দুই শক্তির ক্রিয়ার পথ থেকে দূরে অন্য কোনখানে নিক্ষিপ্ত হবে। তেমনি ইস্কুল-থেকে-বাড়ীতে-দেরীতে-ফেরা মেয়ের সমস্যা যদি দাঁড়ায়, বাড়ীতে গেলে হয় বাবা মারবেন, না হয় মা বিষম বকুনি দেবেন তবে সে মেয়ে হয়ত পাড়ার 'মাসী'র বাড়ীতে পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে।[৫] লিউয়িনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ডাঃ মেয়ারও সাদা ইঁদুরের ওপর অনুরূপ পরীক্ষা করে তার ফলাফল ছবি ও ফটোগ্রাফ দিয়ে অনুরূপভাবেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, বাধার সম্মুখীন হয়ে প্রাণীও জড় দ্রব্যের মত বিভিন্ন অবস্থায় নির্দিষ্ট কতকগুলি মৌলিক রীতিই অনুসরণ করে।[৬] এ সমস্ত পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা অভিনব এবং হৃদয়গ্রাহী সত্য, কিন্তু মানুষ ঠিক জড়বস্তু নয় এবং তার ইচ্ছা, বিবেক, বুদ্ধি থাকার জন্যে তার ব্যবহারকে জড়বস্তুর মত যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না—এ কথাটা যেন যথেষ্ট স্বীকৃত নয়।

---

৪ C. M. Good Guide to Philosophy, P. 23.
৫ K. Lewin—Fi^'d theory and Experiment in Social Psychology.
৬ Dr. N. R. J. Maier P. 127.

বাধার ফলে মানুষের মনে যে সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং কি বিভিন্নভাবে মানুষ তার সম্মুখীন হয় তা একটু আলোচনা করা যাক্।

বাধামাত্রই বিরক্তিকর। আমরা যখন কিছু আকাঙ্ক্ষা করি, তখন যত শীগ্‌গির সম্ভব আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে আয়ত্ত করতে চাই। বাধা মানেই এমন অবস্থা যাতে আকাঙ্ক্ষা পূরণ বিলম্বিত অথবা তার সম্ভাবনা দূরীভূত হবে। এ অবস্থায় মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বিরক্তি ও অধৈর্য। আমরা বাধাকে সাধ্য হলে দূর করতে চাই এবং যে অবস্থা বা ব্যক্তি বাধা সৃষ্টি করে তার উপর রাগান্বিত হই। রাগটা কম হলে গালমন্দ করি, বেশী রেগে গেলে কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করি, আরো মাত্রা ছাড়ালে মারধোর করি। এখানেই বিশেষ করে টের পাই—ইতর শ্রেণীর চেয়ে আমরা খুব বেশী তফাৎ নই। কুকুরের মুখের খাবার অন্য কুকুরে কেড়ে নিতে গেলে সে তেড়ে যাবে, আক্রমণ করবে, ঘেউ ঘেউ করে পাড়া মাথায় করবে। আমরাও প্রায় তাই করি। যেমন: লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে সিনেমার টিকিট পাবার আশায় দাঁড়িয়ে আছ। শেষ টিকিটখানা তুমি ন্যায্যভাবে পেতে পারতে—হঠাৎ পেছন থেকে একটি ছেলে তোমায় ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে টিকিটখানা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল! তুমি এতে ভীষণ চটে যাবে, হয়ত বা খেউর খিস্তি করবে, গায়ের জোর থাকলে ছেলেটাকে মারধোরও করবে। মানুষ কুকুরের চেয়ে 'সভ্য'—কারণ তার 'ভাষা' আছে। মানুষ সভ্য হয়েছে বলে শারীরিক ঝগড়া কলহ প্রকাশ্যভাবে করতে সে লজ্জা বোধ করে—কিন্তু ঝগড়াটা চালায় হয়তো বা খবরের কাগজে 'কড়া' চিঠি লিখে। যেখানে রাগের বস্তুটি অতি প্রবল, যেখানে তিনি বড়সাহেব বা মুনিব—যেখানে রাগ প্রকাশটা প্রকাশ্য বা গোপনে প্রকাশ করাটাও নিরাপদ নয় সেখানে মনের ঝালটা হয়তো মেটাই অযথাই অধীনস্থ কর্মচারীকে গালাগালি করে। আমাদের দেশে একটা কথা আছে—"দরবারে না পাইয়া ঠাঁই, ঘরে গিয়া মাউগ কিলাই"—অর্থাৎ যে স্বামী দরবারে অসম্মান পেয়ে এসেছেন, তিনি তাঁর নিষ্ফল আক্রোশ প্রকাশ করেন ঘরের নিরীহ স্ত্রীর উপর। এ কাপুরুষতার লক্ষণ, সন্দেহ নেই, তবে এই কাপুরুষতার দোষে আমরা অনেকেই দুষ্ট। এখানে উদ্দেশ্য-বস্তুর স্থানচ্যুতি ও পরিবর্তন গ্রহণ ঘটেছে (Transference substitution)।

এ পরিবর্ত গ্রহণটা আরেকভাবেও ঘটতে পারে। "সহুরে মেয়ে অণিমাকে

ভালবাসি, তাকেই বিয়ে করবার জন্যে পাগল-কিন্তু তার বাবা মা'র মত নেই। একদিন হয়তো তাঁরা অপমান করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। রাগে দুঃখে গাঁয়ের মেয়ে 'শ্যামলী'কে বিয়ে করলাম। নিজের মনকেও বোঝালুম- 'এই ভাল হল'।

শিশুদের আকাঙ্ক্ষাপূরণের পথে বারে বারে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হলে তাদের ব্যক্তিত্বের সহজ বিকাশ তো ক্ষুণ্ণ হয়ই, তা ছাড়া তাদের মনের অসুস্থ অবস্থা শুধু ঝগড়া মারামারির মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় না। মিথ্যাকথা, চুরি ইত্যাদি গোপন অসামাজিক পথেও তাদের মানসিক সুস্থতার ভিত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যারা শিশু অপরাধীদের নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা জানেন শিশুর স্বাভাবিক সুস্থ আকাঙ্ক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যেই তারা অপরাধ করে। চুরি করে মিথ্যা কথা বলে নোংরামী ও কদর্য ব্যবহারের পথে বিকৃত তৃপ্তি খোঁজে। যে শিশুরা স্বাভাবিক স্নেহবঞ্চিত, যেখানে অতিরিক্ত শাসন তাদের স্বতঃ উৎসারিত উদ্যমের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে সেখানেই প্রায় ভবিষ্যৎ সমাজ-বিরোধিতার পথ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার মূল এখানেই খুঁজতে হবে। আমাদের দরিদ্র, নির্বোধ ও অসুস্থ সমাজ-ব্যবস্থায় শিশু, কিশোর ও যুবকদের খেলাধূলা, ভ্রমণ, আলোচনা সৃজনধর্মী আনন্দময় আত্মবিকাশের কোন সুচিন্তিত ব্যবস্থাই নাই। পদে পদে এদের স্বাভাবিক উদ্যম ও সৃজনশক্তি বাধাপ্রাপ্ত। রেফুউজী কলোনীর দুর্ভাগা ছেলেমেয়েরা যে হৈ হল্লা, ট্রাম পোড়ানো, পরীক্ষা পণ্ড করা, ধর্মঘট ইত্যাদি ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করে—এটা আকস্মিক নয়। এ নিয়ে দেশের যুবকদের শুধু গাল দিলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। রাশিয়া এ কথা জানে যে অপরাধের একটি মূল কারণ দারিদ্র্য ও সামাজিক কুব্যবস্থা। দেশের যুবশক্তির আত্মসম্ভ্রম জাগ্রত করতে পারলে এই প্রচণ্ড শক্তি দেশের কল্যাণেই নিয়োজিত হবে। অন্যান্য সব অগ্রসর দেশেই তাই চেষ্টা দেশের যুবকদের মন থেকে হতাশা ও হীনমন্যতা দূর করে দেওয়া, তাদের দেহ ও মনের সুস্থ বিকাশের জন্যে নানা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে। আমাদের দেশেও এ বিষয়ে কিছু কিছু সরকারী চেষ্টা চলছে। এ প্রশংসার কথা সন্দেহই নেই। কিন্তু দেশের জনমত জাগ্রত হয়ে এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে এগিয়ে না এলে অতি সামান্যই ফল হবে।

যারা অক্ষম ও দুর্বল-চরিত্র, তারা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভে অসমর্থ হলে পরকে নিজেদের অসাফল্যের জন্য দোষী করে। যে ছেলে পরীক্ষায় পাশ করতে

পারলো না, সে উচ্চৈস্বরে শিক্ষকের অযোগ্যতার কথা প্রচার করে। যে মেয়ে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেলো না সে বলে বেড়াতে থাকে বিচারকের পক্ষপাতিত্বের কথা। এবং ছেলেমেয়েদের এই পরনিন্দায় আমরা অভিভাবকরা সানন্দে যোগ দেই। এ অতিপ্রচলিত অভ্যাস আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি দুর্বলতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। আমাদের সংবাদপত্রে সমস্বরে বাঙালী দলনের অভিযোগ সর্বদা ধ্বনিত হ'য়ে থাকে বাঙালীর বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের ষড়যন্ত্রের এই অতিতীক্ষ্ণ প্রতিবাদের পেছনে সম্ভবতঃ নৈরাশ্যক্ষুব্ধ দুর্বল মনের পরাজিতের মনোবৃত্তি কিছুটা প্রকাশ পাচ্ছে।

বারংবার নিরাশার লজ্জা থেকে অহংকে আত্মরক্ষার জন্যে যে সব চেতন ও অবচেতন কৌশল আমরা অবলম্বন করি তাদের ইংরাজীতে Ego-defense-mechanism বলা হয়। এ নিয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি।[৭]

পরনিন্দা (Projection), আত্মদোষস্খলন (Rationalisation), দিবাস্বপ্ন কল্পনা (fantasy & daydream) ইত্যাদি কৌশলগুলির অধিকাংশই নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার অপটু কৌশল। এর মধ্যে সান্ত্বনা থাকতে পারে কিন্তু মহত্ত্ব ও পৌরুষ নেই। কিন্তু এর সব কৌশলগুলিই যে নিন্দনীয় তা নয়। কখনো কখনো এমন দেখা যায় যে বাইরের প্রতিকূলতাতেই হোক্, আর নিজ অক্ষমতার জন্যেই হোক্, কোন বিষয়ে সফলতা লাভ করতে পারলুম না, ভাল করে বিচার করে দেখলুম, এ ক্ষেত্রে সফলতার আশা বৃথা, তাই সংকল্প করলুম অন্য কোন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে এবং সে চেষ্টায় সফল হয়ে মনের গ্লানি কিছুটা দূর করতে সক্ষম হলুম। একে বলে অতিক্ষতিপূরণ (over-compensation)। কোন কুরূপা মেয়ের বাঞ্ছিত পুরুষ অন্য সুশ্রী মেয়ে দখল করে নিল। কিন্তু সে মেয়ে ভেঙে পড়লো না। শান্ত ধৈর্যের সঙ্গে সে লেখা পড়ায় মন দিলে, ক্রমে সে বিদেশে গেল। বিদেশে গিয়ে সাংবাদিকতায় উঁচু ডিগ্রী পেয়ে দেশে ফিরে এসে প্রসিদ্ধ এক কাগজের সম্পাদিকা হয়ে তাঁর লেখা দিয়ে দেশজোড়া নাম কিনলে। এ মেয়ের অন্তরের তিক্ততা ও গ্লানি তাকে ব্যর্থ বিক্ষোভের পথে নিয়ে যায় নি। তাকে নূতন ভাবে জীবনে সার্থকতা লাভের পথে উদ্বুদ্ধ করেছে। হয়তো যৌবনের প্রারম্ভে পরাজয়ের বেদনা সে স্নিগ্ধ ক্ষমায় মণ্ডিত করে তুলতে পারবে।

এ রকমই আর একটি মহৎ পথ হচ্ছে ফ্রয়েড যাকে বলেছেন—বাসনার

[৭] বিভুরঞ্জন গুহ—অবাধ্য শিশু ও শিক্ষাসমস্যা পৃঃ ৫০-৬৪

উন্নয়ন বা sublimation। দৈহিক ভালবাসার পথ যেখানে ব্যর্থ হোল, ভালবাসাকে অশ্রুজলে ধৌত করে, মহৎ মানব প্রেমে পরিণত করার কাহিনী বিরল নয়। দৈহিক প্রেমের এই দেহাতীত প্রেমে উত্তরণ মহৎ ধৈর্য ও বিপুল আত্মসংযমের পরিচায়ক।

নৈরাশ্য ও সংঘাত সম্পূর্ণ দূরীকরণ সম্পূর্ণ সম্ভবও নয়—উচিতও নয়। জীবনে অসাফল্য আসবেই এবং সংঘাতও অনিবার্য। সুস্থ সবল জীবন গড়ে তুলতে এদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু কিশোর ও তরুণদের জীবনে পৌনঃপৌনিক ও যুক্তিহীন বাধা—যুবশক্তির একান্ত অপচয় ঘটায় এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তা বিষম বিপজ্জনক। নৈরাশ্য ও বাধা অতিক্রমের সহজ বাঁধাধরা কোন পথ নেই। যেখানে গুরুতর মানষিক বিকৃতির সম্ভাবনা সেখানে মানসিক চিকিৎসার সুব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজন। দেশের ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে যে অস্বাভাবিক অসুস্থ অব্যবস্থা আমাদের তরুণ ও কিশোরদের জীবন অযথা ভারাক্রান্ত ও দুর্বিসহ করে তুলছে তার নিরসনে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে। আমাদের দেশের যুবকদের নৈরাশ্যবোধের সহস্র কারণ আছে। ভবিষ্যৎ জীবিকা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, অস্বাভাবিক বেশী পরীক্ষায় ফেলের হার তাদের লেখাপড়া সম্পর্কে বীতস্পৃহ করেছে। তাদের স্বাভাবিক জৈবশক্তিকে সৃজনমূলক ও কল্যাণকর পথে পরিচালনা করবার উদ্যম ও বুদ্ধি না আছে অভিভাবকদের, না শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের। অন্যদিকে বরং তাদের এ প্রচণ্ডশক্তি আত্মক্ষয়কারী, অথচ তরল ও উত্তেজনাকারী নানা প্রলোভনের পথে (সিনেমা, রেস্তোরাঁ) অপচয়ের আকর্ষণ প্রবল। রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্বও এ বিষয়ে সামান্য নয়। তাঁরা ছাত্রদের দলগত নানা আন্দোলনের পথে নিত্য আহ্বান কচ্ছেন। এ সব ক্ষেত্রে ছাত্রদল সহজে বাহবা পায়, তাদের বঞ্চিত অহংবুদ্ধি একটা সুলভ তৃপ্তিলাভের পথ পায়। তাদের চিন্তা ধ্বংসাত্মক পথেই ধাবিত হয়। তারা বিশ্বাস করতে শেখে তাদের দুর্দশার জন্য সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষক ও অভিভাবকই দায়ী। কিন্তু জীবনের সমস্ত দুঃখ, বেদনা নৈরাশ্যের জন্য অন্যেই দায়ী—এ তিক্ত, যুক্তিহীন মনোভাব তরুণদের মধ্যে গড়ে উঠছে এটা শুভ লক্ষণ নয়। দেশের তরুণরা এ কথা বিশ্বাস করুক—মানুষ তার নিজ চেষ্টা, নিজ উদ্যম দ্বারাই পৃথিবীর নানা অব্যবস্থা, অবিচার ও অপূর্ণতার প্রতিকার করে। প্রতিকূল অবস্থাতেও আমরা হার মানবো না, নিজেকে ফাঁকি দেবো না, কেবলমাত্র

অন্যের দোষ দেখবো না—এমন মনোবৃত্তি, এমন বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে। দৃঢ় চরিত্রগঠনই নৈরাশ্য ও সংঘাত জয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। এ পথ ফাঁকির নয়। আত্মপরীক্ষা, ধৈর্য, শান্ত বিচার বুদ্ধি ও আত্মসংযম দ্বারাই জীবনের সত্যিকারের সাফল্য লাভ করা যায়। নান্যপন্থাঃ বিদ্যতে।

মানসিক রোগ ও তাহার চিকিৎসা

একদিন ছিল যখন মানুষ মানসিক ব্যাধিকে অত্যন্ত ভয়ের চোখে দেখত। তখন মানুষ বিশ্বাস করত কোন অশুভ অ-প্রাকৃত শক্তির প্রভাবেই এ রকম রোগ হয়ে থাকে। কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আজ জেনেছে—দেহের ব্যাধি ও মনের ব্যাধির মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। দেহের ব্যাধির কারণগুলি জানা গেলে যেমন তার চিকিৎসা সহজ হয়, তেমনি মনের ব্যাধির চিকিৎসার সাফল্যও নির্ভর করে তার কারণগুলি আবিষ্কার করতে পারলে। মনস্তত্ত্বে ও মনোবিশ্লেষণে অভিজ্ঞ ডাক্তাররা ক্রমশই মনের অস্বাস্থ্যের কারণগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়ে খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলেছেন। তাই এই ব্যাধিগুলি সম্বন্ধে তাদের আগের সেই ভীতি দূর হয়ে গেছে। তাঁরা আজ মনে করেন যে অধিকাংশ মানসিক রোগ চিকিৎসা-যোগ্য। বাস্তবিকপক্ষে দেখা গেছে—মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য যারা হাসপাতালে যান তাদের মধ্যে শত-করা সত্তর জন হয় নিরাময় হয়ে ফিরে আসেন অথবা তাঁদের রোগের উল্লেখ-যোগ্য উপশম ঘটে। তবে এ চিকিৎসা প্রায়ই ধৈর্য ও সময় সাপেক্ষ। কিন্তু ডাক্তারেরা আজকাল আশা করেন যে উপযুক্ত চিকিৎসায় মানসিক রোগে আরোগ্যের আশা অন্য দৈহিক রোগের তুলনায় অধিক হওয়া সম্ভব।

মানসিক ব্যাধিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ—সাইকো-নিউরোসিস্ (psycho-neurosis) ও সাইকোসিস্ (psychosis)। সাইকো-নিউরোটিক্‌সদের আবেগ ও অনুভূতির জীবন সুসংযত নয়। তাদের বিভিন্ন আবেগের মধ্যে মিল হয়নি তাই তারা অশান্ত ও অসুখী। তবে তাদের আন্তরিক সংঘাত তাদের ব্যক্তিত্বকে এতটা বিপর্যস্ত করেনি যে তাদের হাসপাতালে বা উন্মাদাগারে আবদ্ধ করে রাখা প্রয়োজন।

সাইকোটিকদের মানসিক বিপর্যয় গুরুতর রকমের। তাদের অবচেতন মনের বিষম সংঘাতের ফলে তাদের ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রের একতা বিপর্যস্ত। তার ফলে সাধারণ সমাজ-জীবনে তারা নিজেদের মানিয়ে চলতে পারে না। একাধিক ব্যক্তি যেন বিভিন্ন সময়ে একই দেহ আশ্রয় ক'রে বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ চরিত্রে অভিনয় করতে থাকে। এদের হাসপাতালে বা উন্মাদাগারে বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন।

এই গুরুতর মানসিক রোগীদের বিষয় সামান্য কিছু আলোচনা করা যাক। নানা ধরণের সাইকোসিস্ আছে।

(১) সিজোফ্রেনিয়া schizophrenia—এ জাতীয় রোগীরা নিজেদের কল্পনাদ্বারা সৃষ্ট অদ্ভুত এক অবাস্তব জগতে বাস করে। বাস্তব জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ যুক্তিসঙ্গত চিন্তায় এরা অসমর্থ। কাজেই সমাজ-জীবন যাপন এদের পক্ষে অসম্ভব।

(২) ইন্‌ভল্যুসন্যাল মেলানকোলিয়া (involutional melancholia)—এ রোগীদের মনের মধ্যে অতিরিক্ত ক্লান্তি, বিষণ্ণতা ও নিজ জীবনের মূল্য-হীনতা সম্বন্ধে একটা মিথ্যা ভাব থাকে। এসব রোগীদের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না। মানুষের সঙ্গে মিশতে অনিচ্ছা, নিজেকে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা, সমস্ত বিষয়ে নিরুৎসাহতা বা নিরাসক্তি এ বিকারের লক্ষণ।

(৩) ম্যানিক ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস (manic depressive psychosis) —এই মানসিক বিকারের রোগী কখনও ভয়ানক উত্তেজিত (manic) আবার কখনও বা নিতান্ত অবসন্ন (depressive)। উত্তেজিত অবস্থায় রোগী খুব চীৎকার করে গালাগালি করে। অনবরত নাচে বা পা নাড়ে। অস্বাভাবিক আনন্দ প্রকাশ করে—ধেই ধেই করে নাচে উচ্চৈঃস্বরে গান গায় ইত্যাদি। অবসন্ন অবস্থায় রোগী অত্যন্ত বিষণ্ণ ও অনুতপ্ত হয়। কিছু খেতে চায় না, কাজ করতে চায় না—কখনো বা আত্মহত্যা করতে চায়। কখনো কখনো এদের জোর করে টিউবদিয়ে খাইয়ে দিতে হয়। এ অবস্থায় এদের চোখে চোখে রাখা দরকার।

(৪) প্যারানোয়িয়া (paranoid schizophrenia)—এসব রোগীরা নিজেদের সৃষ্ট ভ্রান্তির জগতে বাস করে। কেউ ভাবছে সে লক্ষ টাকার মালিক (delusions of grandeur) কেউ ভাবছে তাকে সবাই বিষ দিতে চেষ্টা

কচ্ছে, (delusions of persecution)। কেউ ভাবছে সবাই তার কথাই বলাবলি কচ্ছে (delusions of reference)। কেউ ভাবছে তার দেহে কোন রক্ত নেই বা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি রবার দিয়ে তৈরী। ভ্রান্তির বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে হয়তো তারা স্বাভাবিক মানুষের মতই ব্যবহার করে।

চিকিৎসা : সাধারণতঃ চারটি প্রধান উপায়ে এ রোগীদের চিকিৎসা করা হয়। (১) ঔষধ প্রয়োগ (২) ইলেকট্রিক সক (Shock) প্রয়োগ (৩) অস্ত্র-চিকিৎসা ও মনোবিকলন পদ্ধতির ব্যবহার (Psychotherapy)।

(১) ইনস্যুলিন মেট্রাজোল ইত্যাদি ঔষধ মানসিক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইনস্যুলিন একটি জীবদেহস্থিত গ্রন্থির ক্ষরণ। অল্প পরিমাণেও রক্তস্রোতের উপর এর যথেষ্ট প্রভাব আছে! ইন্‌স্যুলিন রক্তে শর্করা সঞ্চয় নিবারণ করে। তাই বহু মূত্র রোগে এর ব্যবহার সুপরিচিত। মস্তিষ্কে ও দেহাভ্যন্তরস্থ আবেগের কেন্দ্রগুলি ইন্‌স্যুলিন ব্যবহারে প্রবলভাবে ধাক্কা খায় এবং বাল্যকালের কোন তীব্র রুদ্ধ আবেগের মুক্তির পথ সহজ করে রোগীকে সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করে। মেট্রোজোল একটি কৃত্রিম রাসায়নিক ভেষজ। মানসিক রোগের ক্ষেত্রে এর প্রভাব ইনস্যুলিনেরই মত। বর্তমানে একটি ভারতীয় গুল্মের (Raw Oalphia Serpentina) শিকড় হতে প্রস্তুত ঔষধ প্রয়োগ করেও অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গেছে। প্রাচীনকালে এ ঔষধ কঠিন জ্বর রোগে বা সর্পাঘাত চিকিৎসায় ব্যবহৃত হোত। কিছুদিন যাবৎ রক্তের উচ্চচাপ রোগে এবং মানসিক রোগ চিকিৎসায় সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মস্তগুণ হচ্ছে এ ঔষধ মস্তিষ্কের স্নায়ু-কেন্দ্রের উপর সোজাসুজি কাজ করে। ক্ষুব্ধ আবেগের কেন্দ্রগুলিকে শান্ত করে, দুশ্চিন্তা কমিয়ে দেয়। এ ঔষধে রোগীকে শান্ত করে এবং অন্যদিকে তার শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে অন্য চিকিৎসা সম্বন্ধে আনুকূল্য করে। এ ঔষধ নিয়ে এখন অনেক গবেষণা হচ্ছে।

(২) কোন কোন ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের অসুস্থ কেন্দ্রগুলিকে বৈদ্যুত-শক্তিদ্বারা সোজাসুজি সক্রিয় করে তোলা হয়। এখানেও চেষ্টা হল বৈদ্যুতশক্তির ধাক্কা দিয়ে রুদ্ধ আবেগ বা অনুভূতির পথ মুক্ত করে দেওয়া। তাই এই চিকিৎসার নাম electric shock therapy। মানসিক রোগের প্রাথমিক অবস্থায় এ চিকিৎসায় অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়।

(৩) মানসিক রোগ চিকিৎসায় অস্ত্রচিকিৎসার স্থান সংকীর্ণ। যে স্নায়ুশিরা

তন্তুগুলির দ্বারা মস্তিষ্কে আবেগ ও অনুভূতির কেন্দ্রের যোগ তা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে চিকিৎসক রোগীর চেতন অনুভূতির উপর অবচেতন মনের চাপ কমিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলতে চেষ্টা করেন। এ চিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন এবং অতি গুরুতর মানসিক রোগের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র চিকিৎসা করা হয়।

(৪) পূর্বের চিকিৎসাপদ্ধতিগুলি সবই বাহ্য। কিন্তু ফ্রয়েডের পর থেকে, মানসিক রোগের ক্ষেত্রে অবচেতন মনের চিকিৎসা ক্রমশঃ গুরুত্ব লাভ করেছে। অবচেতনবাদীদের মতে সমস্ত মানসিক রোগের মূলে আছে, অবচেতন ও চেতন মনের সংঘাত। শিশুকালে কোন গুরুতর আবেগ সহজপ্রকাশের পথ না পেলে, তা অবচেতন মনের গভীরে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং চেতনার স্রোত থেকে সে অন্ধ আদিম জৈবশক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব একটি জটিল জগৎ সৃষ্টি করে (dissociation)। আবেগের সহজ প্রকাশ রুদ্ধ হয় কেন? তার কারণ, এই আদিম আবেগশক্তির প্রকাশ সমাজজীবনের কৃত্রিম বিধিনিষেধের বিরোধী। শিশুর মনের সহজ আবেগ ও অনুভূতি বয়স্কদের সামাজিক নিয়মকানুন ভদ্রতার কাছে বাধা পায়। সংসারের জটিল পরিবেশে শিশু অকুণ্ঠ চিত্তে লোভ করতে পারে না, রাগে ফেটে পড়তে পারে না, ইচ্ছামত কেড়ে নিতে পারে না—প্রাণ খুলে ভালবাসতে বা ভয় করতেও পারে না। বড়দের জগৎ শুধুই তার অসংযত সহজ অনুভূতিগুলির দিকে শাসনের তর্জ্জনীতুলে বলে "না, না, না, না"। শিশুকে বড়দের জগতে, বড়দের নিয়ম মেনে চলতে হয়। না হলে তাকে শাস্তি পেতে হয় দুঃখ পেতে হয়। তাই তাকে শিখতে হয় তার প্রবল অনুভূতিগুলিকে গোপন করতে, শাসন করতে —সমাজের চোখরাঙানীর থেকে দূরে রাখতে। এরা অ-ভদ্র কিন্তু এরা প্রবল। এ কালো দৈত্যদের তাই শৃংখলাবদ্ধ করে বন্দী করে রাখতে হয় অবচেতন মনের গভীর অন্ধকারে। এমনি করেই সুরু হয় চেতন ও অবচেতন মনের মধ্যে সংঘাত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ দুয়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যায় তাই গুরুতর ক্ষতি হয় না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এ বনিবনাও হয় না। তার ফলেই ঘটে মানসিক চাঞ্চল্য, অশান্তি এবং গুরুতর ক্ষেত্রে মানসিক বিকার। অবচেতনবাদীরা বলেন, এই অবচেতন মনের রুদ্ধ আবেগ-গুলিকে সহজ প্রকাশের পথ করে দিতে পারলে তবেই রক্ষা। এরই একটি পদ্ধতি হচ্ছে মনোবিকলনের মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণালী। চিকিৎসক রোগীর বিশ্বাস

উৎপাদন করে সহজ পরিবেশে তার সঙ্গে আলাপ করতে থাকেন। রোগীকে বলা হয় তার মনে যে কথা, যে চিন্তা আসে, তাই যেন সে বলে যায়। তাতে দেখা যায় কোন কোন জায়গায় সে থেমে যাচ্ছে—সংকোচ বা দ্বিধা বোধ কচ্ছে অভিজ্ঞ চিকিৎসক বুঝতে পারেন সেখানেই হয়তো অবচেতন মনের কোন বাধা সে কাটিয়ে উঠতে পাচ্ছে না। ক্রমে ক্রমে সে সহজ হয়ে আসে, চিন্তার এ মুক্ত-অনুসঙ্গের (free association) টানে তার অতীত বাল্যজীবনের এমন অনেক ঘটনা ও অভিজ্ঞতার কথা সে বলে যায় যার স্মৃতি তার তেমন মনে ছিল না। এমনি করে তার অবচেতন মনের রুদ্ধ আবেগ মুক্তি পায় এবং রোগী নিজেই বুঝতে পারে তার রোগের মূল কোথায়। তখন তার চেতন ও অবচেতন মনে একটা বোঝাপড়া ও মিলমিশ হয়ে যায়—তখন তার মন শান্ত হয় তার মানসিক রোগ দূর হয়। বাস্তবিক পক্ষে রোগীই এখানে নিজের চিকিৎসক। সে যখন সচেতন ভাবে বুঝতে পারে তার জীবনে সংঘাতের মূল কোথায় এবং তার স্বরূপ কি, তখনই তার অবচেতন মনের গ্রন্থিমোচন হয় তখনই সে নিজ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে, নিজ জীবনতরণীর কর্ণধার হতে পারে। এ চিকিৎসা সহজ নয় এবং অভিজ্ঞ মানসিক রোগ বিশারদ ভিন্ন এ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ সম্ভব নয়। তবে আশার কথা ও আনন্দের কথা এই যে এ সব পদ্ধতির উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা মানসিক রোগ চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে খুব ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে।

ফ্রয়েড প্রসঙ্গে

চুল বাঁধবার যেমন, শাড়ী ব্লাউসের তেমনি এক একটি 'ফ্যাসান এক এক সময় চালু হয়। তখন সব মেয়েরই সেই 'ফ্যাসানে' চুল বাঁধা চাই আর সাধ্য হ'লে তেমনি শাড়ী ব্লাউস সংগ্রহ করাও চাই। তা না হ'লে 'গেঁয়ো বাঙাল' বলে গাল খেতে হবে। 'ফ্যাসান' মানেই হচ্ছে নতুনের হুজুগ। তা দু'দিনেই পুরণো হয়ে যায়। আজ 'কাঞ্চীভরম্' শাড়ী জোর গরম ফ্যাসান—এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, আগামী পুজোর বাজারে 'কাঞ্চীভরম' অচল হয়ে যাবে।

চিন্তার জগতেও তেমনি এক একটি 'ফ্যাসান' আসে। সবজান্তা সাংবাদিকদের কল্যাণে তখন সে ফ্যাসান দেশব্যাপী চালু হয়ে যায়—সবাই তা নিয়ে কথা বলে, তর্ক করে, বিশেষজ্ঞের মত মন্তব্য ক'রে এ কথা জানাতে চায় যে, সে 'আপ-টু-ডেট্'—সে পেছিয়ে নেই। জানে, সে তত জাহির করে বেশী। এখন স্পুটনিক আর রকেট্ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে, আলোচনা চলছে—তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সোরগোলটা যত বেশী, সার পদার্থ ততটা বড় থাকে না। আমাদের একটা ভাসা ভাসা ধারণা জন্মেছে—তাকে মূলধন করেই আমরা বাজার গরম করছি। জ্ঞানের প্রসার ডিমোক্র্যাটিক যুগে নিতান্তই বাঞ্ছনীয়; তবে অনেক সময় তার বিপদ হচ্ছে—এ রকম 'পপ্যুলার' জ্ঞানের প্রসার—বিষয়ের গভীর জ্ঞানের পথে বাধা।

ফ্রয়েড্ সম্পর্কে আমাদের চিন্তা (না কোলাহল ?) সম্বন্ধে এ কথা বেশী সত্য। বিগত মহাযুদ্ধের পর থেকে ফ্রয়েড চিন্তাজগতে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে। মানুষের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা প্রচলিত মনস্তত্ত্বকে এমন বিষম নাড়া দেয় এবং তাঁর চিন্তার তাৎপর্য এতই সুদূরপ্রশারী যে, স্বভাবতঃই তা বিরোধ ও বিতর্কের সৃষ্টি করে। আবার তাঁর মতবাদ এমন অভিনব এবং বৈপ্লবিক ছিল বলেই একদল তরুণ ও উৎসাহী সমর্থকও জুটে যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দুই পক্ষই অন্ধ আবেগ দ্বারাই চালিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ফ্রয়েডের মতবাদের গভীরে প্রবেশ করেন নি—তাঁর চিন্তার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন নি। তা'ছাড়া সত্যনিষ্ঠ এই জ্ঞান-তপস্বীর চিন্তা একটি অনড, অচল কাঠামোর মধ্যে বন্দী হয়ে থাকেনি। তিনি খাঁটি বৈজ্ঞানিক, তাই সারা জীবন ভরে কেবলই পর্যবেক্ষণ করেছেন, পরীক্ষা বিশ্লেষণ করেছেন, সূত্রানুসন্ধান করেছেন; আবার সিদ্ধান্তকে নতুন করে যাচাই করেছেন—নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে। তার ফলে তাঁর পুরণো সিদ্ধান্তের আংশিক বা মৌলিক পরিবর্তনও কখনো কখনো ঘটেছে। তাতে তাঁর অনুবর্তীরা হয়ত বিস্মিত বা বিব্রত হয়েছেন, কিন্তু নিজের ভুল স্বীকার বা সংশোধন করতে কখনও তিনি লজ্জিত হন নি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রমশীলতা ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে ডারুইনের তুলনা দেওয়া চলে। এ বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠাও তাঁকে বোঝবার পথে কতকটা অন্তরায়। দীর্ঘ আয়ু তিনি পেয়েছিলেন (১৮৫৬-১৯৩৯) এবং যৌবনের প্রারম্ভ থেকে মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর সদাজাগ্রত সতেজ মন নিয়ে একাগ্রভাবে বিজ্ঞানের সাধনায় রত

ছিলেন। সাংসারিক ঝড-ঝঞ্ঝা, রাজনৈতিক প্রতিকূলতা, সামাজিক নিন্দা, সহকর্মীদের বিরুদ্ধতা, কিছুই তাঁকে তাঁর সাধনার ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাঁর এ সাধনার ইতিহাস ছাত্রসমাজের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রচারিত হওয়া একান্ত কর্তব্য। তাঁর মতামত আমরা গ্রহণ করি বা নাই করি, তাঁর একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা, বিচারবুদ্ধি, শ্রমশীলতা, চিন্তার সততা স্বতঃই আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। তিনি কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে শুদ্ধ যুক্তি-বুদ্ধি-বিচারের উপরই নির্ভর করেছেন, আবেগের দ্বারা চালিত হন নি। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের নির্মম সাধক।

ফ্রয়েড্ জন্মেছিলেন (১৮৫৬) অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত মোরাভিয়ার ফ্রাইবার্গ-এ। আর তাঁর মৃত্যু ইংল্যাণ্ডে (১৯৩৯)। নাৎসীরা যখন অষ্ট্রিয়া দখল করে নেয় তখন তাঁদের ইহুদীবিদ্বেষের নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত দেখে তিনি ১৯৩৭ সালে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানেই দু'বছর পরে তিনি মারা যান। কিন্তু জীবনের অধিকাংশ তিনি কাটিয়েছেন ভিয়েনায়, ভিয়েনাই তাঁর কর্মজীবনের পীঠস্থান।

ফ্রয়েডের দীর্ঘ জীবনকাল বিজ্ঞানের অগ্রগতির স্বর্ণযুগ। তিনি এবং আরো বহু প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী এই যুগের মানসক্ষেত্রকে উর্বরা করেছেন এবং এই যুগের চিন্তার গতি তাঁদের মনকেও প্রভূতভাবে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল সন্দেহ নেই। ১৮৫৯ সালে ফ্রয়েডের বয়স যখন মাত্র ৩ বৎসর, তখন ডারুইনের যুগান্তরকারী পুস্তক 'Origin of the Species' প্রকাশিত হয়। ডারুইনের পূর্বে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে, মানুষ অন্যান্য প্রাণীর থেকে পৃথক,—তার আত্মা আছে। অন্যান্য প্রাণীদের তা নেই। কাজেই মানুষের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে কিন্তু ডারুইন প্রমাণ করলেন, মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর মূলতঃ কোন প্রভেদ নেই, ক্রমবিকাশের ধারায় এক কোষবিশিষ্ট এ্যামিবা হ'তে জটিল থেকে জটিলতর দেহযন্ত্রসম্পন্ন প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ এই ক্রমোন্নতির ধারার শেষ ফল ও জটিলতম পরিণতি। সুতরাং মানুষ প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং তখন থেকেই মানুষ প্রকৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয়ীভূত হোল।

পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৬০ সালে গুস্টাভ্ ফেক্‌নার সংবেদন ইত্যাদি চেতনক্রিয়া পরিমাপের উপায় উদ্ভাবন করে এ কথা প্রমাণ করলেন, মানুষের মন কোন ভৌতিক বা অপ্রাকৃত পদার্থ নয়। অর্থাৎ অন্যান্য বিজ্ঞানের মত মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রেও পরিমাণগত মাপনের পদ্ধতি প্রচলিত হল। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন হোল।

এই দুই বৈজ্ঞানিকের চিন্তা তরুণ ফ্রয়েডের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। এ সময় থেকে ইউরোপের শিক্ষিত সমাজ প্রাণীবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দিকে অধিকতর পরিমাণে আকৃষ্ট হতে থাকেন। লুই পাস্তুর, রবার্ট কক্ ও লিস্টারের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার চিকিৎসাক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এঁরা প্রমাণ করলেন, অধিকাংশ ব্যাধির মূলেই আছে জীবন্ত বীজাণুর আক্রমণ। তাদের খোলাচোখে দেখা না গেলেও লিউয়েন্‌হোয়েকের আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই রইলো না। জীবাণুতত্ত্ব নামে এক নতুন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হোল। এ সময়েই এক পাদ্রী, গ্রেগর মেণ্ডেল তাঁর বাগানে মটরদানা নিয়ে বহু পরীক্ষা করে বংশানুক্রমণের (heredity) মূলসূত্র আবিষ্কার করলেন।

এ সব নতুন বিজ্ঞানই ফ্রয়েডের সজীব মনকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন পদার্থবিদ্যার অগ্রগমনে। হেলম্‌হোলৎস্ এ সময়ে শক্তির অবিনশ্বরতাবাদ প্রমাণ করেন। এ কথা প্রমাণিত হোল যে শক্তি স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে পারে, শক্তির রূপও পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু সমগ্র বিশ্বে শক্তির পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। কাপের গরম-চা'র উত্তাপটা কাপে এবং আশেপাশে বাতাসে ছড়িয়ে যায়, কিন্তু সে উত্তাপশক্তিটা হারিয়ে যায় না।

এই যে জগৎব্যাপী শক্তির লীলা ও গতি এবং সর্বত্র-নির্দিষ্ট নিয়মানুসরণ—এ কথাটা ফ্রয়েডকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মানুষের মন যদি প্রকৃতিরই অঙ্গ হয়, তা'হলে সেখানেও চলছে এই লীলা এবং এই নিয়মানুসরণ। সেই শক্তির প্রকৃতি কি, কি তার গতির নিয়ম, মানুষের মনের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে তাই তিনি খুঁজেছেন। মানুষের মনের যে সব সচেতন ক্রিয়া নিতান্ত অর্থহীন মনে হয়, তারাও কোন সূক্ষ্মতর শক্তিরই প্রকাশ মাত্র, এই বিশ্বাস ক্রমশঃ তাঁর মনে বদ্ধমূল হোল। পাস্তুর যেমন করে ব্যাধির পশ্চাতে অদৃশ্য জীবাণু আবিষ্কার করেছিলেন তিনিও তেমনি চাইলেন চেতন মনের বিকারের পশ্চাতে অদৃশ্য গোপন অবচেতনার স্বরূপ নির্ণয় করতে। এটা অবশ্য অনেক পরের কথা।

১৮৭৩ সালে ফ্রয়েড্ ডাক্তারী পডবার জন্য ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে শারীরবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণাগারের ডাইরেক্টর ছিলেন অরনেস্ট ব্রুকে (Brucke)। ১৮৭৪ সালে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ব্রুকের Lectures

on Physiology প্রকাশিত হয়। তাতে ব্রুকে সাহসের সঙ্গে এই মত প্রচার করেন যে, প্রাণীদেহ জীবনী-শক্তি সমবায়ের কেন্দ্রস্থল এবং জৈবশক্তি ও মূলতঃ রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার নিয়মই অনুসরণ করে থাকে। ব্রুকের মতামত তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, এ কথা ফ্রয়েড্ নিজেই অসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন। জগদ্ব্যাপী শক্তির এই গতিশীল বিকাশ ও ক্রিয়ায় ফ্রয়েডও অসংশয়ে বিশ্বাসী এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানব-ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে সেই শক্তির অনুসন্ধান তিনি করেছিলেন। দীর্ঘ বিশ বৎসর গবেষণার পর তিনি এই দৃঢ় সিদ্ধান্তকে স্থাপন করতে সক্ষম হন যে মানব-ব্যক্তিত্বের মূল সক্রিয় শক্তি সচেতন মনের পশ্চাতে অদৃশ্য ভাবে ক্রিয়া করে এবং সে অবচেতন মনের ক্রিয়া আকস্মিক নয়। মনোজগতের ক্ষেত্রে তাঁর এ আবিষ্কার বাস্তবিকই যুগান্তকারী এবং এর তাৎপর্যও সুদূরপ্রসারী।

১৮৮১ সালে ফ্রয়েড্ ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিদ্যার পাঠ সমাপন করে ডিগ্রী লাভ করেন। কিন্তু তাঁর ডাক্তারী করার ইচ্ছা ছিল না; তাঁর বরাবরই ইচ্ছে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত হবেন। পাশ করার পরও বহু বৎসর তিনি মানবমস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রায় কখনও অর্থকরী হয় না। তা ছাড়া বৃহৎ ছিল ফ্রয়েডের সংসার, নিজেরই ছয়টি ছেলেমেয়ে, আরও পোষ্য ও আগন্তুকের ভরণপোষণের ভার ছিল তাঁর উপরে। সে সময় থেকেই ইহুদীবিদ্বেষের বিষ অষ্ট্রিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীতে উন্নতির আশা ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে ব্রুকের পরামর্শমত তিনি ডাক্তারী সুরু করলেন। এতদিন দেহবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনি রোগের কারণ জেনেছিলেন দেহে, কিন্তু এবার বাস্তবক্ষেত্রে রোগীদের চিকিৎসায় রত হয়ে তাঁর দৃষ্টি পড়ল তাদের মনের বিকারের দিকে।

ক্রমশঃ তিনি মনোবিকারের চিকিৎসায় পারদর্শিতা লাভ করতে মনস্থ করলেন। এতদিন পর্য্যন্ত মনের রোগের চিকিৎসা অনেকটা আন্দাজের উপরই চলত এবং এ রোগ 'মাথার ব্যামো'—এটাই ছিল ধারণা। তাই মাথা ঠাণ্ডা রাখার নানা ব্যবস্থাই ছিল এ নব রোগের চিকিৎসার উপায়। এ সময়ে জঁা শারকোঁ (Jean Charcot) নামে এক চিকিৎসক এক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে মানসিক রোগের চিকিৎসায় কিছুটা কৃতিত্ব অর্জন করেন। শারকোঁ এ রকম রোগীদের সম্মোহিত (hypnotism) করে ইঙ্গিতের

সাহায্যে (suggestions) চিকিৎসকের ইচ্ছাশক্তি (will force)' প্রয়োগে রোগীকে অনেক সময় নিরাময় করে তুলতেন। ফ্রয়েড্ এ নূতন চিকিৎসাপদ্ধতি শিক্ষার জন্যে এক বৎসর শারকোঁর অধীনে কাজ করেন (১৮৮৫-৮৬)। তিনি ফিরে এসে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি কিছু দিনের মধ্যেই দেখতে পেলেন যে, এ প্রণালীতে নিরাময় সম্পূর্ণ হয় না; সাময়িক উপশম হলেও রোগ আবার দেখা দেয়। এ ছাড়া তাঁর বৈজ্ঞানিক মন এ অন্ধ চিকিৎসা প্রণালীতে সন্তুষ্ট হল না। তিনি এ পদ্ধতিতে এ প্রশ্নের জবাব পেলেন না—মানসিক রোগের মূল কারণ কি? এবং কি করেই বা তার মূলোচ্ছেদ হতে পারে। সম্মোহন প্রণালীতে রোগের যদি আপাত উপশম হয়, তাই বা কেন হয়? অবশ্য একদিন ছাত্রদের সঙ্গে শারকোঁর কথোপকথনের সূত্রে ফ্রয়েড্ একটা মৌলিকতত্ত্বের ইঙ্গিত পান—যেটা তাঁর নতুন দর্শনের ভিত্তি হয়েছিল। একদিন একটি হিষ্টিরিয়া রোগিনীর সম্বন্ধে শারকোঁর ছাত্ররা আলোচনা করছিলেন এবং তাঁদের একজন শারকোঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কেন বিশেষ কতকগুলি উপসর্গ এক্ষেত্রে দেখা দেয়? শারকোঁ বেশ উত্তেজিতভাবে উত্তর দেন—এ জাতীয় উপসর্গের মূল সর্ব্বদাই কোনপ্রকার যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি। একটু থেমে, তিনি খুব জোর দিয়ে বললেন—'সর্ব্বদা, সর্ব্বদা, সর্ব্বদাই!' ফ্রয়েডের মনে এ ধারণা দানা বেঁধে উঠছিল যে, সমস্ত মানসিক রোগের মূলে কোন অদৃশ্য অবচেতন শক্তি ক্রিয়া করে। ফ্রয়েডের সহপাঠী জ্যানেটও এ সম্বন্ধে অনুরূপ একটা ধারণা করেছিলেন। তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, মন একটা অবিচ্ছিন্ন স্রোত নয়, তার মধ্যে কখনো কখনো একাধিক পরস্পর-বিচ্ছিন্ন স্রোত চলতে থাকে। মানসিক দুর্ব্বলতার জন্যে ব্যক্তির চেতনমানস এই বিচ্ছিন্ন স্রোতগুলিকে একত্র করতে না পারলেই মানসিক বিকার ঘটে। এ ঘটনাকে জ্যানেট্ বলেছেন 'ডিসোসিয়েশ্যান্'। এ ডিসোসিয়েশ্যান্ তত্ত্ব ফ্রয়েডের দর্শনে ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু জ্যানেট্ ও ফ্রয়েডের মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। জ্যানেটই প্রথম ডিসোসিয়েশ্যান তত্ত্ব আবিষ্কার করেন সত্য, কিন্তু কেন মনের কোন একটি অভিজ্ঞতা সমগ্র চেতনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবচেতন মনে বিস্মৃতির অন্ধকারে আত্মগোপন করে এবং কিভাবে সে শক্তি ক্রিয়া করে, তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেন নি। ফ্রয়েড এই ডিসোসিয়েশ্যানের 'কেন'র উত্তর দিতে গিয়েই

তাঁর বহু বিচিত্র দর্শনহর্ম্যের ভিত্তিমূলের সন্ধান পান। ফ্রয়েড্ বললেন যে মনের কোন আকাঙ্ক্ষা বা অভিজ্ঞতা মূল মানসস্রোত থেকে তখনই বিচ্ছিন্ন হয়, যখন তা ব্যক্তির সমগ্র চেতন মানসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে বিরোধী এবং এ বিরোধের প্রধান কারণ হল যে, সে অভিজ্ঞতা বা আকাঙ্ক্ষা সমাজের দৃষ্টিতে দূষণীয়। ফ্রয়েড্ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন অনেক গবেষণার পর, অনেকদিন বাদে।

ভিয়েনার আর একজন ডাক্তার ক্রয়ারের সহযোগী হয়ে তিনি নূতনতর আর একটি চিকিৎসা পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। এ হচ্ছে যেন মানসিক 'রেচক' (catharsis)। ক্রয়ার্ দেখেছিলেন—রাগ, দুঃখ ইত্যাদি তীব্র আবেগ প্রকাশ হয়ে গেলে মন হালকা হয়। তেমনি মানসিক রোগে যারা ভুগছে তাদের সম্মোহিত না করে, আরাম কেদারায় স্বচ্ছন্দে শুইয়ে দিয়ে মনে যা আসে, তাই অনর্গল বলে যেতে দিলে, তাদের মনও হালকা হয়ে তাদের রোগ সেরে যায়। ক্রয়ার্ কতগুলি কারণে এ চিকিৎসাপদ্ধতি ছেড়ে দিলেন—কিন্তু ফ্রয়েডের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হোল যে মানুষের মনের বিকারের মূল কারণ এ পদ্ধতিতেই পাওয়া সম্ভব। এ পদ্ধতির সংস্কার ও শোধন করেই তিনি মুক্ত অনুসঙ্গ পদ্ধতি (free association method) বা মনোবিকলন (psycho-analysis) প্রণালী প্রচলন করলেন। তিনি বুঝলেন মানুষের চেতন মন তার সমগ্র মনের সামান্য একটু কৃত্রিম প্রকাশ মাত্র। মানুষের মানসক্রিয়ার প্রকৃত কলকাঠি লুকিয়ে আছে তার কতগুলি মৌলিক জৈব আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। সে আকাঙ্ক্ষাগুলি প্রবল, স্থূল ও যৌনকেন্দ্রিক। 'সভ্য' মানুষের চেতনায় তাদের প্রকাশ পদে পদে বাধা-কণ্টকিত। তাই মানুষের আদিম অসভ্য প্রকৃতি এবং তার সভ্য সামাজিক মনের দ্বন্দ্ব চলছে। কিন্তু যেহেতু বর্তমান মানুষ সামাজিক জীব, কাজেই আদিম বর্বর আত্মভোগলিপ্সা, অবচেতন মনের অন্ধকার গহ্বরে শৃংখলিত হয়ে মুখ লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়। এবং যেখানেই সেই অন্ধ অবেগের স্বাভাবিক প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়, সেখানেই ঘটে কোন না কোন প্রকার মানসিক বিকার বা উদ্বেগ। মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণালী দ্বারা অসতর্ক মুহূর্তে তারা রোগীর চেতন মানসে ছাড়া পেয়ে বাঁচে। সেই অবরুদ্ধ বিষের রেচনেই ঘটে রোগীর মনের শাপমুক্তি—তার কল্যাণ নিরাময়।

ফ্রয়েড্ একনিষ্ঠ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে—বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও সততার

সঙ্গে শত শত রোগীর অবচেতন মনের স্বরূপটি অনুধাবন করতে চেষ্টা করতে লাগলেন—মনের গভীর থেকে গভীরতর আদিম স্তরের সন্ধান পেতে লাগলেন। এই অনলস পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণের পথেই তিনি অবচেতন মনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হলেন এবং ধীরে ধীরে সেই রাজ্যের নিয়ম ও সূত্র আবিষ্কার করতে লাগলেন। মনোবিজ্ঞানে একটি নূতন অধ্যায়ের যোজনা হোল।

॥ দুই ॥

১৮৯০ সালের কাছাকাছি ফ্রয়েড্ নিজের মনের গভীরে অবগাহন করে তার আবিষ্কারের সত্যতা যাচাই করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরো বহু সহস্র রোগীর মনোবিকলনের ফল সংগ্রহ করে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে মানুষের ব্যক্তিত্বের ভিত্তি রয়েছে, অবচেতন মনের আবেগ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। এর পর থেকে তাঁর সমগ্র জীবন মানব ব্যক্তিত্বের রহস্য পূর্ণতর ভাবে উদ্ঘাটনের চেষ্টাতেই ব্যয়িত হয়েছে। তিনি পরবর্তী কালে লিখেছিলেন, "আমার সমগ্র জীবন ভ'রে এই একটি উদ্দেশ্য অনুসরণ করেছি,—আমি জানতে চেয়েছি মানুষের মনের গঠনটি কি—এর কলকব্জা, কেমন এবং কি কি শক্তি এখানে সমবেতভাবে বা পরস্পরবিরুদ্ধভাবে ক্রিয়া করে।"

১৯০০ সালে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ "The Interpretation of Dreams" প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে ফ্রয়েড্ দেখান যে স্বপ্ন একটা আকস্মিক অদ্ভুত ব্যাপার নয়। স্বপ্নের মধ্যে ছদ্মবেশী কতগুলি প্রতীকের (symbols) সাহায্যে অবচেতন মনের অতৃপ্ত অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে। এ আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই যোনি-কেন্দ্রিক, নগ্ন ও সমাজের প্রচলিত ভদ্র আচার বিরোধী। তাই মানুষের আলোকিত চেতন-মানসে তারা আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু এই সামাজিক মনের প্রহরা ঘুমের মধ্যে শিথিল হয়। সেই সুযোগে সেই অতৃপ্ত নিষিদ্ধ আকাঙ্ক্ষাগুলি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আত্মতৃপ্তির পথ খুঁজে। প্রকাশকালে এ গ্রন্থ জনসাধারণের মধ্যে বা বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ কোন সাড়া জাগায় নি। ফ্রয়েড্ তাতে বিচলিত হলেন না। তাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতিতে অনেক রোগী নিরাময় হচ্ছিল এবং ক্রমশঃ তাঁর চিকিৎসা-

পদ্ধতির আদর বাড়ছিল। ফ্রয়েডের কাছে তাঁর চিকিৎসা প্রণালীর সাফল্যের আনন্দ বড় ছিল না, তার আনন্দ ছিল এ প্রত্যয়ে যে, তিনি যে সত্যের অনুসন্ধান কচ্ছিলেন তাকে তিনি অধিকতর পূর্ণরূপে জানতে পারছেন। নতুন নতুন রোগীর চিকিৎসার মধ্য দিয়ে তিনি নূতনতর তথ্যের সন্ধান পাচ্ছিলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর পুর্বতন মত পরিবর্তনেরও প্রয়োজনীয়তা বোধ কচ্ছিলেন!

১৯০৪ সালে তাঁর "The Psychopathology of Everyday Life" প্রকাশিত হয়। এতে তিনি অবচেতন মনের ক্ষেত্র বিস্তৃততর করে দেখতে পেয়েছেন। তিনি এ গ্রন্থে এ কথা প্রমাণ করলেন যে হঠাৎ অখেয়ালে আমরা একটা ভুল করি, বা অন্যমনস্ক হয়ে ফস্ করে কোন কথা বলে ফেলি, বা কোন ব্যাপার ভুলে যাই, এ সব আকস্মিক নয়, এ সবই আমাদের অবচেতন মনের ক্রিয়া।

এর পরের বছর "Wit and its relation to the Unconscious" এ তিনি অবচেতনার ক্ষেত্রকে আরো বিস্তৃততর করে দেখতে পেয়েছেন। তিনি বললেন আমাদের ঠাট্টা, তামাসা, উপহাস, নিন্দা এ সবের মধ্য দিয়ে ও আমাদের অবচেতন মনের অবরুদ্ধ আবেগ ইঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

আরো দুখানা বইও এ বছর প্রকাশিত হয়। "A case of hysteria"তে তিনি হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি মানসিক রোগের কারণ বিশ্লেষণপদ্ধতি আলোচনা করেন। তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ "Three essays on Sexuality"তে শৈশব থেকে সুরু করে পরিণত বয়স পর্য্যন্ত যৌন-চেতনার বিকাশ ও চেতনমানসে তার বিচিত্র প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এখানেই তিনি প্রথম স্পষ্টভাবে শিশুর জীবনে যৌনবোধের কথা বলেন এবং তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন, মানবজীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে সমস্ত উদ্যম ও প্রচেষ্টার পশ্চাতে যৌনশক্তি ক্রিয়া করছে। এই বই প্রকাশের পর থেকে ফ্রয়েডের খুব দুর্ণাম হয়। ভদ্র সভ্য ব্যক্তিরা বলতে সুরু করেন—ফ্রয়েডের এই 'সর্বব্যাপী যোনি-দর্শন' তাঁর পাপ-মনেরই বিকৃত প্রতিচ্ছবি। অবশ্য ফ্রয়েড্ যৌনতা (Sexuality) কথাটা সাধারণতঃ প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন নি এবং তাঁর সম্বন্ধে দুর্নীতির দুর্ণামটা ভিত্তিহীন। তিনি জীবনের মৌলিক শক্তিকে যোনি-কেন্দ্রিক বলে বিশ্বাস করেছেন, বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে, এখানে অশ্লীলতা বা দুর্নীতির প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। সম্ভবতঃ তাঁর মতবাদের মধ্যে কিছু ভ্রান্তি

ও অতিভাষণ আছে। এ প্রশ্নের বিচারে মতভেদের স্থান আছে, এবং বাস্তবিকপক্ষে এ প্রশ্নে তাঁর অনুগামী দু'জন প্রধান বৈজ্ঞানিক, এ্যাড্‌লার ও য়্যুঙ্গ—তাঁর সঙ্গে একমত না হতে পেরে, ফ্রয়েড়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব স্বাধীন মত প্রচার করেছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েড্‌ ছিলেন প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, তিনি যা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন, নিন্দা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে সত্যে তিনি অটল থাকতেন। এবং তাঁর মতবাদ ক্রমশঃ বিজ্ঞানীদের সমর্থন আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় এবং বর্ত্তমানকালে চিন্তার এমন কোন ক্ষেত্র নাই, যেখানে ফ্রয়েডের মতবাদ প্রভাব বিস্তার করে নি। আমেরিকার প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী G. Stanley Hall সত্যই লিখেছেন—"Despite the frightful handicap of the 'Odium Sexicum', far more formidable today than the 'odium theologicum', involving as it has done for him, lack of academic recognition and even more or less social ostracism, his views have attracted and inspired a brilliant group of minds, not only in psychiatry but also in many other fields, who have altogether given the world of culture more new and pregnant apparatus than those which have come from any other source within the wide domain of humanism."

যাক্‌, ১৯০৯ সালে তাঁর মতবাদের প্রথম উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি আসে। আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌সের অন্তর্গত উরষ্টারে ক্লার্ক বিশ্ববিত্থালয় প্রতিষ্ঠার বিংশ বার্ষিক উৎসবে বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। ইতিপূর্বেই ষ্ট্যানলী হল ফ্রয়েডের অবদান সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর চেষ্টায় আমেরিকায় ফ্রয়েডের মতবাদ প্রসার লাভ করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ফ্রয়েড্‌ আরো বহু সম্মান নানা স্থান থেকে পেতে থাকেন। যুদ্ধের ফলে বহু মানুষ নানা প্রকার মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং ফ্রয়েডের মনোবিকলন পদ্ধতি অনুসরণ করে চিকিৎসায় অনেকে আশ্চর্যভাবে আরোগ্যলাভ করেন। তা'ছাড়া ফ্রয়েডের বহু অনুরাগী ছাত্রদের নানা আলোচনার ফলে ফ্রয়েডের মতবাদ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। নানা দেশেই ফ্রয়েডীয় দর্শন নিয়ে আলোচনা সজোরে চলতে থাকে। Calvin. S, Hall লিখেছেন—"এ সময় মনোবিকলন তত্ত্ব ফ্যাসান হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, সামাজিক আচার, নীতি, শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান—সর্বক্ষেত্রে এ

তত্ত্বের প্রবল প্রভাব অনুভূত হতে থাকে। মনোবিকলন পদ্ধতিতে চিকিৎসিত হওয়াটা 'ফ্যাসানেবল্' বলে বিবেচিত হতে থাকে এবং কথায় বার্ত্তায় যত্রতত্র 'অবচেতন মন', 'অবদমিত আকাঙ্ক্ষা', 'অবচেতন মানসের বাধা', 'জটিল গ্রন্থি', 'অবরুদ্ধতা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে।

মনোবিকলন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহের পশ্চাতে ছিল এ মতবাদের সঙ্গে যৌনতার নিবিড় সম্বন্ধ। এর ফল হল: ফ্রয়েডের দর্শন সম্বন্ধে এমন অনেক কথা প্রচলিত হতে থাকল—যা ভ্রান্ত। এবং তাঁর মতবাদ ভাল করে না বুঝেই তাঁর সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনাও হতে থাকল প্রচুর। বাস্তবিকপক্ষে এ কথা সত্য যে, "One is dismayed by the prevalence of criticism based upon incomplete understanding. Freud seems to have suffered more in this respect than anyother major thinker of our times. His theories have been so widely misrepresented and distorted that it is almost impossible for the unsuspecting reader to separate fact from falsification."

ফ্রয়েড্ কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে সর্বদাই লিখতেন। এমন বছর প্রায় যেতই না, যখন তিনি একখানা নতুন বই বা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন নি। বর্তমানে তাঁর সব লেখা সংগ্রহ করে একটি আদর্শ ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে এবং তা চব্বিশ খণ্ডে সমাপ্ত হবে। তাঁর লেখা অত্যন্ত সরল এবং ভাষার উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। বৈজ্ঞানিক লেখকদের মধ্যে এমন স্বচ্ছতা ও সহজবোধ্যতা কমই দেখা যায়।

ফ্রয়েড্ কখনো মনে করতেন না যে তাঁর আলোচনার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তিনি পৌছেছেন। তিনি তাঁর পরীক্ষা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে সর্বদাই নতুন তথ্য সংগ্রহ করতেন এবং সত্তর বছর বয়সেও তাঁর মনের এমন নমনীয়তা ও সরলতা ছিল যে, তখনও তাঁর অনেক পূর্বের মতবাদ তিনি গুরুতর পরিবর্তন করেছেন, বর্জন করেছেন বা পরিবর্ধন করেছেন। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন জ্ঞানতপস্বী, তাঁর একমাত্র উপাস্য ছিল 'সত্য', এবং একমাত্র বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা এ সত্যকে লাভ করাকেই একমাত্র পন্থা বলে তিনি স্বীকার করতেন।

ফ্রয়েড্ চিকিৎসক ছিলেন—তিনি মানসিক রোগ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান পরিচয়, তিনি বৈজ্ঞানিক। কোন্ বিজ্ঞানে তাঁর

বিশেষ রুচি এ বিষয়ে ১৮৯০ সালে তিনি এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, 'সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে মনোবিজ্ঞানই আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে।' যদিও 'মনোবিকলন'-রূপ নতুন পদ্ধতির আবিষ্কারেই তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ লাভ করেছেন, তথাপি এই মনোবিকলনকে তিনি আলাদা শাস্ত্র বলে মনে করেননি। ১৯২৭ সালে তিনি লিখেছিলেন, 'মনোবিকলন মনোবিজ্ঞানেরই অন্তর্গত। এটা শুধু প্রাচীন চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান নয় বা মনের রোগের বিজ্ঞানমাত্রই নয়। এটা সাধারণ মনোবিজ্ঞানেরই অচ্ছেদ্য অংশ। অবশ্য এটাই সমগ্র মনোবিজ্ঞান নয়, তবে এটা মনোবিজ্ঞানের মূল কাঠামো বা সম্পূর্ণ ভিত্তি বলা চলে।' অর্থাৎ ফ্রয়েডের নিজের মতে মনোবিকলন শুধু মনের বিকার চিকিৎসার একটা উৎকৃষ্ট পদ্ধতিমাত্রই নয়, এর প্রধান মূল্য মানবব্যক্তিত্বের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে এ একটি নতুন আবিষ্কার।

কিন্তু ফ্রয়েড্ শুধু সঙ্কীর্ণ অর্থে বৈজ্ঞানিক মাত্র ন'ন। তিনি দিয়েছেন মানব সম্বন্ধে একটি সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী—জার্মান ভাষায় যাকে বলা হয় 'Weltanschauung'। তাই তিনি দার্শনিক। ফ্রয়েড্-দর্শনের মূলভিত্তি হচ্ছে বিজ্ঞান। সাধারণ দার্শনিকের মত তিনি আত্মার স্বরূপ, ভগবানের বিভাব ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন নি। যা পরীক্ষা নিরীক্ষার নিকষে প্রমাণিত হয় না ফ্রয়েডের কাছে তা মূল্যহীন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী মানবিক (humanitarian) ও সমাজকল্যাণমূলক (conducive to social welfare)।

তবে মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর ও নির্ভুল জ্ঞান তাঁকে নৈরাশ্যবাদী ও মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুৎসাহী করেছিল। তিনি তাঁর ভূয়োদর্শনের ফলে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মানব-প্রকৃতিতে যুক্তিহীন আবেগই প্রবলতর শক্তি, যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার দিয়ে তার জীবনের সামান্য অংশই প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়। মানুষ তার মোহ, তার কুসংস্কার, নির্বুদ্ধিতা আঁকড়ে ধরে অন্ধের মত চলতেই ভালবাসে। অল্প কয়েকজন অসমসাহসীই চোখ খুলে বুদ্ধির আলোকিত পথে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁরা এ পৃথিবীতে সুখে থাকতে পারেন না। সমাজ ও মানুষের এই নির্বুদ্ধিতা, কুসংস্কার ও অন্ধ আবেগের প্রতিফলন মাত্র। কাজেই বুদ্ধির পথে সমাজের সংস্কার সহজ নয়। মানুষ ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর নিরাশাবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার দুটি গ্রন্থে—'The Future of an illusion' ও 'Civilization and its discontents'। কিন্তু বুদ্ধির পথে ছাড়া মুক্তি নেই। তাই বিষম দায়িত্ব রয়েছে পিতা, মাতা ও শিক্ষকের

উপরে। মনোবিজ্ঞানের নতুন আলোকে সন্তানপালন ও তার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে, তাদের নিজেদের মনের কুসংস্কার ও অন্ধকারের ক্লেদ অপসারণ করতে হবে। এ পথ সহজ নয়—কিন্তু এ ছাড়া ব্যক্তি ও সমাজের উদ্ধারের অন্য কোন পন্থা নাই। প্রাচীন উপনিষদের বাণী—'আত্মানাং বিদ্ধি'ই মানুষের মুক্তির মূলমন্ত্র।*

ফ্রয়েড্ প্রসঙ্গ—ব্যক্তিমানসের ত্রিতল

ফ্রয়েড্ তাঁর প্রথম যৌবনে জীবিকার দায়ে মানসিক রোগের চিকিৎসা সুরু করেন এবং তাঁর অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতিতে যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জ্জন করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন খাঁটি বৈজ্ঞানিক—শুধু সফল চিকিৎসাতেই তাঁর তৃপ্তি ছিল না—এই জ্ঞানসাধকের মন কেবলই প্রশ্ন করেছে কেন এমন হয়? বহু বহু রোগীর সংস্পর্শে এসে তিনি নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, আমরা যাকে 'মন' বলি তার পরিধি শুধুমাত্র চেতনমানসক্রিয়ার রাজ্যেই সীমিত নয়, তার আরো অনেক বিস্তার আছে,—আরো তল আছে। এর মূল অল্পচেতন ও অবচেতনের অন্ধকারে আরো বহু নিম্নে—আরো বহুদূরে প্রসারিত। শুধু যে মানসবিকারের ব্যাখ্যা হিসাবেই অবচেতনকে তিনি গ্রহণ করেছেন তা নয়। তিনি বিশ্বাস করেছেন, সুস্থ মন ও বিকৃত মন দুই-ই একই মৌলিক সূত্রে গ্রথিত, মনের কলকজা, তার শক্তির ক্রিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে একই নিয়ম মেনে চলে। তাঁর ভূয়োদর্শনের ফলে তিনি জেনেছেন যে—মানুষের ব্যক্তিত্ব বহু কোষবিশিষ্ট একটি জটিল সক্রিয় ঐক্য। মন যেন চীনদেশীয় কৌটার মধ্যে কৌটা—তার ভিতরে আবার কৌটার ভেল্কিবাজী!

---

* এ প্রবন্ধ লিখতে যে যে বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে:

(1) Freud—A General Introduction to Psychoanalysis.
(2) Murphy—A Historical Introduction to Modern Psychology.
(3) Hart—The Psychology of Insanity.
(4) C. S. Hall—A Primer of Freudian Psychology.
(5) Flugel—A Hundred years of Psychology.

মনের তিন স্তর

ফ্রয়েড্ ব্যক্তিমানসের তিনটি প্রধান স্তর বা কোষের উল্লেখ করেছেন, তাদের নাম দিয়েছেন: 'ঈদ্', 'ঈগো' ও 'সুপার ঈগো'। মানসিক সুস্থ মানুষে এই তিনটি স্তরই বিরোধহীন সক্রিয় সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ। সুস্থ মানুষ তার পরিবেশের সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং সফলভাবে পরিবেশের সঙ্গে আদানপ্রদান করতে সক্ষম হয়। এই আদানপ্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের তৃপ্তি। যখন ব্যক্তিমানসের এই তিন স্তরের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ঘটে তখন ব্যক্তি নিজের সঙ্গে ও পরিবেশের সঙ্গে নানা বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এবং তার ফলে ঘটে অতৃপ্তি ও অশান্তি। এতে জীবনে সাফল্যের পথে বাধা সৃষ্টি হয়।

প্রথম স্তর—ঈদ্—Id

এ স্তর হচ্ছে সকলের চেয়ে মৌলিক, এ হচ্ছে জীবের আদিমতম প্রবৃত্তি ও শক্তির উৎসমূল। এর কাজ হচ্ছে ভিতর ও বাইরের নানা উত্তেজনার দ্বারা যে বেগ সৃষ্টি হয় তার তৎক্ষণাৎ প্রকাশের পথ করে দেওয়া। জীবনের মৌলিক দাবী হচ্ছে প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি। এটি হচ্ছে ব্যক্তিমানসের আদুরে দুলাল, এ কেবল বলে, 'চাই'। ফ্রএড্ তাই বিবেচনাহীন অন্ধ আদিম শক্তিকে বলেছেন—'প্লেজার প্রিন্সিপল্'। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে: উত্তেজনার ফলে যে অস্বস্তি সৃষ্টি হয়েছে তার অপসারণের পথ করে দেওয়া অথবা তা যথাসম্ভব কমিয়ে (tension reduction) একটা শান্ত অবস্থার সৃষ্টি করা। 'প্লেজার প্রিন্সিপল্'-এর কাজ হচ্ছে—অস্বস্তি বা বেদনা দূরীকরণ ও সুখপ্রাপ্তি। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে—এটি হচ্ছে জীবজগতের সবচেয়ে মৌলিক শক্তি।

প্রাণীজীবনে এর সহজতম প্রকাশ হচ্ছে, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া-ব্যবস্থায় (Reflex mechanism)—যেমন: কড়া আলো হঠাৎ চোখের রেটিনার উপর পড়ে অস্বস্তির সৃষ্টি হোল, আর তৎক্ষণাৎ চোখের পাতা বুঁজে গিয়ে রেটিনাকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাল—অস্বস্তির অবসান হোল। দেহের বাইরের ও ভেতরের নানা চাপ কমাবার হাজারো ব্যবস্থা রয়েছে প্রাণীদেহে।

যদি সমস্ত চাপ এমনি সহজভাবে নিঃশেষে কমাবার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকত জীবদেহে, তবে কিন্তু চেতনা, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি জটিল মানসিক ক্রিয়ার বিকাশই ঘটতো না। জীবের দেহে যে নানা অস্বস্তি সৃষ্টি হয় তা নিঃশেষে

ঝেড়ে ফেলবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। অনভ্যস্ত নাকে নস্যি ঢুকেছে, হেঁচে কেশে দেহ সে অবাঞ্ছিত উত্তেজনার কারণটি ঝেড়ে ফেলে দেয়, কিন্তু ক্ষিধে পেলে পেটের ভেতরের নাড়ি মোচড়াতে থাকে—দারুণ অস্বস্তির সৃষ্টি হয়—কিন্তু তার অবসানের উপায় দেহের ভেতরেই নেই—তখন বাইরে থেকে খাদ্যের জোগান দিতে হয়। অবশ্য দেহের নিজেরও কিছুটা ক্ষমতা আছে ক্ষুধার সময় নাড়ির মোচড় কিছুক্ষণের জন্যে থামিয়ে রাখবার; দারুণ ক্ষুধার পর উপযুক্ত সময়ে খাদ্য না পেলে ক্ষুধা মরে যায়, দেহের উপাদানগুলি ক্ষরিত হয়ে কিছুক্ষণের জন্যে বিপদ বা অস্বস্তি ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু অবশেষে হার মানতেই হয়, খাদ্য ছাড়া দেহের মৃত্যু অনিবার্য।

ক্ষুধা দ্বারা দেহের যে যন্ত্রণা হয় তা দূর করতে হলে খাদ্য চাই। শিশুর পক্ষে এ খাদ্য মাতা বা পিতা সংগ্রহ করে দেন, কিন্তু অনেক সময় শিশুর দেহ ঠিক যে খাদ্যটি, যেভাবে, যে পরিমাণে আকাঙ্ক্ষা করছে—মাতাপিতার শত সতর্কতা সত্ত্বেও তা ঠিক ঠিক পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাই কিছুটা অতৃপ্তি তার হয়তো থেকেই যায় এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে খাদ্য শিশু চাইছে, তা না দিয়ে অন্য খাদ্য অন্যভাবে বা পরিমাণে জোর করে দিলে তাতে নতুন অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। এর থেকে 'ঈদে'র মানসিকতার দিকে বিকাশ বা পরিবর্তন সুরু হয়।

আমাদের দেহের একদিকে আছে ইন্দ্রিয়াদি; এরা জ্ঞান আহরণ করে, আর অন্যদিকে আছে পেশীসমূহ; এরা কাজ করে। তাৎক্ষণিক-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা স্নায়ুমণ্ডলীয় একটি সহজ পথ ধরে, পেশী পরিচালক কেন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করে, দেহের অভ্যন্তরে যে চাপ সৃষ্টি হয়—তার বহিঃপ্রকাশের পথ করে দেয়। এ সব ক্ষেত্রে বুদ্ধি বিবেচনার উচ্চ স্নায়বিক কেন্দ্রগুলি নিষ্ক্রিয়ই থাকে। যদি তাৎক্ষণিক-প্রতিক্রিয়ার (reflex) দ্বারাই দেহের সব অস্বস্তি দূর হয়ে যেত, তবে মানসিকতার আর কোন বিকাশ ঘটতো না। কিন্তু পূর্বেই বলেছি—দেহের সমস্ত অস্বস্তি এই সহজ উপায়ে নিঃশেষে দূর হয়ে যায় না। তাই জীবমানসে 'ঈদ' এর যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে ফ্রয়েড্ বলেছেন 'প্রাথমিক প্রক্রিয়া (primary process)'। এটি কি, তা বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

শিশু যখন খাদ্য গ্রহণ করে তখন খাদ্যের গুণাগুণ সে লক্ষ্য করে। অভিজ্ঞতার ফলে যা ছিল বিচ্ছিন্ন সংবেদন (unrelated sensations) তা সুসংবদ্ধ প্রত্যক্ষে (perception) পরিণত হয়। পুনঃ পুনঃ খাদ্য ও তার প্রত্যক্ষ (perception of the food) একত্র শিশুর অভিজ্ঞতায়

উপস্থিত হয় বলে, এই দুই-ই তার কাছে সমার্থবাচক হয়ে যায়। আবার খাদ্য যেখানে উপস্থিত থাকে না, তার কল্প (image) সেখানে প্রত্যক্ষের স্থান অধিকার করে। শিশু ক্ষুধার্ত, কিন্তু খাদ্য তার সামনে উপস্থিত নেই, তার দেহাভ্যন্তরস্থ অস্বস্তি সহজ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার পথে পরিতৃপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এখানে শিশু তাই খাদ্যের ছবি বা কল্প (image) দিয়ে তৃপ্তির পথ খুঁজবে। একে ফ্রয়েড বলেছেন 'প্রাইমারী প্রসেস্' বা 'আইডেন্টিটি অব্ পারসেপ্‌স্যান্ (Identity of perception)'। শিশু একটি বল নিয়ে খেলছে—হঠাৎ এক বড় ছেলে এসে বলটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। শিশু তার অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্তির পথ খুঁজবে বলের স্মৃতিতে, বলের কল্পনায়। এ জন্যেই আমরা দেখি, শিশুর জীবনে কল্পনা অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকে। রাত্রে ঘুমের মধ্যেও এই ইচ্ছাপূরণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে,—স্বপ্নে। যে ছেলে পেটভরে খেতে পেল না, সে স্বপ্ন দেখল বিরাট ভোজের; পূজোর সময় অন্য মেয়েরা রঙীন জামা পরেছে, গরীব ঘরের মেয়ে নতুন জামা পায় নি, সে তাই রাত্রে স্বপ্ন দেখল, হাজারো সিল্কের জামা ফ'লে আছে তার উঠানের আমগাছে। যে কল্পনা দেহের অভ্যন্তরের অস্বস্তি কমায়, তাই ইচ্ছাপূরণ (wish fulfilment)। এখানেই আমরা ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্বের মূল কথাটি পাই। এমনি করেই, যা ছিল সহজ তাৎক্ষণিক-প্রতিক্রিয়া তা প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ও কল্পনার উন্নততর মানসিক স্তরে পরিণত হোল। কিন্তু কল্পনা বাস্তবের পরিবর্ত হিসাবে কিছুক্ষণের জন্য অস্বস্তি দূরীকরণে সাহায্য করলেও—তা বাস্তবের স্থান পূরণ করতে পারে না। কল্পনার জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের সংঘাত বাধে—প্লেজার প্রিন্সিপল্, রিয়্যালিটি প্রিন্সিপ্‌লের কাছে বাধা পায়, অন্ধ অবুঝ ঈদ্—অধিকতর মানসিকতার আধার 'ঈগো'র পথ করে দেয়। প্রাইমারী প্রসেস্ থেকেই আসে 'সেকেণ্ডারী প্রসেস্'। সে কথা পরে আলোচনা করব।

ঈদ্ হচ্ছে আদিম জৈব প্রবৃত্তি; এ হচ্ছে জন্মগত সংস্কার বা Instinct এর বাসা। ঈদ্ দেহকেন্দ্রিক—বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্ক তার তত ঘনিষ্ঠ নয়। ঈগো বা সুপার ঈগোর তুলনায় ঈদ্ অসংবদ্ধ (unorganized), ঈদের শক্তি সচল এবং সহজেই এ শক্তির নিঃসরণ হতে পারে। তাৎক্ষণিক-প্রতিক্রিয়ার বেলা এটা আমরা দেখতে পাই। সময়ের গতির সঙ্গে বা অভিজ্ঞতার দ্বারা এ আদিম শক্তির পরিবর্তন ঘটে না—কারণ বাহ্যজগৎ ও তার বাধা নিষেধের

দ্বারা এ শক্তি নিয়ন্ত্রিত নয়। যুক্তি ও বিচারের দ্বারা এ শক্তি নিয়ন্ত্রিত নয়। যুক্তি ও বিচারের দ্বারা এ শক্তি প্রভাবিত নয়—নৈতিকতার ভিত্তি এতে অবর্তমান। ছোট শিশুর মত নির্লজ্জ এর আবদার,—এর একমাত্র দাবী—আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি। ঈদের শক্তি যেখানে ব্যাহত হোল না, সেখানে সরাসরি আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটছে। যেখানে তা ঘটে না, সেখানে তা ঈগোর শক্তির শাসনে নিজের সহজ গতি হারায়—সেখানে তার মৌলিক রূপের পরিবর্তন ঘটে।

ঈদ্ হচ্ছে আদিম প্রবৃত্তি—ব্যক্তিমানসের মূলাধার। তাৎক্ষণিক-প্রতিক্রিয়া (Reflexes) এবং সংস্কার (Instinct)ই শুধু সহজাত এবং অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ তা নয়। এমন কি অস্বস্তি দূর করবার জন্যে যেখানে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, ফ্রয়েডের মতে সে সকল কল্পও (image) অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ও অন্তর্জাত (innate and subjective)। তার অর্থ, অভিজ্ঞতার ফলে ক্ষুধা ও খাদ্য মনের মধ্যে কার্য কারণের সূত্রে বাঁধবার আগেই ক্ষুধার্ত শিশুর মনে খাদ্যের ছবি বা কল্পের উদ্রেক হয়। সেটা কি করে সম্ভব হয়? ফ্রয়েডের মতে বহু বহু পূর্ব-পুরুষের পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতায় ক্ষুধা ও খাদ্য একসূত্রে বাঁধা হয়ে গেছে এবং বহুযুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল ঈদে এসে স্থায়ীভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। ব্যক্তির নিজস্ব জীবনেও অবদমনের ফলে নূতন নূতন উপাদান ঈদে সংযুক্ত হয়। এই অবদমন ব্যাপারটা পরে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

জাতির বংশধারার দিক দিয়ে যেমন ঈদ্ আদিম শক্তি, ব্যক্তির জীবনেও এ আদিম। এই মূলের উপর ভিত্তি করেই ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। জীবনের নানা পরিণতি ও জটিল বিকাশ সত্ত্বেও ঈদের মৌলিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটে না। ঈদ্ হচ্ছে আদুরে দুলাল—কোন বাধা, কোন অস্বস্তি সে সহ্য করতে রাজী নয়, যা চাই তার জন্য তার সবুর সয় না। সুখ তার একমাত্র কাম্য, সে অসামাজিক, অযৌক্তিক, খামখেয়ালী। ঈদ্ সর্বশক্তিমান, কারণ কল্পনার সাহায্যে সমস্ত ইচ্ছাপূরণ তার পক্ষে সম্ভবপর। সীমাহীন সাগরসদৃশ এর ব্যাপ্তি, এমন কিছু নেই যা এর মধ্যে নেই। নিজের বাইরে অন্য কোন শাসন মেনে নিতে সে অক্ষম। তার মূলমন্ত্র—দুঃখ বর্জন ও সুখ আহরণ।

ব্যক্তিমানসের এই অংশ সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময়—একে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায় না। যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বা সামাজিক শাসনের চোখরাঙানি দিয়ে এর শক্তিকে স্থায়ীভাবে রুদ্ধ করা যায় না। ব্যক্তিমানসরূপ অতল

সমুদ্রের গর্ভে ঈদ্ দুর্বার বাড়বানল। প্রচণ্ড নির্মম এর শক্তি; সাময়িকভাবে এর আপাতবশীকরণ আমাদের ভুল ধারণা জন্মায় যে, একে জয় করা চলে। ব্যক্তির অহং মানস বা সমাজের শাসনের সামনে সে আপাত-নতি স্বীকার ক'রে, মনের গভীরতা অবচেতনায় আত্মগোপন ক'রে, প্রতিশোধের অপেক্ষা করে। মানবের সমগ্র চরিত্রকে এ মৌলিক অমোঘ শক্তি প্রভাবিত করে। এ অনন্ত-যৌবনা উর্বশী—তপস্যার অহঙ্কারে দৃপ্ত সংযমীকঠোর ঋষির বারে বারে ধ্যানভঙ্গ করে। অপ্রত্যাশিত এর আক্রমণ, নিতান্ত খামখেয়ালী এর প্রকাশ। এই ঈদের অন্ধ তাড়নায় ভদ্র মানুষ নিতান্ত অকারণে পরের বাড়ীর কাচের জানলায় ঢিল মারে—নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামনের ভদ্রমহিলাকে কাদার মধ্যে আছাড় খাইয়ে দেয়, হঠাৎ খুন করে। এই ঈদের চালনায় মানুষ দিবাস্বপ্ন দেখে, "কেবলি স্বপন করিনু বপন, আকাশে।" ঈদ্ চিন্তা করে না, বিচার করে না—সে আকাঙ্ক্ষা করে, আর নির্লজ্জভাবে ইচ্ছাপূরণে প্রবৃত্ত হয়।

দ্বিতীয় স্তর—ঈগো—Ego

ঈদ্ হচ্ছে অন্ধ মূলা প্রকৃতি—সে শুধু বলে 'চাই'। তার ইচ্ছা পূরণের দুটি পথ আছে। এক হচ্ছে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা অস্বস্তি দূরীকরণ, বা কল্পের মাধ্যমে তৃপ্তির সন্ধান। কিন্তু এই দুইয়ের কোন পথেই জীবের সব মৌলিক প্রয়োজন মেটে না। ক্ষুধার তাড়নার জৈব প্রতিক্রিয়া খাদ্য সৃষ্টি করে না—খাদ্যের কল্পনাতেও পেট ভরে না। জীবজগতের আর এক মূল প্রয়োজন, বংশ রক্ষা; এ ক্ষেত্রেও আসঙ্গকামনা বা আসঙ্গকল্পনা—জৈব প্রয়োজন মেটায় না। বরঞ্চ এ কামনাপ্রসূত অসংযত ব্যবহার বহির্জগৎ বা সমাজের নিকট হতে তিরস্কার বা শাস্তিই লাভ করে। কাজেই এ সব মৌলিক আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিলাভের পক্ষে প্রয়োজন বহির্জগতের সঙ্গে (external reality) বোঝাপড়া। হয় বহির্জগতের বশ্যতা মানতে হবে, অথবা তাকে জয় করতে হবে। ঈদের অন্ধ শক্তির দ্বারা তা সম্ভব নয়। এবং এই জন্যেই ব্যক্তিমানসের উচ্চতর স্তর ঈগো (ego)র উদ্ভব। ঈদ্‌কে বলা হয়েছিল, Pleasure principle, ঈগোকে তাই বলা যায়, Reality principle.

অহং বা ঈগোকে তুলনা করা যেতে পারে সমগ্র ব্যক্তিমানসের সেক্রেটারী ও লিয়াজোঁ অফিসারের (liason officer) সঙ্গে। ব্যক্তির স্বার্থে ঈদ্ ও

সুপার ঈগোর (সামাজিক বিবেকবুদ্ধি) নিয়ন্ত্রণ, 'অহং'-এর কাজ। ব্যক্তির হাজারো প্রয়োজন যাতে সুসমঞ্জসভাবে মেটানো যায়, যাতে বহির্জগতের সঙ্গে ও সমাজজীবনের সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্য ঘটে ঈগো সে চেষ্টায় সতত চেষ্টিত। যেখানে এ সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব হয়েছে সেখানেই সুসম ব্যক্তিত্ব (**integrated personality**), যেখানে ঈগো ঈদের অন্ধ অযৌক্তিক দাবীর কাছে আত্মসমর্পণ করে অথবা সামাজিক মতামতকে অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়ে অহংকে পদে পদে ক্ষুণ্ণ করে, সেখানে বিরোধ, অসামঞ্জস্য ও অশান্তি অনিবার্য।

ঈদ্-এর মত অহং অন্ধআবেগচালিত নয়। সে বহির্জগতের বাধাকে স্বীকার করে। কাজেই সে জানে, চাইলেই পাওয়া যায় না। তার হাতিয়ার তাই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নয়। সে অপেক্ষা করে, বিচার করে, কখন কোন্ অবস্থায়, কতটুকু আকাঙ্ক্ষার পূরণ হতে পারে, তার হিসাব করে। যেমন, শিশু একটু বড় হলেই বোঝে যে, ক্ষুধা পেলেই যে কোন দ্রব্য হাতের কাছে আসে তাই মুখে পুরে দিলে ঠকতে হয়, ভুগতে হয়। তাকে জানতে হয়, কোন্‌টা খাদ্য নয়, তাকে বুঝতে হয় কোথায় বা কখন উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া যাবে। কাজেই ঈগোকে শিখতে হয় কিছুটা পরিমাণ অস্বস্তি বা অসুবিধা সহ্য করতে। অবশ্য এখানেও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—অস্বস্তি দূরীকরণ এবং আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি। কিন্তু তা বিচার বুদ্ধি চালিত।

অহং অন্ধ আবেগ চালিত নয় বলেই, ব্যক্তির চেতনমানসে উচ্চতর স্তরের বিকাশ প্রয়োজন। একে ফ্রয়েড্ বলেছেন, সেকেণ্ডারী প্রসেস (**Secondary process**)। ঈদের প্রাইমারী প্রসেস্-এর কথা পূর্বপ্রবন্ধে বলেছি। যেখানে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার পথে ইচ্ছাপূরণ হয় না, সেখানে ঈপ্সিত দ্রব্যের কল্পের সাহায্যে অতৃপ্তির অবসান খোঁজা হয়। কিন্তু সে হচ্ছে দুধের সাধ ঘোলে মেটানো। ঈগো বা অহং অত কাঁচা ছেলে নয়। শুধু কল্পনায় সে আকাঙ্ক্ষা পূরণে রাজী নয়। তাই প্রয়োজনের তাগিদে উচ্চতর চেতনার উদ্ভব হয়। তখন ব্যক্তিকে ভাবতে হয়, চিন্তা করতে হয়, বিচার করতে হয়, আকাঙ্ক্ষাপরিপূরক দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপটি জানবার, কি করে সেটি সংগৃহীত হতে পারে সে সম্বন্ধে কার্যপদ্ধতি বা প্ল্যান স্থির করার কথা। এটি অন্ধভাবে হতে পারে না। বাস্তব জগতের অবস্থা বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী কর্মপদ্ধতি স্থির করা ও অনুসরণ করা অহং-এর দায়িত্ব, এর নাম

'রিয়্যালিটি টেস্টিং (Reality testing)'। প্রথম কর্মপন্থায় ঈপ্সিত দ্রব্য না পাওয়া গেলে আবার নূতন করে বিবেচনা ও পরীক্ষা (hypothesis and experiment) করতে হয়। উপযুক্ত ঈপ্সিত বস্তুটি পাওয়া গেলে তার সম্ভোগের দ্বারা অতৃপ্তির অবসান ঘটে।

প্রাইমারী প্রসেস থেকে সেকেণ্ডারী প্রসেস্ উচ্চতর মানসিক বিকাশের অপেক্ষা রাখে। অবশ্য এ দুটি বিভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন অবস্থা নয়। সেকেণ্ডারী প্রসেস্ কাল্পনিক বা শুধুই মানসিক এবং বাস্তবিক বহির্জগৎ সম্বন্ধে প্রভেদটি স্বীকার করে। সে কল্পনাকে বাস্তব বলে ভুল করে না এবং নিজেকে খেলনা দিয়ে ভোলায় না। স্বভাবতই এ স্তরে উন্নততর প্রত্যক্ষ, বিশ্লেষণ, স্মৃতি, চিন্তা ও সুবিবেচিত কর্মের ক্ষমতা বিকশিত হয়। অতীত অভিজ্ঞতাকে কার্যকরী ভাবে কাজে লাগাবার প্রয়োজনে ভাষার উদ্ভব হয়। পেশী ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ব্যাপকতর, সূক্ষ্মতর, ও অধিকতর সুসমঞ্জস শক্তি সমাবেশের প্রয়োজন হয়। শুধু মাত্র সহজ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার অন্ধতার দ্বারা বাস্তব জগতের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধে সমস্যার সমাধান হতে পারে না। ঈদ্ ও বাস্তব জগতের মধ্যবর্তী জটিল মানস সংস্থানই হচ্ছে অহং বা ঈগো।

কিন্তু ঈগো কি সর্বদাই সচেতন বুদ্ধি চালিত? সর্বদাই কি সে বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করে সাবধানে অগ্রসর হয়? না, সেও মাঝে মাঝে বাস্তব জগতের কঠিন বাধা কল্পনার অবাস্তবতার দ্বারা দূর করতে চায়। যখন ঈপ্সিত দ্রব্য নিজশক্তির অপ্রাচুর্যের জন্য বাস্তবিক আহরণ করা যায় না, তখন সে সুসংবদ্ধ মনোহর স্বপ্নের জাল বুনে তৃপ্তি খোঁজে (Phantasy & day-dream) অবশ্য এখানে অহং এ কথা জানে যে এ তৃপ্তি কাল্পনিক মাত্র, তথাপি কঠিন বাস্তবের হাঁপধরা নিগড় থেকে ব্যক্তি কল্পনায় ছুটি খোঁজে মাঝে মাঝে। এর থেকেই সৃষ্টি হয় কাব্য, উপন্যাস, গল্পের। এরও প্রয়োজন আছে।

যদিও বাস্তব জগতের সঙ্গে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার ফলে অহং-এর বিকাশ ও পরিণতি, তথাপি এর শক্তি ও স্বরূপ বংশধারার দ্বারা নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ এবং এর বিকাশের ধারা স্বাভাবিক পরিপক্কতার (maturation) নিয়ম মেনেই চলে। সমস্ত সুশিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে—মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির সুসম ও সুসম্পূর্ণ বিকাশ, যা একদিকে মৌলিক আদিম কাম (Id) ও অন্যদিকে বাস্তব বহির্জগতের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য বিধান দ্বারাই সম্ভবপর।

তৃতীয় স্তর—সুপার ঈগো—Super Ego

ব্যক্তিত্বের গঠন যেমন বহুলাংশে বহির্জগতের বাস্তবতার দ্বারা প্রভাবিত, তেমনি ইহা গভীরভাবে প্রভাবিত সমাজের নৈতিক বুদ্ধি দ্বারা। ব্যক্তিত্বের গঠনে সমাজমনের এই প্রতিফলনকেই ফ্রয়েড বলেছেন 'সুপার ঈগো' (Super ego)। ব্যক্তিত্বের এই অংশ 'ঈদ্'-এর মত অন্ধ, অবুঝ, খামখেয়ালী নয়, এখানে বিচার আছে, নৈতিক আদর্শের বাধানিষেধ আছে, আদর্শে পৌঁছবার জন্য আগ্রহ আছে।

শিশুর এই নৈতিক জীবনের অনেকখানিই পিতামাতার মতামতের প্রতিফলন। পিতামাতা হলেন সামাজিক রীতিনীতি বিচারের প্রতীক। তাঁরা যা পাপ-পুণ্য বলে বিবেচনা করেন, শিশুও তাই বিশ্বাস করে। তবে নিজ বিচার-বিবেচনার স্থলে শিশু তার পিতামাতার বিচার বুদ্ধিকে স্থান দেয়। এমনি করে শিশু নিজেকে সমাজের মনের সঙ্গে যুক্ত করে। এদিকে যেমন তার অভিজ্ঞতার ফলে সে বহির্জগতের বাধানিষেধকে মেনে নিজ ব্যক্তিত্বকে সংযত করে, তেমনি পিতামাতার নিন্দা-প্রশংসা অনুযায়ী নিজ ইচ্ছাপ্রবৃত্তিকে সংযত করতে অভ্যস্ত হয়। মানব-শিশুকে বহুদিন পিতামাতার উপর নির্ভর করতে হয়, তাই শিশুর মনে সামাজিক মনের ছাপ যথেষ্ট গভীর। 'সুপার ঈগো'র ভিত্তি তাই অদৃঢ় নয়।

'সুপার ঈগো'র দুটি দিক, একটি গঠনাত্মক আর একটি নিষেধাত্মক। প্রথমটিকে ফ্রয়েড বলেছেন 'ঈগো আইডিয়াল' (ego ideal), দ্বিতীয়টিকে বলেছেন 'কন্সেন্স' (conscience)। প্রথমটি হচ্ছে শিশুর মনে পিতামাতা কোন্ ব্যবহার নীতিগতভাবে ভাল (morally good) মনে করেন, সে সম্বন্ধে ধারণা। যে ব্যবহার ভাল, পিতামাতা তা বুঝিয়ে দেন প্রশংসা দ্বারা, পুরস্কার দ্বারা। যেমন, শিশু যখনই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তখনই বাবা-মা তাকে আদর করেন, প্রশংসা করেন, খেলনা কিনে দেন। এতে শিশুর মনে এ ধারণা জন্মে যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ভাল, এটা উচিত। শিশুর মনে এমনি করে 'আদর্শ' নিষ্ঠা সৃষ্টি হয়। এর বিপরীত দিক হচ্ছে শিশুর মনের মধ্যে ধারণা, কোন্ কোন্ ব্যবহার পিতামাতার কাছে অন্যায়। এর নাম বিবেক বা conscience। শিশু দেখে জামাকাপড় নোংরা করলে মা বিরক্ত হন, বাবা বকেন। এর থেকে সে বোঝে, এটা অন্যায় ব্যবহার—এটা খারাপ, এটা নিন্দনীয়। একই নীতিবোধরূপ মুদ্রার দুই পিঠ হচ্ছে 'ঈগো আইডিয়াল' ও 'কন্সেন্স'।

পিতামাতা পুরস্কার-তিরস্কার দিয়ে শিশুর মনের মধ্যে আদর্শ সৃষ্টি করেন ; এ পুরস্কার-তিরস্কার শারীরিকও হতে পারে, মানসিকও হতে পারে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মা আদর করেন, বাবা রঙীন খেলনা কিনে দেন—এটা শারীরিক পুরস্কার ; আর তেমনি জামাকাপড় নোংরা করলে মা বকেন, বাবা মারেন—এও শারীরিক শাস্তি বা তিরস্কার। মানসিক পুরস্কার বা তিরস্কার হচ্ছে বাবা-মা'র প্রশংসা বা বিরক্ত। শিশু বোঝে, যেখানে পুরস্কার বা প্রশংসা পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে আছে ভালবাসা, বাপ মাকে সে নিবিড়তর করে পাচ্ছে। আর যেখানে তিরস্কার শাস্তি, সেখানেই সে বোঝে, পিতা-মাতার ভালবাসা থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে। এতে তার শিশুমন ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়। শিশুর জীবনে এই ভালবাসার মূল্য অপরিসীম, কারণ ভালবাসার বস্তুর সঙ্গে জড়িত তার জীবনের মৌলিক প্রয়োজন। মা ভাল, কারণ মা-ই যুগিয়ে থাকেন শিশুর খাদ্য। যতক্ষণ মা'র ভালবাসা সে পাচ্ছে ততক্ষণ তার খাদ্য সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু মা রাগ করলে সে উদ্বিগ্ন হয়, তার শিশুমন ভীত হয়, তার খাদ্যের জোগান বুঝি বন্ধ হয়ে গেল ! এ দুই-ই তার কাছে সমার্থবাচক। তাই যে শিশুরা মায়ের বুকের দুধ যথেষ্ট পায় না, তাদের পরবর্তী জীবনে মানসিক বিকারের সম্ভাবনা বেশী। মায়ের বুকের দুধ যদি যথেষ্ট না মেলে, তখনই সে মনে করে মায়ের ভালবাসা সে হারাচ্ছে, মা তাকে সরিয়ে দিচ্ছেন (rejectance)।

পিতামাতার যেমন আছে পুরস্কার-তিরস্কারের ক্ষমতা, তেমনি 'সুপার ঈগো'রও আছে সে ক্ষমতা। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে এই ক্ষমতা অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তির ক্রিয়ার দায়িত্ব অহং বা 'ego'-র। 'সুপার ঈগো' এই অহং বা 'ঈগো'কে দায়ী করে কর্মের নৈতিক ফলাফলের জন্যে। 'সুপার ঈগো'র শাস্তি বা পুরস্কারকেই বলি 'ব্যক্তির নিজের কাজের জন্য গর্ব বা অনুশোচনা। শুধু যে কৃতকর্মের জন্যই 'সুপার ঈগো'র তিরস্কার-পুরস্কার মিলে, তা নয়, কোন কাজের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা, তা কার্যে পরিণত না হলেও 'সুপার ঈগো' তার বিচার করে। 'সুপার ঈগো' বা সামাজিক নীতি-বুদ্ধি ব্যক্তির মনের অতন্দ্র প্রহরী। তাই অন্যায় চিন্তা করলেও, পরে অনুশোচনা জাগে। এখানে 'ঈদ্'-এর সঙ্গে 'সুপার ঈগো'র মিল আছে, বাস্তব জগৎ ও চিন্তাজগতের পার্থক্য তাদের কাছে অবর্তমান। অন্যায় কাজ ও অন্যায় চিন্তা, দুই-ই আমাদের সামাজিক বিবেকবুদ্ধির চোখে সমান গর্হিত।

পিতামাতার যেমন দৈহিক বা মানসিক দুই উপায়েই শাস্তি বা পুরস্কার দেবার ক্ষমতা আছে, 'সুপার ঈগো'রও তাই আছে। ভাল কাজ করার পরে 'সুপার ঈগো' যেন খুসী হয়ে বলে "বাহবা, বেশ, বেশ, পুরস্কার স্বরূপ এবার খানাপিনা, ইন্দ্রিয় সম্ভোগের অনুমতি দেওয়া গেল।" আর অন্যায় কাজ করলে 'সুপার ঈগো' যেন চোখ রাঙিয়ে বলে "সমাজবিধি অমান্য করেছ, মনের খচখচি ভোগ কর, দৈহিক শাস্তি ভোগ কর, দুর্ঘটনায় পড়ে বিব্রত হও।" এর থেকেই ফ্রয়েড্ বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, দৈহিক রোগ-ভোগ, দুর্ঘটনা, জিনিস্ হারানো ইত্যাদি আকস্মিক নয়। এর পশ্চাতে কাজ কচ্ছে মানুষের 'সুপার ঈগো'র তাড়না। একটি যুবক প্রথম একটি মেয়ের সঙ্গে অবৈধ যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করার পর নিজের দামী মোটর গাড়ীখানা চালিয়ে বাড়ী ফেরার পথে বিষম দুর্ঘটনায় পতিত হয়—তার গাড়ীখানা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এটি একটি মাত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ফ্রয়েড্ ভূরি ভূরি উদাহরণ পরীক্ষা করে দেখেছেন বাস্তব বা কল্পিত পাপবোধ বহু ক্ষেত্রেই গুরুতর অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা। ফ্রয়েড্ এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন তাঁর বহুজন পঠিত বিখ্যাত 'সাইকোপ্যাথোলজী অব্ এভরি ডে লাইফ' গ্রন্থে। দৈহিক পুরস্কার-তিরস্কার যেমন আছে, তেমনি আছে মানসিক পুরস্কার ও তিরস্কার। ভাল কাজ করলে মনের মধ্যে গর্ববোধ হয়, নিজেকে আরো ভালবাসি। অন্যায় কাজ করলে তেমনি ভোগ করতে হয় বিবেকবৃশ্চিকের দংশন। উদ্দেশ্য সর্বত্রই হচ্ছে, ব্যক্তির কার্যকে সমাজানুগ করা। 'সুপার ঈগো' হচ্ছে ব্যক্তির মনের মধ্যে সমাজের পুলিশী শাসন।

পিতামাতার মতামতই শুধু শিশুর নীতিবোধকে গঠন করে না। গুরুজন, শিক্ষক, ধর্মযাজক, পুরোহিত সকলেই সমাজের প্রতিনিধি—তাঁরাও পিতামাতার মত শিশুর নীতিবুদ্ধিকে, তার 'সুপার ঈগো'কে প্রভাবিত করেন। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই শিশুর মনের উপর প্রথম প্রভাব পিতামাতার, অন্যান্য আর সকলেই পিতামাতারই স্থলবর্তী।

'সুপার ঈগো'র কাজ হচ্ছে মানুষের সেই সমস্ত প্রবল প্রবৃত্তির সংযম যাদের বাধা না দিলে সমাজের নিরাপত্তা বা সংহতি বিঘ্নিত হতে পারে। এই প্রবৃত্তির একটি হচ্ছে যৌনাকাঙ্ক্ষা, আর একটি কলহ। যে শিশু অবাধ্য, বিদ্রোহী বা অতিমাত্রায় সব বিষয়ে কৌতূহলী সে সভ্যসমাজের পক্ষে বিঘ্ন। এমন শিশুকে বলা হয় দুষ্ট বা মন্দ বা 'এঁচড়ে পাকা'। বড়রা যদি যৌনজীবনে

অসংযত হয়, যদি সমাজ ব্যবস্থাকে না মানতে চায়, তাহলে তারাও এই সামাজিক বিচার-কর্তা দ্বারা নিন্দিত হয়। যা বাইরের শাসন, ব্যক্তির ভিতরে 'সুপার ঈগো' তারই প্রতিফলন। এই 'সুপার ঈগো'ই ব্যক্তির আত্ম-সংযমের শক্তি।

'ঈদ্' হচ্ছে জীবজগতে অভিব্যক্তির প্রথম স্তর। এ হচ্ছে ব্যক্তির মৌলিক জৈবশক্তির মানসিক প্রতীক। 'ঈগো' হচ্ছে অভিব্যক্তির দ্বিতীয় স্তর জীবের দেহ ও বাহ্য পরিবেশের পরস্পর সংঘাত ও সহযোগিতার ফল—এর থেকে উদ্ভব উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়া সমূহের। 'সুপার ঈগো' হচ্ছে তৃতীয় স্তর। এ হচ্ছে ব্যক্তির মনে সমাজের আদর্শ ও সংস্কৃতিকে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি।

একথা মনে করা অবশ্য ভুল হবে, যে সত্যই মানুষের মানস—জগতে তিনটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন কক্ষ আছে। সমগ্র ব্যক্তিত্ব একটি অখণ্ড একক সত্তা। কিন্তু এ সত্তা নিষ্ক্রিয় নয়, সদা ক্রিয়াশীল, বিকাশমান। এই ক্রিয়াশীল জীবন্ত ব্যক্তিমানসের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে নাম দেওয়া হয়েছে 'ঈদ্', 'ঈগো', 'সুপার ঈগো'।

প্রথমিক আদিম জৈবশক্তি 'ঈদ্' থেকেই জন্ম হয় বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন 'ঈগো'র আর 'ঈগো'রই সমাজ জীবনের প্রভাবে পরিণতি হচ্ছে বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন 'সুপার ঈগো'তে। মানুষের সমগ্র জীবনব্যাপী চলে এই ত্রিধারার মিলন ও বিরোধ। এই তিন একক অথচ বিভিন্ন শক্তি বা প্রক্রিয়ার মিলন-বিরোধের কাহিনী এর পর আমরা আলোচনা করব।

ফ্রয়েড্ প্রসঙ্গ—ব্যক্তি মানসের কলকব্জা

ঈগোর স্তরে যুক্তিগত চিন্তা জীবের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে অধিকতর সক্ষম হয় বলেই জীবের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ঈদের শক্তি অধিকতর পরিমাণে ঈগোর কাছে হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু বাস্তবজগতে ব্যক্তির সমস্ত ইচ্ছাপূরণ সহজে হয় না। তাই ঈগোর যুক্তিগত জীবন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয় না। যখন বাস্তব জগতের কঠিন বাধার জন্য মৌলিক কোন প্রবল আকাঙ্ক্ষা যুক্তিসঙ্গত উপায়ে পূর্ণ হতে পারে না, তখন ব্যক্তি ঈদের

শিশুসুলভ কল্পনাদ্বারা ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করে। এটি স্বপ্নের মধ্যে সহজে ঘটে কারণ যখন ঈগোর যুক্তি-সঙ্গত চিন্তার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে ব্যক্তি পায় না তখন সে অনেক সময় ইচ্ছাপরিপূরক ভ্রান্ত চিন্তার (autistic বা wishful thinking) আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরা যা চাই, তাই আমরা ভাবতে ভালবাসি। প্রিয়জন বহুদিন ধরে জ্বরে ভুগছে, রোজই গায়ে হাত দিয়ে ভাবি আজ জ্বরটা কম আছে, এবার সেরে উঠবে। অভ্যস্ত সংস্কার ত্যাগ করে (unbiassed) বস্তুগত চিন্তা বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও যথেষ্ট কঠিন, বারে বারেই অবুঝ ঈদ্ ঈগোর বস্তুগত চিন্তায় বাধা জন্মায়। কঠিন অভ্যাস দ্বারা ঈগোকে ঈদের পিছুটান কাটাতে হয়। ঈগো সবল হয়ে যুক্তিগত চিন্তার পথে অভ্যস্ত হ'লে, ব্যক্তি আর তখন ইনসটিংটের দাসত্ব করে না—তখন তার মনোজগতের প্রক্রিয়াগুলিকে প্রত্যক্ষীকরণ, বিশ্লেষণ, প্রভেদবোধ, বিশুদ্ধ চিন্তা ও বিচারের পথে কাজে লাগায়। কোন ব্যক্তি বা জাতি সেই পরিমাণেই উন্নত যে পরিমাণে সে ঈদের দাসত্বমুক্ত হয়ে ঈগোর বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার দ্বারা পরিচালিত। এই ঈগোর বিকাশের পথেই মানুষ অন্য সমস্ত পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। মানুষের উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়াগুলি ঈগোর বিকাশেই মূল্য লাভ করে (ego-cathexis)। তার যুক্তিগত বস্তুনিষ্ঠ জীবনের বিকাশের জন্য অনেক সময় তাকে আকাঙ্ক্ষার অন্ধ অবুঝ আবদারে বাধা দিতে হয়। জীবনী শক্তির অপচয়ের পথে এই যে বাধা ঈগো তার বস্তুনিষ্ঠ জীবের অনুকূলে সৃষ্টি করে, একে বলা হয়—anti-cathexis। Cathexis হচ্ছে—আগ্রহ-অনুরাগ-শক্তির বহির্গমনের পথ খুলে দেওয়া। আর anti-cathexis হচ্ছে, বাধা, শক্তি ব্যবহারের পূর্বে বিচার বিবেচনার দ্বারা তার তৎক্ষণাৎ অনর্থক অপচয় নিবারণ। ঈদের cathexis বা অন্ধ আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করে, ঈগোর anti-cathexis। যেখানে ঈদের cathexis অতি প্রবল হয়ে ঈগোর anti cathexis-এর বাধা অতিক্রম করে, সেখানেই ঘটে আবেগ-প্রধান অযৌক্তিক কর্ম (impulsive action)।

ঈগোর বিকাশের পথে যুক্তি ও বিচারের প্রবণতা অন্য একটা গতিও নিতে পারে। যে দ্রব্য প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তির প্রয়োজন মেটায় না, অথচ গৌণভাবে তার সহায়ক হয়, ঈগোর শক্তি সেদিকেও ব্যয়িত হতে পারে। সভ্যতা বা জীবনের উচ্চস্তরে বিকাশের এও একটা লক্ষণ যে তা শুধু জীবন ধারণের স্থূল প্রয়োজন মেটাবার কাজেই ব্যয়িত হয় না, জীবনের অলংকরণও তার

উদ্দেশ্য। তাই সভ্য মানুষ শুধু খাদ্যান্বেষণের উপায় চিন্তাই করে না, খাদ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয় এমন গৌণ আচারও প্রতিষ্ঠা করে, অনুসরণ করে, উদ্ভাবন করে জীবনকে অধিকতর উপভোগ্য করে তুলবার জন্ত। ঈগোর এই বাড়তি শক্তির জন্তেই মানুষ নানা নতুন রান্নার অনুসন্ধান করে, খাদ্যকে কেন্দ্র করে নানা শোভন সামাজিক রীতি ও আচার গড়ে তোলে। পূর্ববঙ্গে কাসুন্দী তৈরী নানা ধর্মীয় আচরণের সঙ্গে যুক্ত, যেমন জাপানে অতিথিকে চা দ্বারা অভ্যর্থনা একটি সুচারু আর্ট। ঈগোর বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিচালিত জীবন মানুষের মৌলিক সমস্যার সার্থক সমাধানে ক্রমশঃই অধিকতর সফল হয়। অনেক কম পরিশ্রমে অধিকতর খাদ্য সংগ্রহের ও বাসস্থান সংগ্রহের ব্যবস্থা মানুষ আজ করতে পারে, তার কারণ তার বৈজ্ঞানিক চিন্তা ক্রমেই অগ্রসর হয়ে চলেছে। কাজেই সভ্য মানুষের সমস্ত শক্তি শুধু খাওয়া-পরার স্থূল প্রয়োজনেই ব্যয়িত হয় না, তা অন্য নানাদিকে ছড়িয়ে জীবনে নূতন নূতন আগ্রহ ও আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে।

ঈগোর এ বাড়তি শক্তি আর একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয়িত হয়,—সে হচ্ছে, ঈদ্, ঈগো ও সুপার ঈগোর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন। ঈগো এ কাজে যতটা সফল হয় ততই সুস্থ ও সবল ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। যেখানে এই ত্রিশক্তির মধ্যে বিরোধ প্রবল, সেখানেই ব্যক্তিত্ব দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত, অসফল ও অসুখী।

ঈদের শক্তি চপল—বাধাবন্ধন তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সে শক্তি খামখেয়ালী, জেদী, অন্ধ। কিন্তু সে তুলনায় ঈগোর শক্তি সংযত ; চিন্তা, যুক্তি, বিচারের দ্বারা তার গতি নিয়ন্ত্রিত। আবেগের পথে শক্তি অযথা ব্যয় না করে, তা উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়ার বিকাশ, বিচার ও যুক্তির সংযম, বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ও শক্তির সমন্বয় এবং শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে জীবনের বিস্তারে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তিকে অন্ধ প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তির পথ সে করে দেয়, যুক্তি ও বিচারের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা।

উচ্চতর নিয়ন্ত্রণের কাজ—সুপার ঈগো

ব্যক্তির নগ্ন আকাঙ্ক্ষা যেমন জগতের বাস্তবতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি আর একটি উচ্চতর নিয়ন্ত্রণও আছে। সে হচ্ছে সমাজের শাসন, ব্যক্তির মনে যার প্রতিফলন হচ্ছে, নীতি-বোধ। শিশু বাল্যে পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাদের ভালবাসা ও সমর্থন তার জীবনের পক্ষে

একান্ত প্রয়োজন। তাই যে ব্যবহারে পিতামাতা বিরক্ত হন তা আপাতক্লেশকর হলেও শিশু তা মেনে নেয়। পিতামাতার শাস্তি ও প্রশংসা তার স্বাধীন অন্ধ আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে। শাস্তি ও প্রশংসার শক্তি আছে বলেই সামাজিক বুদ্ধি বা সুপার ঈগো শক্তিমান্। যা পিতামাতার মতামত তা শিশু নিজের মতামত বলেই গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়। পিতামাতা সমাজ জীবনের প্রতিভূ। তাঁদের প্রশংসায় মানই শিশুর মনে সৃষ্টি করে আদর্শানুরক্তি বা Ego ideal আর তাঁদের নিন্দার মানই হোল শিশুব মনে বিবেকের তাড়না বা Conscience।

সুপার ঈগোব শক্তি নিষেধাত্মক, তা বাধা দেয। এ শক্তি এক হিসাবে ঈদ্ এর তৎক্ষণাৎ-সুখের আকাঙ্ক্ষা বা pleasure principle এবং ঈগোর সাংসারিক বা বাস্তববুদ্ধি বা reality principle—এ দুয়েরই বিরোধী, দুয়েরই উর্ধ্বে। নীতিগতভাবে যা আদর্শ, তা ব্যক্তিব তীব্র অন্ধ কামনাকে ধিক্কার দেয়। আবার বুদ্ধি বিচারের সংসাবী হিসাবকে সে অগ্রাহ্য করে। ঈগোর বিচার বলে 'এই হয়ে থাকে (this is),' আর সুপার ঈগো আদেশের সুরে বলে, 'এটা হওয়া উচিত (this ought to be)'। ঈদ্ ও সুপার ঈগো দুইই বাস্তব-বিদরাধী।

যে মানুষের মধ্যে সুপার ঈগোর বাধা অতিপ্রবল অর্থাৎ যে মানুষ অতিরিক্ত নীতিবাগীশ, সে মানুষ কোজ কাজ কবতে পারে না। সে কেবলি খুঁৎ খুঁৎ কবে, ভয় করে পাছে সে অন্যায় কিছু করে। ঈগোর বাধা (anticathexis) ও সুপার ঈগোর বাধাব মধ্যে প্রভেদ আছে। ঈগো বলে, "অপেক্ষা কর, আমি হিসেব কবে দেখে নি, কিভাবে কাজ কবলে ঈপ্সীত ফল সব চেয়ে বেশী পবিমাণে, সব চেয়ে কম আয়াসে পাওয়া যেতে পারে।" কিন্তু সুপার ঈগো চোখ রাঙিযে বলে "না, খবরদার!" অর্থাৎ সে কর্ম ও কর্মের চিন্তার পথ রুদ্ধ করে দেয়।

সুপার ঈগোর গঠনাত্মক দিক হচ্ছে—ব্যক্তিগত নৈতিক আদর্শানুরক্তি বা ego-ideal। সে সর্বদা চায় শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্পূর্ণতা (perfection)। পূর্বেই বলেছি পিতামাতার নৈতিক মানই ব্যক্তি তাদাত্ম্যদ্বারা আপন করে নেয়; এই জন্যেই সমাজের ঐক্য বজায় থাকে, ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত থাকে। যে ব্যক্তির অধিকাংশ শক্তি এই ego-ideal-এর পথেই চালিত হয়, তিনি আদর্শবাদী ও উচ্চমনা। তাঁর কাছে সাংসারিক সাফল্যের মূল্যের চেয়ে

নৈতিক আদর্শের মূল্য বেশী। এ ব্যক্তি দৃঢ়চেতা এবং আদর্শের জন্য দুঃখ ও দারিদ্র্য সহ্য করতে প্রস্তুত হন। এমন মানুষের কাছে যুক্তিগত বৈজ্ঞানিক সত্যের (logical truth) চেয়ে অবাস্তব নৈতিক আদর্শ অনেক বেশী সত্য। এঁরা চালাক ও বুদ্ধিমান নন, কিন্তু সমাজের এঁরা নমস্য।

এই আদর্শানুরক্তির মধ্যে ব্যক্তির মস্ত গর্ব ও আনন্দ থাকে। এই হচ্ছে সুপার ঈগোর পুরস্কার। যখন ভাল কাজ করি তখন উৎসাহ দিয়ে বলে "সাবাস্ বেটা।" আর অন্যায় কাজ করলেই অনুভব করি পিতামাতার অর্থাৎ বিবেকেব বা সুপার ঈগোর তিরস্কার—"ছিঃ ছিঃ !"

যখন সৎকাজ করে গর্ব অনুভব করি, তখন নিজেকেই ভালবাসি। এ পরোক্ষ আত্মরতি, Secondary Narcissism এবং আদর্শানুরক্তিতে ব্যক্তি নিজেকে পিতামাতা বা সমাজের সঙ্গে একীভূত করে। কাজেই বোঝা যায় এই তাদাত্ম্যতা প্রক্রিয়া (mechanism of identification) দ্বারাই ঈদের শক্তি ঈগো বা সুপার ঈগোর শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। এক হিসাবে দুই-ই ঈদের মৌলিক উদ্দেশ্যই অর্থাৎ সুখ আহরণ ও দুঃখ বর্জন সাধন কচ্ছে। ঈগোর শক্তি অনেক সময় ইনস্টিংটের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই সচেতনভাবে ব্যবহৃত হয়। তেমনি ঈদ নিজ ইনস্টিংটের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সুপার ঈগোকেও কাজে লাগায়। ঈদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সংগ্রহে শক্তির দ্বারোদ্ঘাটন দ্বারা অস্বস্তি নিবারণ (release of energy and elimination of tension)। সুপার ঈগোর উদ্দেশ্যও মূলতঃ তাই।

ঈগো ও সুপার ঈগো যেমন ঈদ্‌কে বাধা দেয়, ধিক্কার দেয়, ঈদও তেমনি মাঝে মাঝে প্রতিশোধ নেয়। ঈদ্ গোপনে ঈগোর বাস্তব বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, যেমন ঘটে wishful thinking-এর বেলায়। তেমনি সুপার-ঈগোর ঘৃণাকে ঈগোর বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে ঈদ্ তার শক্তি প্রমাণ করে, প্রতিশোধ নেয়। অন্যায় কাজ করে কখনো কখনো ব্যক্তি এত বেশী আত্মগ্লানি ভোগ করে যে সে নিজ দেহকে আহত করে, যেমন কবি সুরদাস তাঁর কামাতুর চক্ষু দুটিকে উৎপাটন করেছিলেন। আবার বিবেকের তাড়নায় মানুষ আত্মহত্যা করেছে এমন উদাহরণও পাওয়া যায়। এখানে ঈদের পীড়নাকাঙ্ক্ষা (instinct of aggression) সুপার ঈগোকে বিকৃত করে ঈগোর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিচ্ছে। ঈদের ষড়যন্ত্রে সুপার ঈগোর বিকৃতির উদাহরণ শুধু আত্মপীড়নে নয় —পরপীড়নেও। অতিরিক্ত সাধু বলে যাঁরা নিজেদের মনে করেন (fanatics)

তাঁরাই অবিশ্বাসী (heretics)-দের পুড়িয়ে মেরেছেন। আদর্শের নামেই হিট্‌লার জার্মানী থেকে ইহুদী উৎখাত করেছিলেন। বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এখনও চলে তথাকথিত শত্রুদের নিশ্চিহ্নীকরণ বা liquidation, দেশ-প্রেমের ছদ্মবেশে।

ঈদ্ ও সুপার ঈগোর এক বিষয়ে মিল আছে—তারা দুই-ই বাস্তববিরোধী। ঈদ্ অন্ধ আবেগচালিত সুতরাং ঈগোর যুক্তিগত বাস্তব চিন্তাব সে বিরোধী। সুপার ঈগোও বাস্তবকে অস্বীকার করে, আদর্শের স্বপ্নরাজ্যে বিহারের প্রয়াসী। ঈদ চায় ঈগোকে নিজের অন্ধ আকাঙ্ক্ষার পথে চালনা করতে। আবার সুপার ঈগোও চায ঈগোকে বাস্তব অস্বীকার করে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করাতে। ঈগোর মস্ত কাজ হচ্ছে এই শক্তির বৈপরীত্যকে একটি সুগম সমন্বয়ে বেঁধে রাখা।

সর্বশেষে আবাবও স্মরণ বাখতে হচ্ছে যে ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন শক্তির যোগফল নয়। ব্যক্তিত্বের সমস্ত শক্তি একই শক্তি। শক্তির বণ্টন ও বিভাগে একেব ভাগে যদি শক্তি বেশী পড়ে, তবে অন্য ভাগে তা কম পড়বে। ঈদ, ঈগো ও সুপাব ঈগোর একটি প্রবল হলে অন্য দুইটি দুর্বল হতে বাধ্য। এক দুর্বল হলে অন্যেরা প্রবল হবে। যে ব্যক্তির ঈদ্ প্রবল সে আবেগপ্রবণ, যুক্তিদ্বারা বা আদর্শ দ্বারা তার জীবন তত বেশী চালিত নয। আবার যার ঈগো বা যুক্তি বিচার প্রবল, সে ঘোব সাংসারিক, বাস্তববাদী, সে আবেগের ধাব কম ধারে, আদর্শের স্বপ্নও সে কম দেখে। আর যাঁর সুপার ঈগো প্রবল, তিনি স্বার্থের আকাঙ্ক্ষাকে ঘৃণা করেন, বাস্তবের বাধাকেও অস্বীকার করেন, তিনি স্বপ্ন দেখেন ও নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু ঈদ্, ঈগো ও সুপার ঈগো পরস্পর সহযোগীও বটে। ব্যক্তিত্ব এই তিনের প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতারই ফল। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বেব লক্ষণ হচ্ছে—সেখানে ঈদ্, ঈগো ও সুপার ঈগো একটি সুসম সমন্বয় খুঁজে পেয়েছে।

ফ্রয়েড্ প্রসঙ্গ—মনোবিকলন—নীর ও ক্ষীর

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় মাসিকপত্রে তাঁহার স্মৃতিকথা লিখিতেছেন। তাহাতে এক সংখ্যায় তিনি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে বিভিন্ন সময়ে যে অবজ্ঞা ও অনাদর পাইয়াছেন তাহা বিবৃত করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি দুঃখ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইস্কুলমাষ্টার বৃত্তির প্রতি সমাজের অবহেলাই ইহার মূল। একজন বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি প্রবন্ধটি পড়িয়া বলিলেন লেখাটি কবির হীনমন্যতার (Inferiority Complex) প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একজন মদ্যপ লম্পট ধনী সন্তান প্রকাশ্যভাবেই প্রচলিত নৈতিকমানকে উপহাস করিয়া বলেন, "অবদমনই (repression) সমস্ত মানসিক বিকৃতির মূল। আমি আমার অন্তর্নিহিত প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করি না—আমি স্বাভাবিক জীবন যাপন করি।"

এক ভদ্রলোক তাঁহার দুই বৎসরের ছেলেকে তাঁহার দামী ঝর্ণাকলমটি টেবিল হইতে মাটিতে ফেলিবার জন্য খুব বকিলেন। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোকের স্ত্রী ঘরে ঢুকিতে খোকা গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা দুত্তু বাবাকে কেতে ফেলবো।' বি এ পাশ বিদুষী স্ত্রী বলিলেন, "দেখছো, ইডীপাস্ কমপ্লেক্স্ (Oedipus Complex)!"

এ উদাহরণগুলি দেওয়ার উদ্দেশ্য, ইহা দেখানো যে আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত মহলে ফ্রয়েডের 'বুলি' ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 'বুলি'ই বলি, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফ্রয়েড্ দর্শন সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ভ্রান্ত। বর্তমানে সাহিত্যে যৌনতা ও অশ্লীলতার যে বন্যা বহিয়া চলিয়াছে তাহার সমর্থনে ইহাই বলা হয় মানুষের মনের পাপের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেই শাপমোচন ঘটিবে। ইহা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন (psychoanalysis)-সম্মত বৈজ্ঞানিক উপায়।

বাস্তবিক পক্ষে সব কয়টি উদাহরণেই ফ্রয়েডীয় চিন্তা সম্পর্কে ভুল ধারণা বর্তমান। 'কম্‌প্লেক্‌স' কথাটি ফ্রয়েড্ অবচেতন মনে জটিলতা, অমীমাংসিত অন্তর্দ্বন্দ্ব (an unresolved conflict in the unconscious) অর্থেই ব্যবহার

করিয়াছেন। ইহা সচেতন মানসের ব্যাপার নয়, যদিও মানুষের সচেতন ব্যবহারে সেই অদৃশ্য অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের চিহ্ন বর্তমান থাকিবে। কবিশেখরের আত্মসম্মান বোধ অন্যের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাঁহার ক্ষোভ তিনি সচেতন ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে জটিলতা বা complex-এর পরিচয় কোথায়? বাবার উপর খোকার রাগের ব্যাখ্যাও অচেতন মনের ভূতকে টানিয়া না আনিয়া সহজেই করা যায়।

ফ্রয়েড্ কখনও একথা বলেন নাই যে সমস্ত কুপ্রবৃত্তির শাসন মানেই অবদমন এবং স্বাভাবিক জীবন মানেই হইল স্বেচ্ছাচারী পাশব জীবন যাপন। বাস্তবিক 'পাশব জীবন যাপন' বলিলে পশুদের অন্যায় নিন্দা করা হয়। পশুরা 'পাশবিক অত্যাচার' করে না। পশুদের প্রবৃত্তি ঋতু অনুযায়ী তাহার দেহস্থিত হর্মোণের (hormones) ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাহারাও কিছু সামাজিক শাসন মানে। শিশু প্রকৃতির দ্বারা চালিত নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু মানুষই কেবলমাত্র প্রকৃতিকে নিজ ভোগের জন্য সচেতন ভাবে ব্যবহার করে। ফ্রয়েড্ জীবনের যৌন প্রবৃত্তিকেই 'কাম' (Sex) আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে কামপ্রবৃত্তির 'অসংযত চরিতার্থতাই স্বাভাবিক জীবন যাপন, এমন অদ্ভুত কথা ফ্রয়েড্ বলেন নাই। তিনি বরং বলিয়াছেন মানুষের আদিমকাম আকাঙ্ক্ষা বা Id বহির্জগতের বিধিনিষেধ বা Ego এবং সমাজ জীবনের সুস্থ শাসনের বা Super Egoর সঙ্গত সুসমন্বয় স্থাপন করিবে, ইহার জন্যই মানুষের বুদ্ধি ও নীতি জ্ঞানের উদ্ভব। এই সমন্বয় স্থাপনেই স্বাভাবিক সুস্থ জীবন সম্ভব। মানুষ নিজ বুদ্ধি ও বিচার দ্বারা নিজ প্রবৃত্তির স্বরূপ নির্ধারণ করিবে, আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা নিজ ত্রুটি সংশোধন করিয়া শান্ত ও শুদ্ধ হইবে এই প্রাচীন উপদেশ ফ্রয়েড্ অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অস্বীকার করেন নাই। তবে ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন মনোবিকলনে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা আমাদের অবচেতন মনে বিশৃঙ্খলা ও অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের স্বরূপটি প্রকট বলিয়া সেই দ্বন্দ্বের সমন্বয় ও মীমাংসায় সহায়তা করেন। ব্যক্তি অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া আত্মজয়ী হয়। অন্ধপ্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া কখনও ব্যক্তি সুস্থ হইতে পাবে না।

ফ্রয়েডীয় দর্শনে তিনটি কথার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। (১) মানসিক বিকার, উন্মত্ততা (insanity) হইতে সুরু করিয়া স্বপ্ন (dreams) কল্পন' (phantasy) মিথ্যা ভয় (unreasonable fear), হঠাৎ বিস্মৃতি (lapses of memory), কথা বলায় বা লেখায় হঠাৎ কোন শব্দ পড়িয়া যাওয়া (slips of

the pen or the tongue), কাহারও উপর অকারণ ক্রোধ বা বিতৃষ্ণা ইত্যাদি নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু সমস্ত মানসিক বিকারের পশ্চাতে থাকে তীব্র কোন আবেগ বা আকাঙ্ক্ষার অবদমন (repression)। (২) এই অবদমনের কারণ যে অবদমিত আবেগ বা আকাঙ্ক্ষাটি কামমূলক (sexual) এবং অসামাজিক। (৩) শিশুর জীবনেই এই দ্বন্দ্ব ও অবদমন ঘটে। "The importance of repression, the importance of sex desire (libido), and the importance of the infantile period are Freud's three main emphases. His is a theory of dreams and lapses but particularly of the neuroses. A neurosis originates in repressed infantile sexuality, this is his main proposition (Woodworth : Contemporary Schools of Psychology. P. 150)

শৈশবের কোন তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা আবেগ স্বাভাবিক পরিণতি বা প্রকাশের পথ না পাইলে অবচেতন মনে অস্বস্তি বা দ্বন্দ্ব (tension) সৃষ্টি করে। শিশু মা বাবার আদর সোহাগ চায়, চুমু খাইতে ভালবাসে, কোলে উঠিলে খুসী হয়, এ সবই আদিম জৈব কাম (libido)। পূর্বেই বলা হইয়াছে ফ্রয়েড্ কাম বা Sex কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা শিশুকে সহজে আকর্ষণ করে, যাহাতে সে স্বভাবতঃই আনন্দ পায়, তাহাই কাম। এই জন্যই তিনি ইহাকে pleasure principleও বলিয়াছেন। শিশু পিতামাতার আদর সোহাগ (চুমু খাওয়া, বুকে জড়াইয়া ধরা, কোলে ওঠা) ইত্যাদি তো ভালবাসেই। ইহার মধ্যে যৌন তৃপ্তি আছে তাহা বুঝা কঠিন নয়। কিন্তু শিশু চুলিতে ভালবাসে, আঙ্গুল চুষিতে ভালবাসে, কামড়াইতে ভালবাসে, গাল চাটিয়া দিতে ভালবাসে (ইহাও তাহার ভালবাসা ও আদর প্রকাশের লক্ষণ), অন্য শিশু বা কুকুর বিড়ালকে চটকাইতে ভালবাসে। ইহাও যৌনতার স্বাভাবিক, কিন্তু প্রচ্ছন্ন প্রকাশ। এমন কি মলত্যাগ করা, প্রস্রাব করা, ময়লা ঘাঁটা, ফ্রয়েডের মতে এসব ক্রিয়ায় যে শিশুর স্বাভাবিক আনন্দ তাহাও মূলতঃ যৌন আকাঙ্ক্ষারই তৃপ্তি। শিশু যখন ক্রমে বড় হইতে থাকে, তাহার বৃদ্ধি ও বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এসব বিভিন্ন ক্রিয়া এক এক সময় শিশুকে বিশেষ তৃপ্তি দেয়। এ জন্য ফ্রয়েড্ শিশুর যৌন জীবনকে oral stage, anal stage ইত্যাদি স্তরে ভাগ করিয়াছেন। কিন্তু শিশুর এই স্বাভাবিক কামাকাঙ্ক্ষা অনেক সময় সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে

পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। যদি শিশু শৈশবেই পিতামাতা হারায় তাহা হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির পথে অনেক বাধা ঘটে। এমন কি পিতামাতা জীবিত থাকিলেও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব থাকিলে শিশু অনাদৃত হয়। সে নিজেকে অসহায় ও বঞ্চিত মনে করে। তাহার অবচেতন মনে একটা অজানা দুশ্চিন্তা ও ভয়ের কালো ছায়া নামিয়া তাহার সুস্থ আনন্দময় বিকাশের পথে বাধা জন্মায়। আবার বর্তমানে কর্মব্যস্ত কৃত্রিম সভ্য জগতে অনেক পিতামাতা (যাহাদের অর্থ-সামর্থ্য আছে) সন্তান লালন পালনের অনেকটা ভার আয়া, গভর্ণেস্ নার্সারী স্কুলের উপর দিয়া নিজেরা জীবনের আনন্দ সম্পূর্ণতরভাবে উপভোগ করিতে চান। এ সব ক্ষেত্রেই শিশুর অনুভূতি-জীবন অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। মা বাবার নিঃস্বার্থ স্বাভাবিক ভালবাসার কোন পরিবর্ত (substitute) নাই। অনেক সময় এসব পিতামাতা বঞ্চিত শিশুকে দামী পোশাক, খেলনা দিয়া এবং অল্প কিছুক্ষণের জন্য অতিরিক্ত আদর দিয়া ক্ষতিপূরণ করিতে চেষ্টা করেন। বাস্তবিকপক্ষে ইহা তাহাদের অপরাধী বিবেকের (guilty conscience) মূঢ় আর্তনাদ। শিশুর কাছে এ ফাঁকি টিকে না। তাহার মনের অব-চেতনায় অভিমান ও বিদ্বেষ জমিয়া উঠিতে থাকে। অথচ এ বিদ্বেষ প্রকাশের সহজ পথও তাহার কাছে খোলা নাই। তাই সে নিজেকে অবাঞ্ছিত (sense of rejection) ও বিপন্ন (sense of insecurity) মনে করে। আরো নানাভাবে তাহার জীবনের সুস্থ বিকাশ সভ্যতার খাতিরে বাধাগ্রস্ত হয়। শিশু নিজের দেহ সঞ্চালন করিতে এবং বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করিতে ভালবাসে। শারীরিক বিকাশের একটা স্তরে প্রত্যেক শিশুই প্রস্রাব, মলত্যাগ ইত্যাদি ব্যাপারে কৌতূহলী হইয়া ওঠে, সে নিজ লিঙ্গ স্পর্শ করিতেও উৎসাহ প্রকাশ করে। কিন্তু সভ্য বাপ-মায়ের কাছে এ জিনিসগুলি অত্যন্ত নোংরা এবং এ বিষয়ে তাহাদের নিষেধ এবং শাসনও অতিরিক্ত মাত্রায় কঠোর। ফলে শৈশব হইতেই যৌনজীবন সম্বন্ধে তাহাদের অবচেতন মনে অকারণ ভয় ও ঘৃণা জন্মে, অথচ এ বিষয়ে স্বাভাবিক কৌতূহল রুদ্ধ হওয়াতে তাহা তীব্রতর হয় এবং একটা অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। তাহার মনের অবচেতনায় যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তাহা উত্তর জীবনে পাপবোধ (sense of guilt) ও দুশ্চিন্তা (moral anxiety) সৃষ্টি করিয়া তাহাকে অসুখী করে। শিশুর স্বাভাবিক যৌন আকাঙ্ক্ষা সামাজিক মন দ্বারা বিকৃত হওয়াতে শিশু এ আকাঙ্ক্ষা-

গুলিকে চেতনমানস হইতে অপসারণ করিয়া তাহাদের উপর বিস্মৃতির আবরণ টানিয়া দেয়। ইহারই নাম অবদমন (repression)। এই অবদমন ফ্রয়েডের মতে শৈশবেরই একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু ফ্রয়েড্ সম্বন্ধে ইহাও একটি ভুল ধারণা যে অবদমন বয়স্ক মানুষের মনের ক্রিয়া। বয়স্ক মানুষ অবশ্যই অনেক সময় নিজ অসামাজিক যৌন ইচ্ছাকে সচেতনভাবে দমন করে। এই সচেতন আত্মশাসন কিন্তু অবদমন নয়। অবদমন সচেষ্ট ক্রিয়া নয়।

শিশুর জীবনে যে স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলি সুস্থভাবে পরিতৃপ্তির পথ পাইল না তাহারা কিন্তু অবলুপ্ত হইয়া গেল না। তাহারা অবরুদ্ধ আসামীর মতো মুক্তির সুযোগ খুঁজিতে থাকে। তাহারা অবিদারিত ভূগর্ভপ্রোথিত বোমার মতো (buried unexploded bomb)। তাহারা অপাংক্তেয়, অসভ্য, —সচেতন সভ্য চেতনমানসে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু আদিম কামের শক্তি দুর্বার, তাহাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা যায় না। অবদমিত আকাঙ্ক্ষার নির্দোষ বিস্ফোরণের ব্যবস্থা মানুষেব প্রকৃতির মধ্যেই রহিয়াছে। ইহারই একটি প্রধান উপায় হইল স্বপ্ন (dreams) ও কল্পনা (phantasy)। যে আকাঙ্ক্ষা শিশুর স্বাভাবিক জীবনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না তাহাই প্রচ্ছন্নভাবে স্বপ্নে বা কল্পনায় মুক্তি লাভ করে। ইহা মনুষের জীবনের safety-valve। এমন কোন শিশু আজিকার সভ্যজগতে দুর্লভ যে সম্পূর্ণ সুস্থভাবে গড়িয়া উঠিতে পাবে, যাহার স্বাভাবিক কাম আকাঙ্ক্ষা সভ্যজগতের বাধা নিষেধের দ্বারা বিড়ম্বিত হয় না। কিন্তু এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলিব পরিতৃপ্তির সহজ ও নিরাপদ ব্যবস্থা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে আছে বলিয়াই এ পৃথিবীটা একটা পাগলা গারদে পরিণত হয় নাই।

এই আলোচনা হইতে এ রকম ধারণা হওয়া সম্ভব যে, শিশুর কোন ইচ্ছা বা কোন কাজেই বাধা দেওয়া অনুচিত। বর্তমান কালের অনেক পিতা-মাতা ও প্রগতিশীল শিক্ষাবিদেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর স্বাধীনতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক। তাঁহারা রুশোর মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন সুশিক্ষার অর্থই হইল শিশুকে তাহার স্বভাব অনুযায়ী গড়িয়া উঠিতে বাধা না দেওয়া। এ মতের সঙ্গে ফ্রয়েডের মত মিলাইয়া অনেকে এই রকম একটি ভুল ধারণা পোষণ করেন যে শিশুকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে না দিলে তাহার সুস্থ মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। ইহা ফ্রয়েডের মত সম্পর্কে সাধারণের আর একটি ভুল ধারণা। শিশুর সব আকাঙ্ক্ষাই স্বাভাবিক নয়।

অনুকরণ দ্বারা সে অনেক জিনিষ করিতে চায়। শিশুর যে আকাঙ্ক্ষা তাহাকে বিপন্ন করিতে পারে, যাহা তাহার বা অপরের স্বাস্থ্যহানি করিতে পারে, তাহা হইতে অবশ্যই শিশুকে বিরত করিতে হইবে। শিশু যদি খোলা আগুনে হাত দিতে চায়, তবে তাহাকে বাধা দিতে হইবেই। সন্তান পালনের ক্ষেত্রে নিষেধ শাসনেরও যথেষ্ট স্থান আছে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে আমাদের বয়স্কদের চোখে যাহা অন্যায়, শিশুর অপরিণত বুদ্ধিতে তাহা কেবলমাত্র নিষিদ্ধ। ন্যায় অন্যায়ের বোধ অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ ; সে অভিজ্ঞতা শিশুর নাই। সুতরা; শিশু ধূলা ময়লা ঘাঁটিলে, নিজ বা অন্য শিশুর লিঙ্গ সম্পর্কে নির্দোষ কৌতূহল প্রদর্শন করিলে সে জন্য শিশু নষ্ট হইয়া গিয়াছে এ রকম মনে করিয়া অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নাই এবং তাহার স্বভাবজাত অপরাধের জন্য কঠোর তাড়না ও শাস্তির ব্যবস্থা করিলে ফল বিপরীত হওয়ারই সম্ভাবনা। এসব ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহলকে অন্যপথে চালিত করিতে হইবে, তাহার অন্তঃস্থিত জৈব প্রেরণার গতিপথ পরিবর্তন করিয়া তাহার সুস্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ জন্য ধৈর্য ও বিবেচনা এ দুয়েরই যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

কিন্তু শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার সুস্থ পরিতৃপ্তির পথ যদি বারে বারে কঠিন বাধাগ্রস্ত হয় এবং অবদমিত উত্তেজনার প্রকাশের সহজ স্বাভাবিক পথ যদি বন্ধ হয় তাহা হইলে অবদমিত তীব্র আকাঙ্ক্ষাগুলি অবচেতন মনে নানা জটিল সংঘাত (complexes) সৃষ্টি করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন করে। বাল্যকালের এই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতাগুলি ব্যক্তি আপাতদৃষ্টিতে বিস্মৃত হইলেও অবচেতন মনে থাকিয়া তাহারা চেতন মানসের উপর নানাভাবে অশুভপ্রভাব বিস্তার করে। ফ্রয়েডের মতে প্রত্যেক কঠিন মানসিক বিকারের মূলে থাকে অবদমনজনিত অবচেতন মনে জটিলতা। ইহাকে মনুষ্যদেহে বিস্ফোটকের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিস্ফোটকের অন্তরে সঞ্চিত বিষ নিষ্কাশন না করা যায় সে পর্যন্ত দেহ সুস্থ হইতে পারে না। ঠিক তেমনি অবচেতন মনের জটিলতার মধ্যে যে বিষ সঞ্চিত থাকে তাহা বহির্গমনের পথ (catharsis) করিয়া চেতন মানসের আলোকে তাহাকে মুক্তি দিলেই মানসিক বিকৃতির অবসান ঘটে। কোন চেতন প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহা সম্ভব নয়। তবে কিভাবে ইহা করা যাইতে পারে ?

ফ্রয়েড্ বহু পরীক্ষার পর মানসিক বিকারের চিকিৎসার জন্য যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে মনোবিকলন (psycho-analysis)। এই পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্ব ইতিহাস সামান্য একটু আলোচনা করা যাক্।

১৮৮০ সালে ভিয়েনার ডাক্তার যোশেফ ব্রুয়ারের (Breuer) কাছে একটি হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিণী চিকিৎসার জন্য আসিল। অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে তাহার একটি অদ্ভুত উপসর্গ দেখা গেল, যে মেয়েটি গ্লাস হইতে জলপান করিতে বিষম ঘৃণা বোধ করে। মেয়েটিকে অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াও ইহার কারণ জানিতে পারা গেল না। তাহার জীবনে এমন কোন ঘটনা সে উল্লেখ করিতে পারিল না যাহার সঙ্গে তাহার এই বিষম বিরূপতার কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে। ডাক্তার রোগিণীকে সম্মোহিত (hypnotised) করিয়া অতীত জীবনের সমস্ত কাহিনী বলিতে অনুরোধ করিলেন। মেয়েটি কথায় কথায় বলিল তাহার বয়স যখন খুব কম তখন সে একদিন এক ভদ্রলোকের বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিল। সেখানে দেখিল ভদ্রলোক মানুষের খাওয়ার গ্লাসে করিয়া পোষা কুকুরকে জল খাওয়াইতেছেন। ইহা দেখিয়া তাহার মনে বিষম ঘৃণা জন্মিল। কিন্তু গুরুস্থানীয় ভদ্রলোকের সামনে সে ঘৃণাটা প্রকাশ করিতে পারিল না। আশ্চর্যের কথা এই যে সম্মোহিত হইবার পূর্বে মেয়েটির মন হইতে এই অপ্রীতিকর ঘটনার স্মৃতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল। এবং আরো বিস্ময়ের কথা যে সম্মোহিত অবস্থায় তাহার মনের মধ্যে যে অপ্রীতিকর অনুভূতি নিরুদ্ধ হইয়াছিল তাহা মুক্তি লাভ করিবার পর তাহার রোগও আরোগ্য হইল। (Murphy—Historical Introduction to Modern Psychology P. 311)

এই সামান্য ঘটনাটিই ফ্রয়েডের মনোবিকলন পদ্ধতির সূত্রপাত করিয়াছিল। ইতিপূর্বে ফ্রয়েডের বহু পূর্বে হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি মানসিক রোগের চিকিৎসায় মেস্‌মার (Mesmer) সম্মোহন পদ্ধতি প্রথম প্রচলন করেন ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার নাম অনুযায়ী এ পদ্ধতিকে বলা হইত মেস্‌মারিজস্ (Mesmerism)। তিনি মনে করিতেন সম্মোহকের দেহ হইতে জৈব চুম্বকশক্তি (animal magnetism) রোগীর দেহে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে আরোগ্য করিয়া তোলে। তিনি এ পদ্ধতি দ্বারা অনেকের রোগ নিরাময় করেন। কিন্তু তৎকালীন চিকিৎসকেরা তাঁহার বিরোধী ছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়

প্রমাণিত হয় জৈব চুম্বকশক্তি বলিয়া কোন শক্তির অস্তিত্ব নাই এবং তাঁহার পদ্ধতি জনপ্রিয়তা হারায়। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে চিকিৎসাক্ষেত্রে আবার সম্মোহন প্রণালীর ব্যবহার ঘটে ইংলণ্ডে। ব্রেইড্ (Braid) নামে একজন যশস্বী ডাক্তার বলিলেন যে কোন কোন রোগীকে আরামে চক্ষু বুজিয়া শোয়াইয়া ডাক্তার রোগীর চোখের দিকে নির্নিমেষভাবে তাকাইয়া তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত তাহার উপর দিয়া শূন্যে হাত বুলাইয়া রোগীকে মোহাবিষ্ট করিতে পারেন। ইহার নাম তিনি দিলেন মস্তিষ্কের নিদ্রা (nervous sleep) বা সম্মোহন (hypnosis)। এই অবস্থায় রোগী চিকিৎসকের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে। যদি চিকিৎসক বলেন "তোমার এখন খুব আনন্দ হচ্ছে এবং তুমি হো হো করে হাসবে", তবে রোগী তাই করে। তিনি যদি বলেন "তুমি এখন তেতো কুইনিন্ খেয়েছো, তখন বাস্তবিক সে জিহ্বায় তিক্ত আস্বাদন বোধ করে এবং মুখ বিকৃত করে, ইত্যাদি। রোগীকে সম্মোহিত করিয়া চিকিৎসক যদি ইঙ্গিত করেন (suggestion) যে তাহার রোগ নিরাময় হইয়াছে, তাহা হইলে বাস্তবিকই রোগী আরোগ্য লাভ করে।

ব্রেইডের লেখা সম্মোহন পদ্ধতি দ্বারা রোগ নিরাময়ের কথা পড়িয়া ফরাসী দেশে মানসিক রোগের চিকিৎসক শারকোঁ (Charcot) হিষ্টিরিয়া রোগিনীদের চিকিৎসায় এই সম্মোহন প্রক্রিয়া ব্যবহার করিয়া যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। ফ্রয়েড্ ছাত্র হিসাবে শারকোঁর নিকট মানসিক রোগ চিকিৎসা শিখিবার জন্য প্যারিসে গিয়াছিলেন। তিনি সম্মোহন প্রক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসিত রোগীদের সম্পর্কে ইহা লক্ষ্য করিলেন যে তাহারা সম্মোহিত অবস্থায় নিজ জীবনের এমন সব ঘটনা উল্লেখ করে যাহা সচেতন অবস্থায় কখনো তাহাদের মনে আসিত না। এবং এ সব কথা বলিয়া ফেলিলে রোগীর মন শান্ত হয় (N. L. Munn—Psychology P. 12)।

কিন্তু কেন এমন হয় তাহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তিনি শারকোঁর নিকট হইতে পাইলেন না, তবে তাঁহার মনে এরূপ সন্দেহ জন্মিল যে, যে কোন কারণে মানুষের কতগুলি কামনা বা আকাঙ্ক্ষা মনের গভীরে কোন কঠিন বাধা পায় বলিয়াই তাহাদের কথা স্মরণে আসে না।

কেন এই বাধা? কি তাহার স্বরূপ? কি করিয়া এ বাধা অতিক্রম করা যায়? কেনই বা সম্মোহিত অবস্থায় বিস্মৃত আকাঙ্ক্ষাগুলি আত্ম-প্রকাশ করিয়া মানসিক অশান্তির অবসান ঘটায় এ সম্বন্ধে তাঁহার বৈজ্ঞানিক মন একটি

সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার অনুসন্ধান করিতে থাকে। ফ্রয়েডের এক সহপাঠী জ্যানেটও (Janet) এ সম্পর্কে কিছু চিন্তা করিতেছিলেন এবং তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ; তাহা এই,—মন একটি অবিচ্ছিন্ন স্রোত নয়। ব্যক্তির মানসিক দুর্বলতার জন্য তাহার মনের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন একাধিক স্রোত চলিতে থাকে, যাহাদিগকে সে একত্র করিতে পারে না। যখন এই বিচ্ছিন্নতা (dissociation) ঘটে তখনই সৃষ্টি হয় মানসিক বিকৃতি (Hart—The Psychology of Insanity—Introduction XVII)। ফ্রয়েড্ মানসিক বিকারের কারণ সন্ধানে জ্যানেটের বিচ্ছিন্নতা মতবাদের গুরুত্ব স্বীকার করিলেন কিন্তু মস্তিষ্কের দুর্বলতার জন্য ইহা ঘটে এই ব্যাখ্যা তাঁহার মনঃপুত হইল না। বহু চিন্তা ও ভূয়োদর্শনের পর তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে মনের কোন আকাঙ্ক্ষা বা অভিজ্ঞতা মূল মানসস্রোত হইতে তখনই বিচ্ছিন্ন হয় যখন তাহা ব্যক্তির চেতন মানসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে বিরোধী এবং এই বিরোধের কারণ হইতেছে যে সেই আকাঙ্ক্ষা বা অভিজ্ঞতা সমাজের দৃষ্টিতে দূষনীয় (Flugel. A Hundred Years of Psychology, P. 280)। তাঁহার চিন্তা শারকোঁর একটি কথায় একটি নূতন আলোর সন্ধান পাইল। একদিন একটি হিষ্টিরিয়া রোগিনীর সম্বন্ধে শারকোঁর ছাত্ররা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কেন কতগুলি উপসর্গ এ বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা দেয় ? শারকোঁ বেশ উত্তেজিত ভাবে উত্তর দেন যে এ জাতীয় উপসর্গের মূলে সর্বদাই থাকে কোন না কোন যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি। একটু থামিয়া তিনি খুব জোর দিয়া বলিলেন "সর্বদা, সর্বদা, সর্বদাই।" এই কথাগুলি ফ্রয়েডের মনে গভীর রেখাপাত করিল এবং নিবিড় চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফলে তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে সমস্ত মানসিক বিকারের মূলেই থাকে, অবদমিত অতৃপ্ত যৌন কামনা। ব্যক্তির সামাজিক নীতিবুদ্ধি এই কামনাগুলিকে নিন্দার চোখে দেখে বলিয়াই ইহারা সচেতন মানসস্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবচেতন মনের অন্ধকার গুহায় আশ্রয় নেয়। সম্মোহনের ফলে ব্যক্তির সামাজিক নীতিবুদ্ধির প্রহরা শিথিল হয় বলিয়া অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি চেতন-মানসে মুক্তি পাইয়া মনের কালিমা দূর করিয়া ব্যক্তিকে সুস্থ করিয়া তোলে। যৌন আকাঙ্ক্ষা বা Sex কথাটির তাৎপর্য পরবর্তীকালে ফ্রয়েড দর্শনে বহু পরিবর্তিত হইয়াছে এবং তাহা ব্যাপকতর মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ পরিণত বয়সে ফ্রয়েড্ এই মত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়াছেন যে Sex শুধু মানসিক

বিকারের মূল কারণ নয়। তাহা মানবজীবনের সমগ্র ক্রিয়া ও উদ্যমের মূল ভিত্তি।

ফ্রয়েড্ ভিয়েনায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার এক সহকর্মী ব্রুয়ারের সহযোগিতায় সম্মোহন পদ্ধতি দ্বারা হিষ্টিরিয়া রোগীদের চিকিৎসা সুরু করিলেন। কিন্তু কিছুদিন মধ্যেই তিনি দেখিতে পাইলেন এ চিকিৎসা প্রণালী সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য নয়, সম্পূর্ণ নিরাপদও নয়। দেখা গেল এ চিকিৎসার সুফল অনেক সময় খুব দীর্ঘদিন স্থায়ী নয় এবং খুব গভীর সম্মোহন (deep hypnosis) না হইলে চিকিৎসায় অনেক সময়ই সুফল পাওয়া যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মোহিত রোগীদের সুস্থ সচেতন অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতেও বেগ পাইতে হয়। ফ্রয়েডের মনে এই ধারণা জন্মিল এ প্রণালী রোগের মূলে পৌছিতে পারিতেছে না, তাহাকে কোন প্রকারে এড়াইয়া যাইতেছে মাত্র। তিনি বুঝিলেন রোগীর অবচেতন মনে কোন একটা বাধা (resistance) সম্পূর্ণ উল্লঙ্ঘন করা যাইতেছে না বলিয়াই এ পরীক্ষা সফল হইতেছে না। (Flugel —A Hundred Years of Psychology. P. 281)

আর একটা গুরুতর ব্যাপারের ফলে ব্রুয়ার এ চিকিৎসাপ্রণালী ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার একটি রোগিনীকে সম্মোহন প্রণালী প্রয়োগ করার ফলে হিষ্টিরিয়া আরোগ্য হইল বটে কিন্তু মেয়েটি গভীরভাবে ডাক্তারের প্রেমে পড়িল। ব্রুয়ার প্রমাদ গণিলেন। অনুরূপ অভিজ্ঞতা ফ্রয়েডেরও একাধিকবার ঘটিল কিন্তু বিজ্ঞানীর অনাসক্ত দৃষ্টি নিয়া এ রকম ঘটনা কেন ঘটে, তাহার কারণ অনুসন্ধানে তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। বহু চিন্তার পর তিনি এ সিদ্ধান্ত করিলেন যে রোগিনী রোগমুক্তির পর যে ডাক্তারের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহার কারণ ইহা নয় যে সে ডাক্তারকে ভালবাসিয়া ফেলে। ইহার কারণ হইতেছে যে চিকিৎসার ফলে রোগিনীর অবচেতন মনে নিরুদ্ধ কামাকাঙ্ক্ষা মুক্তি পাইয়া সামনে ডাক্তাররূপ বিশ্বস্ত ও সহানুভূতিশীল পাত্রে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি খোঁজে। ডাক্তার এখানে বিকল্প (substitute) মাত্র। এখানে অবরুদ্ধ প্রেমাকাঙ্ক্ষার পাত্রান্তর (transferance) ঘটিতেছে এবং ইহা রোগিনীর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের একটি পূর্ব অবস্থা। তাই ইহাতে আশঙ্কার বাস্তবিক কারণ নাই ; আশান্বিত হওয়ারই কারণ আছে। তবে চিকিৎসকের সর্বদা একটি নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক মন নিয়া চিকিৎসা চালাইতে হইবে (Woodworth —Contemporary Schools of Psychology. P 139)।

ক্রয়ার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ফ্রয়েড্ এবার স্বাধীনভাবে মানসিক রোগের চিকিৎসা চালাইতে লাগিলেন। যদিও প্রণালী হিসাবে সম্মোহন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন না, তথাপি এ প্রণালীই তিনি ব্যবহার করিতে থাকিলেন। ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহার এই ধারণা দৃঢ়তর হইল যে সমস্ত মানসিক বিকারের পশ্চাতেই থাকে কোন না কোন প্রকার অতৃপ্ত ও অবরুদ্ধ যৌন আকাঙ্ক্ষা। এটাও তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সম্মোহন ক্রিয়া দ্বারা যখন রোগীর মনে অবরুদ্ধ কামনাকে সচেতন মানস স্রোতে আনিয়া মুক্তি দেওয়া যায় তখনই আরোগ্যলাভ ঘটে। তিনি রোগীদের সম্মোহন করিয়া তাহাদিগকে মন খুলিয়া সব কথা বলিতে উৎসাহ দিতেন। কিন্তু তিনি দেখিতেন রোগীর কথার মধ্যে মাঝে মাঝে ফাঁক থাকিয়া যাইতেছে, কখনও কখনও এমন কথা বলিতেছে যাহা অবিশ্বাস্য বা অর্থহীন। অথবা কখনো তাহার বিবরণ থামিয়া যাইতেছে কিংবা সে বলিতেছে, তাহার কিছু মনে আসিতেছে না। তিনি বুঝিতে পারিলেন রোগীর অবচেতন মনে কোন প্রবল বাধা তাহার অবরুদ্ধ বাসনাগুলিকে সচেতন মনে আত্মপ্রকাশে বাধা (resistance) দিতেছে। তিনি বহু রোগীর সম্মোহিত অবস্থায় বিবরণগুলি সযত্নে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেন যে সমস্ত ঘটনার স্মৃতি এই রকম বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে তাহাদের পশ্চাতে এমন কোন ইচ্ছা বা কামনা আছে যাহা সামাজিক দৃষ্টিতে নিন্দার্হ বা আত্মমর্যাদা হানিকর। ইহা হইতে তাঁহার স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে মানুষের মনের মধ্যে একপ্রবল সামাজিক বুদ্ধি (super-ego) বর্তমান থাকে যাহা তাহার নগ্ন অসামাজিক কামনাগুলিকে শাসন করিয়া (censor) সচেতন জীবনে তাহাদের প্রকাশের পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। তিনি ইহাও লক্ষ্য করিলেন এ সমস্ত রোগীর স্বপ্নের মধ্যেও তাহাদের মনের গোপন কামনা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু এখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই গোপন কামনা সোজাসুজি ভাবে পরিতৃপ্তি লাভের পথে প্রহরীর বাধা পায়, তাই কতগুলি প্রতীকের (symbol) সাহায্যে গৌণভাবে সে কামনাগুলি পরিতৃপ্তি লাভ করে। পরবর্তীকালে (১৯০০ সালে) ফ্রয়েড্ তাঁহার Interpretation of Dreams গ্রন্থে অবচেতন মনের সাহায্যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিশদভাবে করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার অভিনব দর্শন হর্ম্যের একটি প্রধান স্তম্ভ। ফ্রয়েড্ তাঁহার বিপুল অভিজ্ঞতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তার ভিত্তিতে একটি সুসমন্বিত মত

(integrated view) দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। তিনি প্রকৃত বিজ্ঞানী ছিলেন কাজেই নূতন অভিজ্ঞতা ও প্রমাণের ভিত্তিতে নিজের মতামত তিনি অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন, পরিবর্ধন এমন কি পরিত্যাগও করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহার চিন্তার সততা (intellectual honesty) সমস্ত বিজ্ঞানীদের অনুকরণীয়। যাহা হউক মানসিক রোগের কারণ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে চারিটি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি অবিচল ছিলেন (১) চেতন মানস আমাদের মনোজগতের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। মনের বৃহত্তর অংশ থাকে মগ্ন অবচেতনায়। এই অবচেতন মনেই আছে ব্যক্তিত্বের চাবিকাঠি। অবচেতন মনের প্রাণকেন্দ্রে আছে আদিমকাম (Libido, বা Sex, বা Id)। তাহাই ব্যক্তির সমস্ত আগ্রহ, উদ্যম ও শক্তির মূল। (২) শৈশবের অসামাজিক কামেচ্ছা ব্যক্তির সামাজিক বিবেক বুদ্ধির শাসনের ফলে অবদমিত হইয়া মনের আলোকিত চেতন স্তর হইতে বিচ্যুত হইয়া গভীরতর গোপন স্তরে নির্বাসিত হইয়া থাকে। (৩) অবচেতন মনের এই নিরুদ্ধ কামনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তাহাদের মানসস্রোত হইতে বিচ্ছিন্নতাই সমস্ত মানসিক বিকারের মূল। (৪) এই নিরুদ্ধ কামনা ও জটিল দ্বন্দ্ব চেতন মানসে মুক্তি পাইয়া জীবনের সঙ্গে সমন্বয়িত হইলে তবেই মানসিক বিকার আরোগ্য হয়।

ফ্রয়েড্ বারে বারেই দেখিলেন সম্মোহন প্রণালী দ্বারা অবচেতন মনের বাধা সম্পূর্ণ দূর করা যাইতেছে না। অথচ এই বাধা দূর করাই হইতেছে চিকিৎসকের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন কাজ। এই বাধা দূর করিতে পারিলে তবেই অবদমিত অবরুদ্ধ কামনা মুক্তি পাইয়া আরোগ্যের পথ সুগম করে। তিনি ক্রমে ক্রমে সম্মোহন পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া উন্নততর এক প্রণালী আবিষ্কার করিলেন এবং তাহারই নাম দিলেন মনোবিকলন (Psycho-analysis)। এ পদ্ধতিতে রোগীকে সম্মোহিত করার পরিবর্তে তাহাকে আরামে শোয়াইয়া মন শান্ত করিয়া, যাহা মনে আসে, যে ভাব বা যে কথা বা যে আকাঙ্ক্ষা তাহাই অনর্গল বলিতে উৎসাহ দিতেন। অনেক কথা রোগী বলিত যাহা তুচ্ছ, অসংলগ্ন, অশ্লীল, হাস্যকর, তথাপি চিকিৎসক কোন বাধা দিতেন না। কখনও কখনও কথার মধ্যে দেখা যাইত দ্বিধা, কখনও বা আত্মসমর্থনের চেষ্টা। অভিজ্ঞ মনঃসমীক্ষক ইহা হইতে অনুমান করিতেন রোগীর অবচেতন মনে কোথায় বাধা লুকাইয়া আছে। আবার এমনও দেখা যাইত রোগী পিতা

বা মাতার মৃত্যু বা কঠিন রোগের কথা বলিত। বিচক্ষণ সমীক্ষক বুঝিতেন রোগীর গভীর অবচেতনায় তাহার পিতা বা মাতার প্রতি কঠিন বিরূপতা বা অভিমান বর্তমান, এবং পিতামাতার স্নেহ সম্বন্ধে বঞ্চনাবোধের সঙ্গে তাহার মানসিক বিকারের সম্পর্ক আছে। অথবা বিপরীত ভাবে রোগী (বা রোগিনী) পিতামাতা বা অন্য কোন ঘনিষ্ট আত্মীয়ের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথা বলে, যাহা আদৌ সত্য নয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বুঝিতে পারেন এখানে রোগীর গোপন যৌন ইচ্ছারই বিকৃত প্রকাশ। যাহা হোক, এই প্রণালীতে দেখা যায়, এক কথা হইতে আর কথা, একভাবের সঙ্গে আরেক ভাব যুক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত রোগীর অসতর্ক মুহূর্তে তাহার অবচেতন মনের গ্রন্থি বা জট কোথায় তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিকে তাই মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণালী (Free Association Method) বলা হয়। অবশ্য এ পদ্ধতি সেখানেই সফল হওয়ার সম্ভাবনা যেখানে রোগী চিকিৎসককে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে, তাঁহার সহানুভূতি ও দক্ষতা সম্পর্কে যেখানে সে নিশ্চিন্ত। এই নির্বাধ কথা বলার মধ্য দিয়াই অনেক সময় রোগীর নিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা বা আবেগ মুক্তিলাভ করে এবং সম্মোহনের সাহায্যে যেমন আরোগ্য করা যায়, মনোবিকলনের দ্বারাও তাহাই করা যায়। অবচেতন মনের কলুষ দূর করিবার জন্য এই গভীর বিশ্লেষণ পদ্ধতিই ফ্রয়েডের প্রসিদ্ধ মনোবিকলন প্রণালী (psycho-analysis)। একজন পণ্ডিত ব্যক্তি মনোবিকলনের এক সংক্ষেপ বিবরণ দিয়াছেন, "Psycho-analysis is based on the theory that much of human behaviour is unconsciously motivated. As a result of long formal training the psychoanalyst becomes skilled in drawing out and integrating these unconscious motives through the technique of free association."—Ed. Reader's Digest, Jan. 1961)।.

এ পদ্ধতিতে সম্মোহন প্রক্রিয়ার সমস্ত সুফলই পাওয়া যায়, অথচ সম্মোহন পদ্ধতির অসুবিধাগুলি নাই। সকলের চেয়ে বড় কথা এ প্রণালীতে রোগীর সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যায়। সম্মোহিত অবস্থায় রোগী চিকিৎসকের ইঙ্গিত (suggestion) দ্বারা চালিত হয় এবং তাহার রোগমুক্তির জন্য সে সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসকের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু ফ্রয়েডের পদ্ধতিতে রোগীর সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। রোগীকে চিকিৎসক বাহির হইতে ঔষধ দিয়া আরাম করেন না। রোগীকে সুস্থ হইতে হইবে নিজ

চেষ্টায়। যখন সে অসঙ্কোচে অবচেতন মনের মলিন কামনাগুলিকে সচেতন জীবনের আলোকের সম্মুখে আনিয়া তাহাদের সঙ্গে মুখোমুখি বোঝাপড়া করিতে পারিবে তখনই সে কলুষমুক্ত হইবে। শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যপাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যার শাপমোচন হইয়াছিল এই পৌরানিক কাহিনী বুঝি মানুষের সেই শৃংখল মুক্তির সাধনারই প্রতীক। ফ্রয়েডের পদ্ধতিতে ব্যক্তি বিশ্লেষণের সাহায্যে আত্মপরিচয়ের মধ্য দিয়া আত্মজয় করে। রোগী নিজেকে নিজের চেষ্টা দ্বারাই বাস্তবিক আরোগ্য করে ; চিকিৎসক সহায়ক মাত্র, বিশ্লেষণের পথ প্রদর্শক। এ মুক্তির মধ্যে ফাঁকির স্থান নাই।

ফ্রয়েডের সহকর্মী ও অনুগামীদের অবিচ্ছিন্ন পরীক্ষা ও ভূয়োদর্শনের ফলে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ফ্রয়েডের ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ কোন কোন গুরুতর বিষয়ে ফ্রয়েডের বিরোধী সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন এবং ফ্রয়েডের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন চিন্তাধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অ্যাড্লার (Adler) ও য়ুঙ্গ (Jung)এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে দুটি বিষয়ে ফ্রয়েডের মতের সঙ্গে তাঁহাদের বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা হইতেছে, ফ্রয়েডের দুটি প্রধান মত (১) কামই (sex) হইতেছে সমস্ত চেতন ও অবচেতন মনের মূল, জীবনের সমস্ত ক্রিয়া, উদ্যম ও আবেগের উৎস। (২) কামেচ্ছা বা যৌন চেতনার উদ্ভব শৈশব কালেই এবং শৈশবের যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তিই পরিণত জীবনে সমস্ত মানসিক বিকারের কারণ। এ্যাড্লার এবং য়ুঙ্গ দুজনেই মনে করেন ফ্রয়েড্ কামকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়াছেন এবং কামই জীবনের পশ্চাতে একমাত্র মৌলিক শক্তি এ মত তাহারা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সমস্ত ফ্রয়েডে্পন্থীরাই মনোবিকলন পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। এ্যাড্লার মনে করেন মানুষের জীবনের প্রধান শক্তি হইতেছে আত্মাভিমান বা শক্তির আকাঙ্ক্ষা (will for power)। কামাকাঙ্ক্ষাও এই জয়লাভের ইচ্ছারই একটি রূপ। এ্যাড্লারের মতে মানসিক বিকারের মূল হইতেছে ব্যক্তির মনে হীনতা বোধ (Inferiority Complex)। মানুষের সমস্ত উদ্যমের পিছনে আছে এই হীনমন্যতাকে জয় করিবার আকাঙ্ক্ষা। মানুষ নিজের কাছে এবং অপরের কাছে সতত এই কথাটিই প্রমাণ করিতে চায় যে সে ছোট নয়। এই বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা যখন ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তখন সে নিজ ক্ষমতা বা নিপুণতা বৃদ্ধি করিতে যত্নবান হয়, ইহাতে তাহার চরিত্রের উৎকর্ষ ঘটে। যাহার মধ্যে ওই বিশেষ গুণের অভাব আছে সে চেষ্টা করে

বিশেষ কোন বিষয়ে নিজের অসাফল্য অন্য কোন বিষয়ে সাফল্য দিয়া মুছিয়া ফেলিতে। আর যাহাব ক্ষমতার নিতান্ত অভাব ও যে চরিত্র দুর্বল সে নিজের দুর্বলতার সমর্থক একটা বাহ্য অবস্থা আবিষ্কার করিতে অথবা নিজের মধ্যে কোন রোগ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে এবং সত্যই সে বিশ্বাস করে যে অসুস্থতার জন্য অথবা পরিবেশের অত্যন্ত প্রতিকূলতার জন্যই সে সফল হইতে পারিতেছে না। নিজ আত্ম-মর্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এমন একটি জীবন ধারার (style of life) অভিনয়ে সে অভ্যস্ত হয়। সংসার তাহার উপর যে দাবী করে তাহা এড়াইবার উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বাহিরের কোন অসুবিধার অজুহাত দিতে থাকে, অথবা কোন ব্যাধি বা মানসিক বিকার সৃষ্টি করিয়া তাঁহার পিছনে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। আর্নেষ্ট জোনস্ (Ernest Jones) এই চেষ্টার বিভিন্ন রূপ আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহাদের নাম দিয়াছেন Defense mechanism (লেখকের অহংকারের আত্মরক্ষা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—অবাধ্য শিশু ও শিক্ষা সমস্যা)। যে সমস্ত লোক যাহারা জীবনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া নিতে না পারিয়া মিথ্যা অজুহাতের আশ্রয় নেয়, তাহাদের চিকিৎসা করিতে হইলে তাহার অবচেতন মনে হীনমন্যতার যে গ্রন্থিটি আছে তাহার স্বরূপ এবং যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়া সে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সচেতন মনের সামনে উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। (Adler —Individual Psychology)।

য়্যুঙ্গ ও এ্যাডলারের মত মনে করেন, সেক্সকে ফ্রয়েড্ অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়াছেন। ফ্রয়েড্ মানসিক রোগের মূল খুঁজিয়াছেন শৈশবের অতৃপ্ত কামাকাঙ্ক্ষায়। য়্যুঙ্গও এ মতকে একপেশে ও অপরিণত বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে রোগীর বিকারের মূল আছে তাহার বর্তমান জীবনের পারি-পার্শ্বিকতার সমস্যা ও তাহার সমাধানে ব্যক্তির অক্ষমতার মধ্যে। সুতরাং কেবলমাত্র শৈশবের বিরূপ অভিজ্ঞতার পশ্চাদ্ধাবন করিলে মানসিক বিকারের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না (Jung—Analytical Psychology)। মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তায় য়্যুঙ্গ এর বিশেষ অবদান, তাঁহার Psychological Types মতবাদ। তাঁহার মতে মানুষ প্রধানত দুই দলের ; একদল অন্তর্মুখী, আত্মকেন্দ্রিক, চিন্তাশীল, অভিমানী ; ইহারা হইলেন—Introverts। আর একদল হইলেন বহির্মুখী, বস্তুনিষ্ঠ, কর্মকুশল ও সামাজিক, ইহারা Extro-

serts। একদলের মানসিক শক্তির লক্ষ্য মনোজগৎ, আর একদলের লক্ষ্য বহির্জগত। এ দুটি typeই অসম্পূর্ণ। এই দুইয়ের সমন্বয়েই সুস্থ সম্পূর্ণ মানুষ। য়্যুঙ্গ মনে করেন ফ্রয়েড্ ও এ্যাডলার এই দুই বিপরীত দলের মুখ-পাত্র। তাঁহার Analytical Psychologyতে তিনি এই দুই বিরোধী মতের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন (Flugel. Hundred years of Psy-chology—P. 301)।

মানসিক রোগ চিকিৎসায় মনোবিকলনের বহুল ব্যবহার গত পঞ্চাশ বৎসরে বিস্ময়করভাবে ব্যাপকতা লাভ করিয়াছে। ফ্রয়েডের অনুগামীরা মনোবিকলন প্রণালীকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিয়া দাবী করিতে সুরু করিয়াছেন এবং ফ্রয়েডকে প্রায় অবতারে পরিণত করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশে মানসিক বিকার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে এবং মনোবিকলনমূলক চিকিৎসা পদ্ধতি আমেরিকায় প্রায় একটি ধর্মীয় সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। মানসিক রোগ চিকিৎসার জন্য বহু হাসপাতাল প্রায় প্রত্যেক সহরেই স্থাপিত হইয়াছে এবং বহু মনোবিজ্ঞানী স্বাধীনভাবে মানসিক রোগের চিকিৎসায় রত আছেন। মানসিক রোগের চিকিৎসকেরা সকলেই ফ্রয়েডীয় দর্শনে বিশ্বাসী কিন্তু সকলেই মনোবিকলন পদ্ধতির উপরই একমাত্র নির্ভর করেন না। তাহারা বিভিন্ন প্রকার মন শান্ত করিবার ঔষধ (tranquilisers), মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক শক্ (Electric shock therapy) প্রয়োগ, ঠাণ্ডা জলে স্নান, ইনসুলিন্ দ্বারা শক্ (Insulin shock) পদ্ধতি, বিভিন্ন কাজ ও খেলার মধ্য দিয়া রোগীর বিক্ষিপ্ত মনকে কেন্দ্রীভূত করা (occupational therapy), ইত্যাদি অন্য বহু পদ্ধতি ব্যবহার করেন—The general psychiatrist may use the psycho-analytic theories but he does not use the psycho-analytic technique. He uses psycho-therapy (discussion of the reasons of behaviour), drugs, electro-shocks and other methods (Ed. Readers Digest. Jan, 1961).

মনোবিকলন পদ্ধতির সাফল্যজনক ব্যবহার একেবারেই সহজ নয়। এ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে চিকিৎসকের পক্ষে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও বিশেষ শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইহার অভাব দেখা যায়। ফ্রয়েড্ তত্ত্বে পল্লবগ্রাহী বহু ব্যক্তি আজকাল যখন তখন নিজের

বা বন্ধুবান্ধবদের মনোবিকলনে প্রবৃত্ত হন। ইহা শুধু অফলপ্রসূ নয়, অনেক সময় বিপজ্জনক। মানসিক রোগীরা সহজেই ইঙ্গিত দ্বারা প্রভাবিত হন (easily open to suggestion), কাজেই নিজের রোগ সম্বন্ধে কোন একটা ভ্রান্ত ধারণা একবার তাহাদের মাথায় ঢুকিলে তাহা দূর করা মুস্কিল। তা ছাড়া এই মনোবিকলন পদ্ধতি ব্যবহারে হাস্যকর বাড়াবাড়ি কখনও কখনও দেখা যায়। কেহ কেহ সাহিত্যিকদের লিখিত গল্প বা উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া লেখকের মনোবিকলনে প্রবৃত্ত হইয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন। এরকম একজন পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি, Dr Paul Schilder অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী শিশুপাঠ্য কল্প কাহিনী Alice in Wonderland এর লেখক Lewis Carroll এর মনোবিকলন করিয়া কয়েকটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উপক্রমণিকায় তিনি বলিয়াছেন "সমস্ত রূপকথাই অবচেতন মনে আদিম ও অপরিণত ধ্বংস প্রবৃত্তির পরিচায়ক।" তাঁহার মতে Carroll এর বহু ভাইবোন ছিল সুতরাং তিনি পিতামাতার সম্পূর্ণ স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, এবং ভাই বোনদের প্রতি ঈর্ষা, তিনি তাহার কল্পনার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার রূপকথার ছোট মেয়েরা পুংলিঙ্গের প্রতীক হওয়া সম্ভব। তাহার গল্পের নায়িকা Alice প্রায়ই তাহার আকার পরিবর্তন করিতেছে এবং প্রায়ই সে বিপদের মুখে পড়িতেছে ইহা প্রমাণ করিতেছে যে Carroll লিঙ্গচ্ছেদগ্রন্থি (Castration complex) রূপ মানসিক বিকারে ভুগিতেন! সর্বশেষ এই প্রকাণ্ড পণ্ডিত ব্যক্তি এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, Alice in Wonderland জাতীয় পুস্তক অসভ্য ধ্বংস-প্রবৃত্তির পোষক এবং এ জাতীয় পুস্তক শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন করে!! H. F. Eyesenck বর্তমান কালের একজন প্রসিদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক। ফ্রয়েড্ দর্শনে তিনি সুপণ্ডিত এবং লণ্ডনে বিশ্ববিদ্যালয়ের Psychological Laboratory এবং Institute of Psychiatryর তিনি Director। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সুখপাঠ্য গ্রন্থ Sense and Nonsense in Psychology গ্রন্থে তথাকথিত ফ্রয়েড্ পন্থীদের এরকম বাড়াবাড়ির বহু উদাহরণ তিনি দিয়াছেন। একটি পুং যোনিসদৃশ আকৃতি রান্নার বাসন ইংল্যাণ্ডে ভাল চলিল না, কিন্তু আমেরিকায় ইহার দারুণ চাহিদা। মনোবিকলনপটু কোন মনোবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা হইল, ইংল্যাণ্ডের মেয়েদের লজ্জা-সরম বেশী, তাই তারা এ বাসন পছন্দ করে না, কিন্তু আমেরিকার মেয়েরা এ বিষয়ে অনেকটা সংস্কার মুক্ত তাই এ বাসনে তাহাদের যৌনকামনার পরিতৃপ্তি

ঘটে। আবার দেখা যায়, আমেরিকার মেয়েরা ক্রমেই ইংল্যাণ্ডের মেয়েদের তুলনায় বেশী সিগারেট খায়। ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয় সিগারেট পুংলিঙ্গের প্রতীক। আমেরিকার মেয়েদের যৌনাকাঙ্ক্ষা অধিকতর অতৃপ্ত। সিগারেটের প্রতি আসক্তি সে অতৃপ্ত কামনা তৃপ্তির একটা সহজ উপায়। আজকাল একরকম লজেঞ্জ পাওয়া যায় যাহার মাঝখানে গোল ফুটা (fruit rounds) থাকে। তাহাদের জনপ্রিয়তার ব্যাখ্যা হইল যে এগুলি স্ত্রীযোনির প্রতীক্ বলিয়া আকর্ষণের বস্তু। কিন্তু তাহা হইলে মেয়েরাও কেন ইহা পছন্দ করে? উত্তরে বলা হইল, ইহা সমলিঙ্গ কামিতার (homosexuality) লক্ষণ!

Eyesenck ফ্রয়েডীয় দর্শনে বিশ্বাসী হইয়াও মনোবিকলন পদ্ধতি মানসিক রোগ চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করিয়াছে কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। বিজ্ঞ' চিকিৎসক হিসাবে নিজ প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Psychiatryর খাতাপত্র অনুসন্ধান করিয়া তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে মানসিক রোগের চিকিৎসায় শুধুমাত্র মনোবিকলন পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা আরোগ্যের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নহে। মনোবিকলন পদ্ধতি সাহায্যে চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও দীর্ঘকাল পরীক্ষা সাপেক্ষ। যাঁহারা মনোবিকলন পদ্ধতিতে গোঁড়া বিশ্বাসী, তাঁহারা এ চিকিৎসা দ্বারা যাহারা আরোগ্যলাভ করিয়াছেন তাহাদের কথাটাই সরবে প্রচার করেন। কিন্তু Eyesenck তাঁহার নিকট লিখিত বহু চিঠিপত্র হইতে দেখাইয়াছেন যে যাহারা এ চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করে নাই, এমন কি যাহাদের অবস্থার অবনতি হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাও বিপুল।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে শুধু মনোবিকলন পদ্ধতিতে চিকিৎসার দ্বারা প্রতি তিন জনের মধ্যে দুজন আরোগ্যলাভ করে। এবং অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসা কয়েকবৎসর ধরিয়া চালাইতে হয়। অন্যান্য পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসায় আরোগ্যের হারও ঠিক একই সমান। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লণ্ডনের হাসপাতালে মানসিক রোগীদের আরোগ্যের হার ইহার চেয়ে কম ছিল না। এমন কি, যাহারা কোন চিকিৎসা করায় না সেই সব মানসিক রোগীদের আরোগ্যের হারও প্রতি তিন জনের মধ্যে দুইজন। নিউ ইয়র্কের ডাঃ পিটার ডেন্কার (Denker) পাঁচ শতের উপর কঠিন মানসিক রোগীকে চিকিৎসার জন্য তাহাদের পারিবারিক চিকিৎসকের কাছেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সেই পারিবারিক চিকিৎসকেরা কেহই মনোবিকলন প্রণালী ব্যবহার করেন

নাই। সাধারণ বহুপ্রচলিত ঔষধ, পরামর্শ, ও ইঙ্গিতের (suggestion) উপরই তাঁহারা নির্ভর করিয়াছেন কিন্তু তাহাতেও দেখা গেল দুই বৎসর ব্যাপী সাধারণ চিকিৎসার পরে প্রতি তিনজনের মধ্যে দুইজন আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ডাঃ মেলিটা স্মিডবার্গ (Dr Melitta Schmideberg) আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ মনোবিকলন বিশেষজ্ঞ তাঁহার অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। তিনি লিখিয়াছেন "এ কথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই যে বর্তমানে মনোবিকলন প্রণালী দ্বারা চিকিৎসার সাফল্য ত্রিশ বৎসর পূর্বের চেয়ে অধিক সন্তোষজনক অথবা দীর্ঘকাল স্থায়ী অথবা অধিকপরিমাণে আরোগ্যদায়ক। বরঞ্চ বিপরীতই বোধ হয় সত্য। একথা মনে করিবার উপযুক্ত কারণ নাই যে, সাইকো-থেরাপী বা অন্যান্য পদ্ধতিতে চিকিৎসা দ্বারা এমন কি বিনা চিকিৎসায় যে পরিমাণ রোগী আরোগ্য হয়, মনোবিকলন দ্বারা আরোগ্য লাভের সংখ্যা তাহার চেয়ে বেশী।"

তত্ত্বের দিক হইতে শিশুদের মানসিক রোগের চিকিৎসায় মনোবিকলনের ফল অতঃস্ত আশাপ্রদ হওয়া উচিত, কিন্তু কার্যতঃ তাহা হয় না।

এমন কি ফ্রয়েডও পরিণত জীবনে চিকিৎসার পদ্ধতি হিসাবে মনোবিকলনের উপর পূর্বের ন্যায় আশা-বাদী ছিলেন না। আমেরিকার Psychoanalysis Association স্পষ্টই প্রচার করিয়াছেন "চিকিৎসাপদ্ধতি হিসাবে মনোবিকলনের সাফল্য সম্বন্ধে কোন দাবী আমরা করি না। যে সব ব্যক্তিরা এমন অতিরিক্ত দাবী করেন তাহাদের উৎসাহ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সীমা ছড়াইয়া গিয়াছে (individuals in whom enthusiasm may outrun knowledge) এবং তাঁহাদের দাবী সম্বন্ধে আমরা সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করিতেছি।" ক্যাসেল ও হাইম্যান্ (Cassell and Highman) মনোবিকলন পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা চিকিৎসিত রোগীদের আরোগ্যের শতকরা হার সম্পর্কে অনুসন্ধান উদ্দেশে ৩৩টি রোগীর বিবরণ বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করিয়াছেন। এদের মধ্যে ৫ জন এ চিকিৎসার দ্বারা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, ৬ জন এ পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ পরিবর্তন দ্বারা নিরাময় হইয়াছেন। ৮ জনের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হইয়াছে, ১৪ জনের অবস্থা পূর্ববৎ আছে, অথবা অবনতি ঘটিয়াছে। এই শেষোক্ত দলে একজন আত্মহত্যা করিয়াছেন, এবং ৬ জনের গুরুতর মানসিক বৈকল্য দেখা দিয়াছে। রোজার্স ও এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া এ সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে মনোবিকলন

চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে নাই। তিনি ইহার কারণও নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ, মানসিক রোগ দৈহিক রোগের তুলনায় গুরুতর এবং এ রোগের চিকিৎসায় সাফল্য লাভ অনেক বেশী কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, মনোবিকলন পদ্ধতিতে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা মনে করেন রোগীর অবচেতন মনে যে আকাঙ্ক্ষা নিরুদ্ধ হইয়া আছে তাহাকে সচেতন মনে টানিয়া আনিয়া মুক্তি দিলেই রোগী আরাম হইবে। কিন্তু অন্তর্নিহিত কারণটি জানার পরও অনেক রোগী নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারে না। কারণ ব্যক্তির অনুভূতির জীবন (emotional life) ছাড়াও আরো কতগুলি দিক আছে যাহা তাহার মানসিক রোগের সঙ্গে জড়িত যথা, তাহার অশান্তিকর পারিবারিক অবস্থা, অস্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ, আর্থিক দুশ্চিন্তা ও শিক্ষার সুযোগের অভাব ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলির সমাধান না হইলে মানসিক সুস্থতা লাভ সম্ভব নয় (C. E. Rogers—The Clinical Treatment of the Problem Child P. 338)।

মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আলেকজাণ্ডার ও ডাঃ হীলি (Dr. Alexander & Dr. Healy) মনোবিকলনের সাফল্যের জন্য আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তনের উপর খুব জোর দেন। হীলি বলেন, কেউ হয়তো বলিবেন একজন পুরাতন পাপীকে তাহার অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি দেওয়া খুবই ভাল কিন্তু এ রকম একজন ব্যক্তির পক্ষে শান্ত অবস্থা লাভ করিতে হইলে পরিবেশের সঙ্গে নূতন সম্বন্ধ স্থাপনও (readjustment) বিশেষ প্রয়োজন। সকল মনোবিকলনের পরও যদি রোগীকে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই বাধ্য হইয়া থাকিতে হয় তবে ভাল ফল আশা করা যাইতে পারে না।···আমি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে যদি আমরা উন্নততর সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে না পারি তবে মনোবিকলন পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসায় সামান্যই ফল হইবে।" (W. Healy. Psychoanalysis of older offenders—American Journal of Orthopsychiatry vol. V)

ঠিক এই কারণেই রাশিয়ায় অপরাধ নিবারণের উপায় হিসাবে মনোবিকলনের উপর সামান্য আস্থা রাখা হয়। তাঁহাদের মতে অপরাধ দমনের শ্রেষ্ঠ উপায় ব্যক্তির সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশের উন্নতি। মনোবিকলন পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসা আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত

হইয়াছে। সুতরাং এখন মোটামুটি তাহার মূল্য নিরূপণ করা বোধ হয় সম্ভব। ইহার মধ্যে নীর ও ক্ষীরের প্রভেদ করা প্রয়োজন। তত্ত্বের দিক হইতে মনোবিকারের মূলে অবচেতন মনে দ্বন্দ্ব ও বিশৃংখলা, এই সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে স্বীকার করা যায়। মনোবিকলন পদ্ধতি অভিজ্ঞ সুচিকিৎসক দ্বারা ব্যবহৃত হইলে অবচেতন মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল সন্ধানে অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক। ফ্রয়েডের চিন্তা বর্তমান জটিল যান্ত্রিক যুগের মানুষকে এই পুরাতন সত্যটিই নূতন করিয়া শিখাইয়াছে যে, সরল, স্বাভাবিক, নির্মল শৈশব, শান্ত পরিণত জীবনের নিরাপদ ভিত্তি। কিন্তু মনোবিকলন পদ্ধতি ম্যাজিক বা যাদুমন্ত্র নয়। ইহা একটি গভীর যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইহার সফল ব্যবহার অত্যন্ত কঠিন ও ধৈর্য্যসাপেক্ষ। এ পদ্ধতি নিয়া বহু বহ্বাড়ম্বর দেখা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা বর্তমান, এবং ফ্রয়েডের নামে বহু বুজরুকীও চলিতেছে। গভীর মানসিক বৈকল্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই মানসিক রোগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে অভিজ্ঞ তত্ত্ববিদ্ প্রকৃত বিশেষজ্ঞের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। মনোবিকলন পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসায় সাফল্য সম্পর্কে অতিমাত্রায় আশাবাদী হইবার সময় এখনও আসে নাই। তাই Eyesenck সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "The answer to the question, 'Is psycho-analytic treatment of proven value ?' cannot honestly be anything but, 'Not yet'. Freudian hypotheses such as stressing the role of anxiety in the causation of neurotic symptoms have contributed substantially to modern psychiatric thinking, but the psycho-analytic therapy based on these hypotheses has not yet justified itself in practice.......The psychoanalytic practitioner has yet to make good his claim that his is the only truly scientific system in the case of mental disorders." (H. F. Eyesenck—The Truth about Psycho-analysis, Readers Digest—Jan. 1961)

ডাঃ কার্ল গুষ্টাভ্ য়্যুঙ্গ

বিগত ৬ই জুন, ১৯৬১ সালে, ডাঃ কার্ল গুষ্টাভ্ য়্যুঙ্গ পঁচাশী বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। অবচেতন মন ও মনঃসমীক্ষণের ধারণাকে (the concepts of the Unconscious and Psycho-analysis) যাঁহারা বিজ্ঞানের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডের নাম সর্বাগ্রগণ্য। তাহার পরই তাঁহার অনুগামী ও সহকর্মী দু'জনের নাম করিতে হয়, য়্যুঙ্গ ও অ্যাড্‌লার।

য়্যুঙ্গের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন সুইৎজারল্যাণ্ডের চাষী। য়্যুঙ্গ-এর লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ দেহে পূর্বপুরুষদের সবল দেহের ছাপ পড়িয়াছিল। আর পড়িয়াছিল সে ছাপ, তাঁহার সহজ সরল জীবনযাত্রার অভ্যাসে। হয়ত গভীর ধর্ম বা দর্শন বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতেই পকেট হইতে বড় ফলাওয়ালা ধারালো ছুরি বাহির করিয়া নিপুণ হাতে আপেলের খোসা ছাড়াইয়া শ্রোতাদের দিতেন, নিজেও খাইতেন। কিন্তু অন্যদিকে অগাধ ছিল তাঁহার পাণ্ডিত্য। দর্শন, শিল্প-ইতিহাস, ধর্ম, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, নৃতত্ত্ব, কাব্য, এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহাতে তাঁহার অধিকার ছিল না। তিনি ব্যবহারে অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, রুচিতে সুমার্জিত এবং আলাপে সুরসিক ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাও অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইত। তিনি প্রথম যৌবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানেই নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সেই সূত্রেই তিনি মানসিক বিকারের চিকিৎসা সম্বন্ধে উৎসুক হন, এবং ফ্রয়েডের প্রতিভার সংস্পর্শে আসেন। ১৯০১ সালে ভিয়েনাতে ফ্রয়েডের সঙ্গে যুক্ত হইয়া তিনি ও অ্যাড্‌লার প্রথম মনঃসমীক্ষণ কেন্দ্র (School of Psycho-analysis) স্থাপন করেন।

য়্যুঙ্গ, ফ্রয়েড ও অ্যাড্‌লার

য়্যুঙ্গ, ফ্রয়েড্ ও অ্যাড্‌লারের সঙ্গে একত্র হইয়া গবেষণা করিয়া অবচেতন মনের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, অবচেতন মনের ক্রিয়া ব্যক্তিত্বের এক অসম্পূর্ণ অংশ মাত্র। ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় তাহার অবচেতন মনের অস্পষ্ট ক্রিয়া ও শক্তিতে। এতদিন পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানীরা মানুষের সচেতন মনের বিশ্লেষণেই নিজেদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। ফ্রয়েড্

করে এবং মন.সমীক্ষণের দ্বারা এই অতৃপ্ত অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সচেতন মনে মুক্তি দিতে পারিলেই মনোবিকার আরোগ্য হয়।

ফ্রয়েডের 'সেক্স' প্রাধান্য

অ্যাড্‌লার ও য়্যুঙ্গ দু'জনেই মনে করেন—'সেক্স'কে ফ্রয়েড তাঁহার চিন্তায় অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়াছেন। 'সেক্স' বা কামাকাঙ্ক্ষা জীবনের একটি মৌলিক শক্তি; কিন্তু ইহাই একমাত্র শক্তি নয়। জীবনের সমস্ত চিন্তা, আবেগ ও উদ্যমের পিছনে রহিয়াছে আদিম কাম, এ মত অসম্পূর্ণ, অপরিণত ও একদেশদর্শী। সমস্ত স্বপ্নই কামাকাঙ্ক্ষার তির্যক পরিপূর্তি—এ মতও সম্পূর্ণ সত্য নয়, এবং সমস্ত মানসিক বিকার কেবলমাত্র কামাকাঙ্ক্ষার অবদমনেই ঘটে, এ মতও সমস্যাকে অতিমাত্রায় সরল করিয়া (oversimplification) দেখা এবং একটিমাত্র সূত্র দিয়া সমস্ত সমস্যাকে ব্যাখ্যা করিবার আগ্রহ হইতে সঞ্জাত।

য়্যুঙ্গের প্রথম জীবন

য়্যুঙ্গ প্রথম যৌবনে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য চিকিৎসাবিদ্যার পীঠস্থান ভিয়েনাতে আসেন। এই শাস্ত্র অধ্যয়ন উপলক্ষ্যেই মানসিক বিকার সম্পর্কে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়। সেই সূত্রেই ফ্রয়েডের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। তাঁহার ঔৎসুক্য নানা বিভিন্ন বিষয়ে পরিব্যাপ্ত ছিল এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। তথাপি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে চিকিৎসক (the medicine man) বলিয়া পরিচয় দিতেই ভালবাসিতেন। এবং তিনি মনে করিতেন মানুষের রোগ আরোগ্যের জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করাই চিকিৎসকের পবিত্র কর্তব্য। এ কর্তব্যসম্পাদনে তিনি প্রচলিত ও পরিচিত পথ ত্যাগ করিয়া নূতন পথে চলিতে, নূতন পরীক্ষা করিতে কখনও দ্বিধা করেন নাই। এ জন্য তিনি বহু নিন্দা সহ্য করিয়াছেন, বহু বাধা অতিক্রম করিয়াছেন, বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সহকর্মী বিজ্ঞানবিদদের উপহাস সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু কখনও নিজ স্বাধীন মতামত প্রকাশের ও নূতন পরীক্ষার অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে সম্মত হন নাই।

একদল বিজ্ঞানী আছেন যাঁহারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাহিরে আর কোন সত্যকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক (positivistic and empirical), যাঁহারা নিজেদের বস্তুনিষ্ঠা (matter-of factness) ও কেজো দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্নতা

(pragmatic outlook) সম্বন্ধে গর্ব করেন। 'বেনে' বৃটিশ জাতির মধ্যে এ বিজ্ঞানীদের বিশেষ প্রাধান্য। এ জাতীয় বিজ্ঞানীরা য়্যুঙ্গের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন।

য়্যুঙ্গের অতীন্দ্রিয়বাদ

য়্যুঙ্গ মনে করেন মানুষের সমস্ত প্রকার অভিজ্ঞতাই মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। মানুষের সব অভিজ্ঞতাই বস্তুভিত্তিক নয়। মানুষ বস্তুর সীমা বহির্ভূত অদৃশ্য অরূপলোকে (the nouminous) বিশ্বাস করে, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হয়। সে বিশ্বাস করিতে চায় যে কোন অতীন্দ্রিয় শক্তি মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। য়্যুঙ্গ মানুষের এই অতীন্দ্রিয় সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা, যাহাকে ধর্ম (religion) আখ্যা দেওয়া যায়, তাহাকে কেজো বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের মত হাসিয়া উড়াইয়া দেন নাই। এ বিষয়ে তিনি উইলিয়ম্ জেমসেরই উত্তর সাধক। জেমস্ মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়াছিলেন 'মানুষের, সমগ্র, অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান' the description and explanation of states of consciousness, as such.' মানুষ চোখে দেখে, কানে শোনে, দুঃখ পায়, উদ্যোগী হয়, এ সব যেমন তাহার অভিজ্ঞতার নিদর্শন, তেমনি ভগবৎ বিশ্বাস, অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে প্রত্যয়—ইহাও তাহার অভিজ্ঞতার অঙ্গ। এই প্রকার অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়া মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় মিলিতে পারে না। জেমস ও য়্যুঙ্গ দুজনেরই এ সত্যকে স্বীকারের দুঃসাহস ছিল। Sir Herbert Read লিখিয়াছেন—"The mystic's faith in a living God is just as much a psychological fact as the homing instinct of the pigeon. The psychologist must be prepared to investigate the whole range of mental phenomena and it was Jung's distinction, as it had been James's to face such a task without fear or prejudice.' য়্যুঙ্গ মানুষের অভিজ্ঞতার এই দিককে মর্যাদা দিয়াছেন বলিয়াই তিনি অনেক বিজ্ঞানীর কাছে অপাংক্তেয় হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন যতদিন তিনি ফ্রয়েডের অনুগামী হইয়া স্বপ্ন ও অবচেতন মনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে রত ছিলেন ততদিনই তাহার বিদ্যাবত্তার মূল্য ছিল। কিন্তু ধর্ম, অতীন্দ্রিয়বাদ ইত্যাদিকে স্বীকৃতি দিয়া তিনি বৈজ্ঞানিকদের মর্যাদাহানি করিয়াছেন।

ফেলিয়া রোগিণী আরাম বোধ করে। ইহা হইতে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে সম্মোহন প্রণালী রোগীর অবচেতন মনের রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষাকে সচেতন মনে আনিয়া মুক্তি দেয় এবং তাহার ফলেই মানসিক রোগ নিরাময় হয়; সুতরাং, এটা তাঁহারা বুঝিলেন সম্মোহন প্রণালীর মধ্যে রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা নিহিত নাই। কোন উপায়ে অবরুদ্ধ অবচেতন আকাঙ্ক্ষাকে মুক্তি দিতে পারিলেই মানসিক দ্বন্দ্ব ও অশান্তি দূরীভূত হয়।

মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণালী

বহু পরীক্ষার পর অ্যাড্‌লার ও য়ুঙ্গের ও অন্যান্য অনুগামীদের সহায়তায় ফ্রয়েড্ মানসিক রোগ চিকিৎসায় মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণালী (Free Association Method) আবিষ্কার করিলেন। এ প্রণালীতে রোগীকে সম্মোহিত করা হয় না। তাহার পরিবর্তে রোগীকে কৌচে আরামে শোয়াইয়া যখন মন তাহার শান্ত বোধ করে, তখন চিকিৎসক তাহার সঙ্গে বন্ধুভাবে কথা বলিতে সুরু করেন। রোগীর মনে যে কথা, যে ভাব, যেমনভাবে আসে তাহা যত অর্থহীন, অসঙ্গত, তুচ্ছ, হাস্যকর বা অশ্লীল হউক না কেন তাহা অনর্গল বলিয়া যাইতে উৎসাহ দেওয়া হয়। এই এক কথা হইতে অন্য কথার অনুসঙ্গের সূত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর অবচেতন মনে গোপন দ্বন্দ্ব বা গ্রন্থির ইঙ্গিত পান। এখানেও তিনি দেখিতে পান রোগীর অবচেতন মনের গভীরে কোন নিষিদ্ধ আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, যাহা তাহাকে লজ্জা দেয়, যাহা সে নিজেব কাছেও স্বীকার করিতে লজ্জা পায়। এরূপ আকাঙ্ক্ষার সচেতন মনে আত্মপ্রকাশের পথে বিষম বাধা। অনুসঙ্গ প্রণালী সার্থকভাবে ব্যবহৃত হইলে রোগী অসতর্ক মুহূর্তে নিজ গোপন আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিয়া ফেলে। এবং সহৃদয় ও বিচক্ষণ চিকিৎসকের সহায়তায় রোগী নিজ মানসিক অশান্তির মূল কি তাহা বুঝিতে পারিয়া নিজ বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা যখন তাহার নিজ সমগ্র জীবনের সঙ্গে তাহার একটা বোঝাপড়ার সম্বন্ধ স্থাপন করে, তখনই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়। ফ্রয়েড্‌পন্থীরা এই প্রণালীকে বলিয়াছেন রেচন বা catharsis। দুষ্টব্রণ যেমন ভিতরের বিষাক্ত পুঁজ রক্ত ইত্যাদি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিলেই আরোগ্য হয়, তেমনি মনের গভীরে যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বিষক্রিয়া করিতেছিল, মনঃ-সমীক্ষণের (Psycho-analysis) দ্বারা মুক্ত অনুসঙ্গ প্রণালী ব্যবহারের মাধ্যমে তাহা সচেতন জীবনে মুক্তি পাইয়া ব্যক্তিকে সুস্থ করিয়া তোলে।

ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি

অবচেতন মনের গুরুত্ব স্বীকৃতি, অবদমনের ফলে অবচেতন মনে দ্বন্দ্ব ও জটিল গ্রন্থির (Complex) সৃষ্টি, মুক্ত অনুসঙ্গপ্রণালীভিত্তিক মনঃসমীক্ষণ রূপ চিকিৎসা পদ্ধতি, এই কয়টি ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তিস্থাপন এবং এ ভিত্তির উপর যে বিরাট সৌধ গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহা ফ্রয়েডের একক চেষ্টায় হয় নাই। এই ভিত্তিস্থাপন ও সৌধনির্মাণে এ্যাড্লার ও য়্যুঙ্গের অবদান সামান্য নয়। কিন্তু এই দুই প্রতিভাধর ছাত্র চিরকাল ফ্রয়েডের ছত্রচ্ছায়ায় থাকিতে সম্মত হইলেন না। অনেক বিষয়ে তাঁহারা অগ্রজ ফ্রয়েডের সহিত একমত হইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহাদের নিজ নিজ পরীক্ষার ফল ও স্বাধীন চিন্তা দ্বারা লব্ধ সিদ্ধান্ত কোন কোন বিষয়ে ফ্রয়েডের মতের বিরোধী ছিল। ক্রমশঃই তাঁহারা ফ্রয়েডের চিন্তাধারা হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার গবেষণাকেন্দ্র ত্যাগ করিয়া নিজেরা স্বাধীন গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে কোন কোন বিষয়ে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

ফ্রয়েডের সহিত মতানৈক্য

ইহাতে গুরু শিষ্যের পূর্বতন মধুর সম্বন্ধটি নষ্ট হইল এবং পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক ও সত্যসন্ধ মনীষা কিন্তু তাঁহার অনুগামীদের স্বাধীন চিন্তার দাবীকে খুব শান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। তিনি তাঁহার শিষ্যদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের দাবীকে ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে করিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রকাশ্যভাবেই তাঁহার পূর্বতন অনুগামীদের নিন্দা করিয়া বসিলেন।

যে প্রধান দুটি বিষয়ে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত তাঁহার অনুগামীদের সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল তাহা হইল:- (১) সমস্ত জীবনের মূল শক্তি হইল কাম বা সেক্স। মানুষের সমস্ত উদ্যম, আকাঙ্ক্ষা ও কর্মশক্তির মূলে রহিয়াছে আদিম কাম (libido)। এমন কি দেশপ্রেম, দর্শন, অধ্যাত্মচিন্তা, সমাজসেবা— সবই মূলতঃ কামাকাঙ্ক্ষারই পরিমার্জিত রূপ। মানুষের নীতিবুদ্ধি তাহার যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করিয়া অবচেতন মনে নির্বাসন দেয় তাহা সমস্তই কামজ। স্বপ্ন এই গোপন কামাকাঙ্ক্ষার তির্যক পরিতৃপ্তির প্রয়াস। সমস্ত মানসিক বিকারের মূলে রহিয়াছে কামাকাঙ্ক্ষার অবদমন। (২) শৈশবের অতৃপ্ত ও অবদমিত আকাঙ্ক্ষাই অবচেতন মনে দ্বন্দ্ব ও জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি

ও তাঁহার সহকর্মীরা নূতন পথে মানুষের মনের রহস্য আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বহু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন আমরা অনেক সময় অনেক কাজ করি বা ভুল করি, যাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেক অদ্ভুত বাতিক, অনর্থক ভয় বা আকর্ষণ আমাদের মনের কোণে বাসা বাঁধে। আমাদের সচেতন জীবনে ইহাদের কোন ব্যাখ্যা মিলে না। ফ্রয়েড্‌পন্থীরা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন, প্রত্যেক মানুষের সচেতন মনের অন্তরালে বিরাট অন্ধশক্তি ক্রিয়া করে। বাস্তবিকপক্ষে এই অন্ধশক্তিই আমাদের সচেতন মনকে চালিত করে। মেরু প্রদেশের ভাসমান বরফস্তূপের (iceberg) সামান্য মাত্র অংশই জলের উপর ভাসে, কিন্তু তাহার বৃহত্তর অংশই গভীর সমুদ্রজলে নিমগ্ন। তেমনি মানুষের মনের ক্ষুদ্র ভাগ মাত্র চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত, কিন্তু ইহার বৃহত্তর অংশই অবচেতনার অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত। মনের এই বিরাট অন্ধকার রাজ্যের রহস্যভেদে ইহারা আত্মনিয়োগ করিলেন।

মনের বিকারের কারণ

দীর্ঘকালব্যাপী ভূয়োদর্শনের ফলে ইহারা এই সিদ্ধান্তে পৌছিলেন যে, মানুষের মনে অনেক আকাঙ্ক্ষা জাগে, যাহা সামাজিক বিচারে নিন্দার্হ। প্রত্যেক মানুষের মনেই সামাজিক নীতিবুদ্ধির শাসন (censor) ক্রিয়া করে। সুতরাং তাহার মনের সমাজনিন্দিত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে মানুষ সচেতন মনে আত্মপ্রকাশে বাধা দেয়। ইহাকে ফ্রয়েড্‌পন্থীরা বলিযাছেন অবদমন (suppression)। এই ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাগুলি মানুষের সচেতন মনে ঠাঁই না পাইয়া অবচেতনার আঁধার গুহায় শৃঙ্খলিত হইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে। কিন্তু এই আদিম কামের শক্তি প্রচণ্ড ও প্রবল। সুতরাং ইহারা শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া আত্মপ্রকাশের জন্য সতত চেষ্টিত। তাই ব্যক্তির মনোজগতে দ্বন্দ্ব ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্ব ও অশান্তিই সমস্ত মনোবিকারের মূল কারণ। অবচেতন মনে শৃঙ্খলিত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির একটি সহজ উপায়, স্বপ্ন। ১৮৯২ সালের কাছাকাছি ফ্রয়েড্‌ আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে অবচেতন মনের সন্ধান পাওয়ার একটি অত্যন্ত উর্বর ক্ষেত্র হইতেছে স্বপ্ন।

স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

১৯০০ সালে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Interpretation of Dreams-এ ফ্রয়েড্‌ অবচেতন মনের সাহায্যে স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন। ইহা ফ্রয়েডের

বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। ফ্রয়েড্ বহু সহস্র ব্যক্তির স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া ইহা বুঝিতে পারিলেন যে স্বপ্ন নিরর্থক নয়, ইহার মধ্য দিয়া ব্যক্তির কোন না কোন গোপন ইচ্ছা পরিপূরিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ইচ্ছাপূরণ তির্যকভাবে কতকগুলি প্রতীক (symbols) সাহায্যে ঘটে ; কতকগুলি ছবি বা অবস্থা অনেক স্বপ্নেই দেখা যায় (যেমন, নদীর স্বপ্ন, মোটরগাড়ী চড়ার স্বপ্ন, বাক্স ভাঙ্গার স্বপ্ন, গর্তে সাপ ঢোকার স্বপ্ন ইত্যাদি)। ফ্রয়েড্ এ সমস্ত স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও কারণ অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চিতই বুঝিতে পারিলেন যে, অধিকাংশ স্বপ্নের দৃষ্ট বস্তু বা অবস্থা আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য বা ক্রিয়ার বিকল্প। কখনো কখনো অবশ্য স্বপ্নে সোজাসুজি ভাবেই আকাঙ্ক্ষাপূরণ হয়। যেমন, পেটরোগা শিশু ইলিশমাছ খাবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু বয়স্কদের স্বপ্নে সাধারণতঃ ইহা ঘটে না ; সেখানে প্রতীকের সাহায্যে ইচ্ছাপূরণ (wishtulfilment) হয়। এই লুকোচুরি কেন ? ফ্রয়েড্ ও তাঁহার অনুগামীরা মনে করেন, স্বপ্নের মধ্য দিয়া ব্যক্তির অবদমিত যে ইচ্ছাগুলির পরিপূরণের চেষ্টা হয় সেগুলি সমাজবিরুদ্ধ ও নিন্দিত। তাই ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক নীতিবুদ্ধি (Super E o) তাহাদের পরিপূরণে বাধা দেয়। ঘুমের মধ্যে এই নীতিবুদ্ধির শাসন (Cens rship) শিথিল হইলেও তাহা সম্পূর্ণ অপসারিত হয় না। সেই জন্যই অবদমিত ইচ্ছাগুলি সহজ ও সোজাসুজিভাবে পরিপূরিত হইতে পারে না, প্রতীকের বাঁকা পথ তাহাদের ধরিতে হয়। অবদমিত ইচ্ছাগুলিকে সচেতন মনে আনিয়া মুক্তি দিতে পারিলে এবং ব্যক্তির সমগ্র বুদ্ধি ক্রিয়া ও আদর্শের সঙ্গে তাহাদের সুসঙ্গত বোঝাপড়া হইলেই ব্যক্তি মানসিক সুস্থতা লাভ করে। কি করিয়া ইহা করা যাইতে পারে ? ফ্রয়েডের পূর্বে তাঁহার শিক্ষক শারকোঁ (Charcot) ও তাঁহার সহকর্মী ব্রয়ার (Breuer) সম্মোহন প্রণালী (hypnosis) দ্বারা হিষ্টিরিয়া রোগীদের চিকিৎসায় সুফল পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ প্রণালীর অনেক অসুবিধা ছিল। তাছাড়া ফ্রয়েড, কেন হিষ্টিরিয়া রোগ সম্মোহন প্রণালীর দ্বারা আরোগ্য হয়, এই 'কেন ?'র বিজ্ঞানসম্মত সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এ প্রণালী যান্ত্রিকভাবে ব্যবহারে উৎসাহ বোধ করিতেন না। ফ্রয়েড্ ও তাঁহার অনুগামীরা এই প্রশ্নের জবাব খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন যে সম্মোহিতাবস্থায় রোগিণী তাহার অতীত জীবনের অনেক বিস্মৃত কাহিনী বা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার কথা বলে—যাহার সম্বন্ধে পূর্বে সে একেবারেই সচেতন ছিল না এবং এ রকম কথা সম্মোহিত অবস্থায় বলিয়া

য়ু্যঙ্গের মনোবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

য়ুাঙ্গের Analytic Paychology অবচেতন মনোবিজ্ঞান বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ। তিনি কামের শক্তিকে অস্বীকার করেন নাই কিন্তু ইহাকেই মানুষের সমস্ত শক্তির উৎসব বলিয়া স্বীকার করেন নাই ; শিশুর জীবনে কামাকাঙ্ক্ষা ও তাহার অতৃপ্তি সম্পর্কে তিনি ফ্রয়েডের মত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন না। শিশুর জীবনের অতৃপ্ত কামাজ্ঞার অবদমন, এবং তজ্জনিত সমস্ত দ্বন্দ্বই পরিণত জীবনে সমগ্র মানসিক বিকারের মূল, এ কথা য়ুাঙ্গ স্বীকার করেন না। বয়স্ক মানুষের মানসিক অশান্তি ও রুগ্নতার কারণ বুঝিতে গেলে কেবলমাত্র শৈশবের অভিজ্ঞতার পশ্চাদ্ধাবন করিলে সুফল পাওয়া যাইবে না। য়ুাঙ্গের মতে বয়স্ক মানুষের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে অসঙ্গতিই (maladjustment to present circumstances) বহু ক্ষেত্রে তাহার মানসিক অশান্তির কারণ। ব্যক্তি কোন কারণে তাহার বর্তমান সমস্যা সমাধানে অসমর্থ হয় বলিয়াই নিজেকে বিপন্ন ও অসহায় মনে করে। তাহার অস্বাভাবিক দুশ্চিন্তার (morbid anxiety) কারণ এই যে, সে তাহার বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে অতিরিক্ত বড় করিয়া দেখে এবং শান্তভাবে বিচারের ক্ষমতা হারায় বলিয়াই সে নিজের শক্তিতে আস্থাহীন হইয়া পড়ে। কখনও বাহিরের প্রতিকূলতা বাস্তবিকই দুর্লঙ্ঘ্য হইতে পারে। এ অবস্থায় তাহার মানসিক বিকারের মূল শৈশবের বিস্মৃত ও অতৃপ্ত কোন কামাকাঙ্ক্ষার মধ্যে খুঁজিতে গেলে, বাস্তবিক পক্ষে রোগীকে নিরাময় করিবার পথ পাওয়া যাইবে না। য়ুাঙ্গের এ মত সাধারণ বুদ্ধিতে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

মানুষের মনোবৃত্তি মূলক শ্রেণী বিভাগ

য়ুাঙ্গ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাহার Psychological types মতবাদ দ্বারা। তিনি বলেন, মানুষ সাধারণতঃ দুই জাতের ;—এক দল মানুষ হইতেছে বহির্মুখী, সামাজিক, কর্মকুশল, বস্তুনিষ্ঠ। ইহারা বাহিরের কাজ করিতে ভালবাসে, খেলাধুলা পছন্দ করে, মানুষের সঙ্গে মিশিবার কুশলতা ইহাদের আছে, কলকারখানার কাজে ইহাদের যথেষ্ট উৎসাহ। য়ুাঙ্গ ইহাদের বলিয়াছেন Extroverts। ইহারা হইল ইঞ্জিনীয়ার, সৈনিক, সমাজ সংস্কারকের দল। আর একদল আছে তাহারা আত্মকেন্দ্রিক, চিন্তাশীল, অন্তর্মুখী আবেগপ্রবণ, অভিমানী। ইহারা আত্মবিশ্লেষণে পটু, অসামাজিক, ধর্ম দর্শন ইত্যাদি আলোচনায় ইহারা আনন্দ পায়। বহির্জগৎ সম্বন্ধে ইহাদের আগ্রহ

কম, মানুষের সঙ্গে ইহারা ভাল করিয়া মিশিতে পারে না. ইহাদের কর্মের পরিধি সংকীর্ণ। ইহারা হইল ছাপোষা, নিবিবোধী, শান্ত, পণ্ডিত, দার্শনিক, ধর্মভীরু মানুষের দল। ইহারা নিজের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখে। য়্যুঙ্গ ইহাদের বলিয়াছেন Introverts। অবশ্য এমন মানুষ খুব কম আছে যাহারা সম্পূর্ণই Extrovert বা Introvert। অধিকাংশ মানুষই হইতেছে এই দুই দলের মিশ্রণ বা Ambiverts! য়্যুঙ্গ মনে করেন ফ্রয়েড্ ও অ্যাড্লার এই দুই বিপরীত দলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। য়্যুঙ্গ চাহিয়াছেন তাঁহার Analytic Psychologyতে এই দুই type চরিত্রের সমন্বয়। য়্যুঙ্গের মতে যে ব্যক্তি সচেতন ভাবে Extrovert সেই আবার অবচেতন মনে Introvert; আবার যাহার সচেতন মন Introvert-এর দলে, তাহার অবচেতন মনের গতি হইতেছে Extrovert-এর দিকে। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া Extroverts ও Introverts-এ দুটি Attitude type। আবার ক্রিয়ার দিক দিয়া য়্যুঙ্গ চারিটি Function type এর কথা বলিয়াছেন। ইহারা হইতেছে Thinking type, Feeling type, Sensation type ও Intuition type। য়্যুঙ্গের মতে Kant হইতেছেন, Introvert thinking type। আবার Darwinও thinking type, কিন্তু Extrovert। Feeling type-এর মানুষেরা যুক্তির চেয়ে আবেগের দ্বারা চালিত হয়। যখন এঁরা introvert তখন এঁদের আবেগ তীব্র ও গভীর, আর যখন Extrovert তখন তাঁহারা (সাধারণতঃ স্ত্রীলোক) স্ত্রীসুলভ যুক্তি বুদ্ধি দ্বারা চালিত Introvert Sensation type-এর উদাহরণ হইতেছেন চারুশিল্পীরা। তাঁহারা বাহিরের জগতের রূপকে সযত্নে লক্ষ্য করেন, কিন্তু এই রূপকে দেখেন, নিজের মনের ইঙ্গিতময়তার মধ্য দিয়া। আর গ্রাম্য ক্ষেত-খামার সম্পন্ন চাষী ভদ্রলোক (the country squire) তাহার অঞ্চলের দৃশ্য, উৎপাদন, ঘরবাড়ী, ভেড়া, মুরগীর পালকে দেখেন সাদা কেজো চোখে। ইনি হইতেছেন Extrovert Sensation type। সর্বশেষে অতীন্দ্রিয়বাদী, সূক্ষ্মভাব-সম্পন্ন Blace হইতেছেন Introvert Intuition type-এর উদাহরণ। আর Loyd George,—যাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, যুদ্ধের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন সম্পর্কে আশ্চর্য দূরদৃষ্টি ছিল এবং যিনি ছিলেন কুশলী রাজনীতিক এবং অবস্থার সঙ্গে নিজেকে অদ্ভুত মানাইয়া চলিতে পারিতেন—তাহাকে বলা যাইবে Extrovert Intuition type। মানুষকে এরকম কয়েকটি পরিচ্ছন্ন type-এ ভাগ করার মধ্যে মনে একটা

ও বৈশিষ্ট্য যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর এ মতবাদ স্থান পেয়েছে তথাপি এটাই তার শিক্ষানীতির প্রধান অংশ নয়। মন নরম কাদার মত কিন্তু উপযুক্ত শাসন (discipline) এবং অভ্যাস গঠনের দ্বারাই তাকে শিক্ষার উপযুক্ত পাত্র হিসাবে গঠন করে তুলতে হবে। কিন্তু তাঁর শিক্ষাদর্শে বুদ্ধির চর্চা বা বুদ্ধির সু-অভ্যাস গঠনটি গৌণ স্থান অধিকার করেছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র মানুষটিরই বিকাশ। তার মধ্যে প্রধান স্থান নৈতিক বিকাশের। তার পরিপূরক হিসাবে তৎপরে চাই দেহের ও মনের বিকাশ।[১] এটা আপনা আপনি ঘটে না—উপযুক্ত ডিসিপ্লিন ছাড়া এটি হতে পারে না। তাই তাঁর শিক্ষাদর্শ পরবর্তীকালের শাসনশৃঙ্খলাবাদ (disciplinarianism), আকারগত শিক্ষাবাদ (Formal Training) বা শিক্ষায় সংক্রমণবাদের (transfer of training) ভিত্তি বলা হয়। মনরো বলেছেন একটি মূল কথা যে জন্যে লক্‌কে শাসন শৃঙ্খলার সম্পূর্ণ সমর্থক বলা হয়—তা হচ্ছে, লকের এই ধারণা যে মন প্রথমাবস্থায় সম্পূর্ণ সাদা (a mere blank to begin with) থাকে, এবং তার ধর্ম, ও শক্তি বাইরের চেষ্টা দ্বারাই অভ্যাস গঠনের মধ্যে দিয়ে বিকশিত করতে হয়।"[২]

জন্‌ লক্‌ই 'ফর্মাল ডিসিপ্লিন' মতবাদের জনক কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। এবি (Eby) এবং এরোউড্‌ (Arrowood) বহু যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে লক্‌ এই মতবাদের প্রবর্তকও নন, তিনি এর সমর্থকও নন। বাস্তবিক পরবর্তী কালে ডিসিপ্লিনবাদীরা এ মতবাদ নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছেন সেটা লকের সমর্থন নিশ্চয়ই পেতো না, কারণ তার মধ্যে একটা সংকীর্ণ অন্ধতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা ছিল। তবে সত্য কথা বোধ হয় এই যে, লকের মত বহুমুখী প্রতিভার বহু ধারণা এই মতবাদের কোন কোন দিকের পরিপোষক; কিন্তু এটা বলতেই হবে যে, ফর্মাল ডিসিপ্লিনের নামে পরবর্তী অনেক লেখক যে হাস্যকর বাড়াবাড়ি করেছেন তিনি তার জন্য দায়ী নন।[৩]

এই ফর্মাল ডিসিপ্লিন মতবাদ কি? এই মতে—কি কি বিষয় ছাত্ররা শিখছে তার উপর জোর না দিয়ে কি পদ্ধতিতে তারা শিখছে সেটার উপর

১ E. H. Wilds—Foundations of Modern Education P. 361

২ Paul Monroe—Brief Course in the History of Education, P. 361.

৩ E. A. Wilds—Foundations of Modern Education P. 360.

জোর দেওয়া দরকার। অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন বিষয় ছাত্রদের গলাধঃকরণ করিয়ে দিলেই তাদের শিক্ষা হয় না। অল্প কয়েকটি বিষয় যা মনের ধারণা-শক্তি, বিচার বুদ্ধি সংযম ও শৃঙ্খলাবোধ পুষ্ট করতে পারে তাই শেখানোই দরকার। মন কতগুলি বিচ্ছিন্ন শক্তি যেমন, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ইত্যাদির সমষ্টি মাত্র (faculty psychology)। এগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে প্রাচীন ল্যাটিন গ্রীক ইত্যাদি ভাষার জটিল ব্যাকরণ, এবং অঙ্ক, তর্কবিদ্যা—ইত্যাদি শাস্ত্র। দেহের শক্তিগুলি সেই রকম কতকগুলি নির্দিষ্ট ব্যায়াম ও কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারাই পুষ্ট হয়। এই মতবাদের সমর্থকরা বলেন এখানে প্রধান উদ্দেশ্য ল্যাটিন, গ্রীক বা অঙ্ক শেখানো নয়। কিন্তু ব্যাকরণের নীরস ও কঠোর নিয়ম চঞ্চল মনকে সংযত করে, অঙ্ক ও তর্কশাস্ত্রে বিচার বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। শিশুকাল এই ডিসিপ্লিনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠলে ভবিষ্যতে শিশুরা দেহে মনে চরিত্রে সংযত, প্রকৃত শক্তিশালী মানুষ হয়ে উঠবে। ল্যাটিন শিখলে জীবনের আশু প্রয়োজনে তা কাজে লাগবে না কিন্তু মনের অভ্যাস, সুশৃঙ্খল চিন্তার অভ্যাস তৈরী হবে।[৪] এ মতবাদের গভীর প্রভাবে ইয়োরোপের পাঠ্যতালিকা এবং শিক্ষণ পদ্ধতি সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই এমন অনড় হয়ে ওঠে যে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ল্যাটিন, গ্রীক গ্রামারের দৌরাত্ম্য বহু শিশুর বিদ্যালয় জীবনকে বিষাক্ত ও নিরানন্দ করে রেখেছিল। এই ডিসিপ্লিনবাদীরা এরকম ধারণা করেছিলেন যে শিশুর স্মৃতি, বুদ্ধি ইত্যাদির বিকাশের জন্য শিশুর নিজস্ব আগ্রহ ও সামর্থ্যের বিষয় বিবেচনা করবার দরকার নেই। কঠিন ও নীরস ল্যাটিন, গ্রীক পাঠ নিয়মিত কণ্ঠস্থ করলেই তার স্মৃতিশক্তি বেড়ে যাবে। তেমনি করে অঙ্কের জটিল প্রক্রিয়াগুলি যদি শিশুকে আয়ত্ত করিয়ে দেওয়া যায় তা হলেই তার ধারণাশক্তি সর্বদিকে বেড়ে যাবে। তার থেকে তারা প্রায় এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে যে বিষয় যত নীরস ও দুর্বোধ্য ডিসিপ্লিনের ভিত্তি হিসাবে তার মূল্য তত বেশী।

সেই সপ্তদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন গ্রীকের ডিসিপ্লিন মাহাত্ম্য উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্বীকৃত ছিল। ১৬৪০ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলে এই দুই ভাষার সাহিত্য ও ব্যাকরণের নিয়ম কণ্ঠস্থ রাখা অপরিহার্য ছিল। এমন কি, ইংল্যাণ্ডেও ১৮৫০ সাল পর্যন্ত অক্সফোর্ডে এবং ক্যামব্রিজে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য যে পরীক্ষা হত তাতে যে বিষয়গুলি

ফিরিয়া আসা (আত্মস্থ হওয়া) মঙ্গলগ্রহে যাওয়া অপেক্ষা অনেক বেশী কঠিন। কিন্তু মানুষ যদি নিজেকে আবিষ্কার না করে, নিজের নীড়ে ফিরিয়া না আসে তবে সে সকলের চেয়ে নিজের বেশী বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে সে মানুষের সম্পূর্ণ ধ্বংসের আয়োজন করিতেছে।" ইহা কি যোগদর্শনেরই প্রতিধ্বনি নয়? মানব সভ্যতার এই বিষম আসন্ন বিপদ তিনি যেন প্রত্যক্ষ করিতেন। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে তিনি বর্তমান শিল্প ও সাহিত্যের তুচ্ছতা লক্ষ্য করিতেন। মানবজাতির এই ঘোর দুর্দিনে শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক নিজ নিজ মহান্ কর্তব্যভ্রষ্ট হইয়াছেন। তিনি জানিতেন তাঁহার আজীবন সাধনার ধন তথাকথিত চিন্তাশীল মানুষেরা উপেক্ষার বস্তু বলিয়াই মনে করেন। তবুও তিনি বিশ্বাস হারান নাই, তিনি এই অসংশয় প্রত্যয়ে অবিচলিত ছিলেন যে সত্যের পরাজয় নাই—তাহার মৃত্যু নাই। তাঁহার গৃহদ্বারের শীর্ষে ল্যাটিন ভাষায় এই কথাটি লিখিত আছে "Whether or not you think about God, He is always present."

* যে সব পুস্তক ও প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

1. C. G. Jung—Analytical Psychology.
2. Flugel's—100 years of Psychology.
3. Sir Herbert Read—The achievement of Dr. Jung
4. Migrol Serrane—A last meeting with Jung

Tr. by Frank Macshane.

শাসন শৃঙ্খলাবাদের প্রতিনিধি শিক্ষাব্রতী জন লক্

প্রত্যেক জাতির একটি বিশিষ্ট প্রতিভা আছে তা সেই জাতির ধারণা ও আদর্শে প্রতিফলিত হয়। ফরাসী জাতি চঞ্চল, তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদ দ্বারা প্রাচীন আচার ও বিশ্বাসকে আঘাত করায় তার প্রতিভার বিস্ফুরণ। ফরাসী বিপ্লব তাই আকস্মিক ঘটনা নয়—ফরাসী প্রকৃষ্ট প্রতিনিধি হচ্ছেন জাঁ জ্যাক্‌য়া রুশো। তিনি প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিকে অস্বীকার ক'রে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। শিক্ষকেব কঠোর ও নির্মম শাসন থেকে তিনি চঞ্চল, আগ্রহী শিশুমনকে মুক্তি দেবার কথা বলেছিলেন।

অন্যদিকে ইংরেজ রক্ষণশীল বণিক জাতি। তারা প্রাচীন পন্থাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। তাদের কাছে তাই প্রাচীন ধ্রুব আদর্শের প্রতি আনুগত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান গুণ। তারা কড়া ডিসিপ্লিনে অভ্যস্ত ও বিশ্বাসী। তা ছাড়া বিশুদ্ধ যুক্তির চেয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দাম তাদের কাছে বেশী। হিসাবী ও বণিক ইংরেজ সাধারণ বুদ্ধির উপর আস্থা স্থাপন করতে ভালবাসে। তাই ইংরেজ জাতির মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রচারক কম। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই সাহসী পথিকৃতের সংখ্যা ইংরেজদের মধ্যে বেশী নেই। ইংরেজ চরিত্রের যোগ্য প্রতিনিধি জন্ লক্ (১৫৩২-১৭০৪)।

দার্শনিক হিসাবে লকের প্রত্যক্ষ দর্শনবাদ প্রসিদ্ধ। ফরাসী দেকার্তে বলেছিলেন মনের মধ্যে জন্মাবধি কতগুলি ধারণা অন্তর্নিহিত থাকে (Innate ideas)। এ সমস্ত ধারণা কোন পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল নয়। এই অন্তর্নিহিত ধারণাগুলি (যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বহির্জগতের অস্তিত্ব, কার্যকারণ সম্বন্ধ) বীজ হিসাবে জন্মকালেই মনের মধ্যে প্রোথিত থাকে। এই ধারণাগুলিই পরবর্তী সমস্ত সত্য জ্ঞানের মূল। লক্ এই মতবাদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বললেন জন্মকালে শিশু কোন ধারণা নিয়ে জন্মায় না! তার মন তখন সাদা শ্লেটের মত, তাতে কোন দাগ পড়েনি (tabula rasa)। কিন্তু শিশুকাল থেকেই অভিজ্ঞতার আঁচড় পড়তে থাকে সেই মনের শ্লেটে। সেই অভিজ্ঞতার সময় মন বিভিন্নভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে ব্যক্তির জ্ঞান ভাণ্ডারে পরিণত করে। এই মত তার দার্শনিক প্রত্যক্ষবাদের (empiricism) ভিত্তি

তৃপ্তি আছে। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র এতই বিচিত্র যে আটটি কোন, চৌষট্টি type-এ ভাগ করিয়াও কূল পাওয়া যায় না।

মগ্ন চৈতন্য সম্বন্ধে য়ুঙ্গের মত

মগ্ন চৈতন্য বা Unconscious সম্বন্ধে য়ুঙ্গের মত ফ্রয়েডের মত হইতে অনেক বেশী ব্যাপক ও গভীর। ফ্রয়েড্ ব্যক্তির অবচেতন মনের বিস্তার নিরূপণ করিতেই চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু য়ুঙ্গ-এর মতে ব্যক্তি পরস্পরবিচ্ছিন্ন একক নয়, ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পব অবিচ্ছিন্ন অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে যুক্ত। ব্যক্তি ও সমাজের শুভাশুভ অবিচ্ছিন্ন। ইহা শুধু সচেতন মনোজগতেই সত্য নয়। আমাদের চিন্তা ও ইচ্ছা পরস্পরকে প্রভাবিত করে। কিন্তু য়ুঙ্গের মতে আমাদের অবচেতন মনও পরস্পরকে স্পর্শ করে, প্রভাবিত করে। আমাদের চিন্তামানসের দিক দিয়া আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে ঋণী, এবং আমরা পরস্পর পরস্পরের সন্তান। তাঁহার দৃঢ বিশ্বাস, যেমন ব্যক্তিগত অবচেতনা আছে, তেমনি আছে বিশ্বব্যাপী সমষ্টিগত মগ্নচৈতন্য (The Collective Unconscious), অবশ্য তাঁহার এই মতকে বহু বিজ্ঞানী নিতান্ত যুক্তিহীন ও অবাস্তব কল্পনা বলিয়াই উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু য়ুঙ্গ দাবী করেন যে তাঁহার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই যে তিনি বিজ্ঞানী এবং সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন।

য়ুঙ্গের উপর ভারতীয় প্রভাব

য়ুঙ্গ ভারতবর্ষে অল্প কিছুদিনের জন্য আসিয়াছিলেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ইহা অনুমান করা অন্যায় হইবে না যে. ভারতীয় ভাবধারা তাহার চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। একটি সামান্য বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি, তাহাতে আমাদের এই অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হইবে: তাহার জুরিখের বাসভবনে যে ঘরে বসিয়া তিনি. কাজ করিতেন, সেখানে যে কয়টি ছবি টাঙানো আছে, তাহার মধ্যে একটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—তাহা হইতেছে কৈলাস-শিখরে ধ্যানমগ্ন শিবের প্রতিমূর্তি।

কিন্তু এহ বাহ্য। আমাদের অনুমানের সম্পর্কে প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যে তিনি পরলোক ও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী। একদা তাঁহাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি ইহা হয় যে মন, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী হইতে পৃথকভাবে ক্রিয়া করিতে পারে, তাহা হইলে ইহা দেশ ও কালের সীমা

অতিক্রম করিতে পারে এবং যাহা দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করিতে পারে, তাহা অজয় অমর।" কিন্তু মন দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রিয়া করিতে পারে কি? উত্তরে তিনি বলিলেন—"যুদ্ধের সময় আমি অনেক সৈন্য দেখিয়াছি, যাহাদের মস্তিষ্কে গুলি প্রবেশ করাতে সমস্ত স্নায়ুকেন্দ্র বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাহাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়া অসাড় হইয়া গিয়াছে, তাহারাও কিন্তু স্বপ্ন দেখিত এবং পরে সে স্বপ্নের স্মৃতিও তাহাদের থাকিত। নিতান্ত ছোট শিশু, যাহাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র এবং যাহাদের পরস্পরের সংযোগসূত্র পরিণতি লাভ করে না, তাহারাও অত্যন্ত স্পষ্ট স্বপ্ন দেখে এবং সে স্বপ্ন তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে পরিণতি লাভ করে। আমাদের দেহের অহংই সব নয়, তাহারও অতিরিক্ত কোন সত্তা আছে, যাহা স্বপ্ন দেখে।" প্রশ্ন হইল: তবে কি আপনি হিন্দু দার্শনিকদের মত বিশ্বাস করেন যে এই স্থূল দেহের অতিরিক্ত সূক্ষ্ম 'লিঙ্গদেহ' আছে, যাহা অ-জড় জগতের সঙ্গে যুক্ত এবং যাহা মৃত্যুকালে স্থূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়? উত্তরে তিনি বলিলেন—"তাহা আমি জানি না। তবে এই জড় জগৎ হইতে অতিরিক্ত অন্য সত্তা আছে, আমি ইহা মানি। আমি দেখিয়াছি, যেখানে কোন জড় বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না, সেখানে (যোগ প্রভাবে) জড়বস্তু রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমি দেখিয়াছি, (যোগীরা) দূরে অবস্থিত দ্রব্যকে হস্ত বা অন্য কিছু দ্বারা স্পর্শ না করিয়াও অন্য স্থানে নিতে পারেন।"

পরিণত জীবনের বিশ্বাস

পরিণত জীবনে তিনি ধর্ম ও সাহিত্য নিয়া গভীর আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার মতে ধর্মগুরু এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা মানুষকে অতীন্দ্রিয় জগতের ইঙ্গিত দিয়া তাহার প্রকৃত আত্মোপলব্ধির সহায়ক হন। শুধু জড়বিজ্ঞান কখনোই মানুষকে সম্পূর্ণ শান্তি এমন কি সম্পূর্ণ সাংসারিক সুখ আনিয়া দিতে পারিবে না। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ চন্দ্র বা মঙ্গলগ্রহে হানা দিতে পারে—তাহার দৈহিক আরাম ও সাংসারিক সম্পদ সহস্রগুণে বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু আজ অন্ধভাবে সাংসারিক সুখ ও সম্পদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মানুষ আপনার 'মহতী বিনষ্টির' পথই তৈরী করিতেছে। য়ুঙ্গ বলেন—"আজ (বিজ্ঞানের বলে) যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা অত্যন্ত বিষম পলায়নী বৃত্তি (Escapism) ভিন্ন কিছু নয়। নিজেকে আবিষ্কার করা, নিজের মধ্যে

ছিল তার মধ্যে ক্লাসিক্স ও অঙ্কশাস্ত্র আবশ্যিক ছিল। জার্মাণী ও ফ্রান্সেও অবস্থা একই প্রকার ছিল।

কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা নূতন বিষয় পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ার দাবী প্রবল হয়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞান শিক্ষা যাতে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাটিন গ্রীকের স্থানে বিকল্প বিষয় হিসাবে নেওয়া যায় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সফলকাম হন নাই। হাক্সলী এই বিজ্ঞানবাদীদের অন্যতম। তিনি ডিসিপ্লিনবাদীদের ঠাট্টা করে বলেছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর কৌতূহলকে স্বভাবতঃই আকর্ষণ করে, তাই তা জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।—এটাই যদি বিজ্ঞানগুলির দোষ হয়ে থাকে তবে বিজ্ঞানের বইগুলিকেও নিতান্ত নীরস করে ব্যাকরণের সূত্রের মত দুর্বোধ্য কঠিন করে লেখা চলে—তা হ'লে হয়তো তখন ডিসিপ্লিনবাদীরা বিজ্ঞানকেও শিক্ষার বিষয় মধ্যে স্থান দেবেন।[৫]

লক্‌ পরবর্তী ডিসিপ্লিনবাদীদের তুলনায় শিক্ষার বিষয় নির্বাচনে অনেক বেশী উদার এবং শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কেও অনেক বেশী দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। আগেই বলেছি সু অভ্যাস গঠনের প্রণালী হিসাবে ডিসিপ্লিনের গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে চরিত্র গঠনই প্রধান উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে শাসন শৃঙ্খলা ও কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু লক্‌ শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে গ্রীক্‌, ল্যাটিন ও অঙ্কশাস্ত্রের একচেটিয়া অধিকার থাকবে এমন কথা বলেন না। তিনি শিক্ষা বলতে সাধারণতঃ এ্যারিস্টোক্র্যোট-এর সন্তানদের শিক্ষার কথাই চিন্তা করেছেন এবং সে শিক্ষায় ল্যাটিন গ্রীকের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষা ও ফ্রেঞ্চ জানাও দরকার এটাও তিনি বলেছেন। আরো তিনি সেকালের প্রচলিত গ্রামার স্কুল ও পাবলিক স্কুলের অত্যন্ত সংকীর্ণ পাঠ্যসূচীর পরিবর্তে অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, সুকুমার কলা, অবসর বিনোদনের নানা ক্রিয়া (hobbies) ইত্যাদি পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার কথাও বলেছেন। তবে পরবর্তীকালের ডিসিপ্লিনবাদীরা লকের যুক্তিগুলিকে ব্যবহার করেছেন। পাঠ্যসূচীতে ল্যাটিন, গ্রীক, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর

৪ **Paul Monroe—Brief course in the history of Education, P. 255.**

৫ **Huxley—Education and Science, P. 98-99.**

অধিকতর গুরুত্ব দেবার জন্য। বাস্তবিক অবস্থাটা হচ্ছে লক্ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর ব্যাপারটা দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে দেখেছেন। Thoughts on Education গ্রন্থে তিনি অভিজাতদের সন্তানদের শিক্ষার কথা যেখানে আলোচনা করেছেন সেখানে ইংরেজেব সাধারণ বণিকবুদ্ধির দিক থেকে বাস্তববাদী হিসাবে বিবেচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর Conduct of the Understanding গ্রন্থে তিনি মনকে গড়ে তুলবার জন্যে যে সমস্ত ড্রিল ও অভ্যাস গঠনের কথা বিবেচনা করেন সেখানে তাঁর মত পুরাপুরি ডিসিপ্লিনবাদীদের মত কঠোর।[৬]

বাস্তবিকপক্ষে সপ্তদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপ বা আমেরিকা কোথায়ও সার্বজনীন শিক্ষাব কোন আয়োজনই ছিল না। কমেনিয়াস (১৫৯২-১৬৭০) জনসাধারণের শিক্ষার কথা চিন্তা করেছিলেন কিন্তু তা একটা অবাস্তব ভাবাদর্শ-মাত্রই ছিল। লকেরও সর্বসাধারণের শিক্ষা সম্পর্কে খাঁটি ইংরেজ এ্যারিস্ট-ক্র্যাটের মতই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। অর্থাৎ মনটাইনের মত তিনিও ভাবতেন তারা ওয়ার্কহাউসে (দরিদ্রদের জন্য আশ্রয় শিবির—যেখানে তাদের শ্রমের পবিবর্তে অন্নদানের ব্যবস্থা ছিল) বা কোন কারিগরের অধীনে থেকে কাজ শিখবে এবং সামান্য লেখাপডা শিখবে।[৭] উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ইংলণ্ডে দবিদ্রের সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন হয়নি।*

শিক্ষায় ডিসিপ্লিনবাদ ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাসী পাদ্রী পুবোহিতেরা অবশ্যই সমর্থন করতেন। নীতিশাস্ত্রবিদ্‌দেরও এ মতবাদেব প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। কারণ এঁদের বদ্ধমূল ধারণা যে মানুষ স্বভাবতঃই দুষ্ট প্রবৃত্তির দাস এবং কঠোর শাসন নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই কেবল মানুষ খাঁটি হয়ে গড়ে উঠতে পারে। সেকালে প্রচলিত অ্যারিস্টটেলীয় মনোবিজ্ঞানও এ ধারণাব সমর্থক। লক্‌ও সেই মনোবিজ্ঞানের মতে বিশ্বাসী ছিলেন যে মন কতগুলি বিচ্ছিন্ন শক্তি সামর্থ্যের সমষ্টি মাত্র (Faculty Psychology)। এক উপযুক্ত শিক্ষকের তাড়না ও পরিচালনা দিয়েই তাদের সমন্বয় ও উন্নতি সম্ভবপর। পরবর্তী কালে রুশো ও পেস্টালৎসী এই কঠোর নির্মম শাসন শৃঙ্খলাবাদের বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

৬ E. M. Wilds—The Foundations of Modern Education P 363

৭ H. E. Wilds—The Foundations of Modern Education P 363.

* এ সম্পর্কে লেখকের "অবাধ্য শিশু ও শিক্ষা সমস্যা"য় বিস্তৃত আলোচনা আছে।

এই মতবাদের মধ্যে সত্য কিছু আছে সন্দেহ নেই কিন্তু বর্তমানের মনোবিজ্ঞান এ মতবাদকে বহুল পরিমাণে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আকাঙ্ক্ষা, তার ভাললাগা মন্দলাগা, তার সামর্থ্য ও সমাজের প্রয়োজনের কথা একেবারেই অস্বীকৃত। সাধারণ স্মৃতিশক্তি বা ধারণাশক্তি বলে কিছু আছে কিনা তাও বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা সন্দেহ করে থাকেন।*

লকের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য

লক্ শিক্ষার উদ্দেশ্য সমগ্র মানুষের সমগ্র বিকাশ বলে বিশ্বাস করতেন। তাই চরিত্র, দেহ ও মন তিনেরই সম্যক ও সুষ্ঠু বিকাশ চাই। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর মূলমন্ত্র ছিল সুস্থ দেহে সুস্থ মন। উপযুক্ত শিক্ষা ও আত্মসংযম অভ্যাসের দ্বারাই দেহ সবল, মন সতেজ এবং চরিত্র সুগঠিত হতে পারে। তাই তিনি তিন প্রকারের প্রধান শিক্ষার কথা বলেছেন। প্রথম, শিক্ষা হচ্ছে দৈহিক। শরীরকে শক্ত করতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে ভদ্র আচরণ ও সুব্যবহার শিক্ষা। তৃতীয় হচ্ছে মনের শক্তিবৃদ্ধি—বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদির উপযুক্ত বিকাশ।

দেহের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলেছিলেন পরবর্তী কালে রুশোও তার প্রতিধ্বনি করেছিলেন। তিনি বলেছেন অতি যত্নে পালিত হলে শরীর সুস্থ ও দৃঢ় হয় না। সুস্থ সবল দেহ গঠন করা সম্পর্কে তাঁর উপদেশ হচ্ছে প্রচুর খোলা বাতাস ও শরীরচর্চা, নিদ্রা ও সহজপাচ্য খাদ্য শিক্ষার্থীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন, মদ্য বা অনুরূপ উত্তেজকপানীয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ঔষধ যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল। পরিচ্ছদ সরল বিলাসহীন হবে এবং অতিরিক্ত উষ্ণ না হওয়া চাই। মাথা এবং পা যথাসম্ভব অনাবৃত ও ঠাণ্ডা রাখা ভাল। বিশেষ করে পা ঠাণ্ডা জলে এবং সিক্ততায় অভ্যস্ত হওয়া দরকার।"[৮]

দেহ সবল রাখতে গেলে এ কয়টি সহজ ও সাধারণ নিয়ম পালন একান্ত আবশ্যক। যদিও দেহাভ্যন্তরস্থ মন ও চরিত্রই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য তথাপি সেই মনের মৃত্তিকা নির্মিত আবাস অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধেই প্রথম মনোযোগ প্রয়োজন।

নীতি শিক্ষা

লকের মতে সমগ্র চরিত্রগঠনই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য এবং পরবর্তীকালে হার্বার্টের মতো তিনি এর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এটা শুধু

---

* এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেখক ও শ্রীমতী শান্তি দত্তের "শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা" বইয়ের 'শিক্ষায় সংক্রামকতা' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

৮ Locke—Thoughts Concerning Education.

উপদেশ (instruction) বা কৌশল বা নিপুণতা আয়ত্তীকরণ নয়। পিতামাতা ও শিক্ষকের সদৃষ্টান্ত এবং বিজ্ঞ পরিচালনা দ্বারাই শিক্ষার্থী নিজ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা সংযত করে সৎ কার্যে আনন্দ পাওয়ার অভ্যাস গঠন করতে পারে। এটি আকস্মিক নয়, কঠিন অনুশীলনের ফল। যখন মানুষ নিজের প্রবল বাসনাকে জয় করতে শেখে এবং কেবলমাত্র বিচারবুদ্ধির দ্বারা বাসনার বিরুদ্ধ পথে চলতে পারে, তখন বলা যায় চরিত্রগঠন হয়েছে। বাল্যকাল থেকেই এ শিক্ষা পিতামাতা না দিলে শিশুর চরিত্রগঠন হয় না।[১] এই চরিত্রগঠনকেই লক্ বলেছেন—"the hard and valuable part to be aimed at in education."

বুদ্ধির বিকাশ

লক্ তাঁর 'Treatise on Civil Government'-এ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে রুশোর মতোই কতকটা এই মত প্রকাশ করেছেন যে "প্রত্যেক মানুষই স্বভাবতঃ স্বাধীন ও সমান (free, equal and independent)।" নিজেদের স্বাভাবিক অধিকার রক্ষা ও বর্ধনের জন্য মানুষ স্বেচ্ছায় সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে। তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তার শিক্ষা সম্বন্ধীয় মতবাদও তেমনি। কিন্তু তাঁর মতে শিশুর এই স্বাধীন বুদ্ধির সুপরিচালনার ভার প্রথম অবস্থায় পিতামাতার এবং তারপর উপযুক্ত শিক্ষকের। রুশোর মতো লক্ও ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষার কথাই চিন্তা করেছেন। উপযুক্ত বিষয় নির্বাচন ও উপযুক্ত ডিসিপ্লিনের প্রণালী অনুসরণ করেই শিশুর মনের অস্ফুট ক্ষমতাগুলিকে কেন্দ্রীভূত ও কার্যকরী করে তোলা যায়। এ মহৎ দায়িত্ব পিতামাতার। লক্ বলেছেন, শিশুর মন স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও শৈশবেই সে মনের স্বাধীন অধিকার সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের অধিকার পায় না—সেই জন্যই তার পরিচালনা প্রয়োজন। কাজেই পরস্পরবিরোধী মনে হলেও স্বাধীনতা এবং পিতামাতার শাসন, এ দুটি একসঙ্গে থাকতে পারে।

লক্ বলেছেন, যদিও সব শিশুরই জন্মকালে মানসিক ক্ষমতা সমান, শিক্ষার গুণে বা দোষে ভবিষ্যতে তার মানসিক উৎকর্ষের তারতম্য হবে। চরিত্র-গঠনের বেলায় যেমন, এখানেও তেমন মনের বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলির উপযুক্ত শাসন ও পরিচালনার উপরই নির্ভর করে তাদের উৎকর্ষ। শিশু কালে মনের

১ Paul Monroe—Brief Course in the History of Education; P, 363-64

উপর যে সব সামান্য সামান্য বিষয়েও ছায়াপাত হয় তার মূল্য সামান্য নয়, সুতরাং এ বিষয়ে সাবধান হওয়া বিশেষ দরকার।[১০]

বিভিন্ন বিষয় শিশু শিখবে, এটা বড় কথা নয়—সুশৃঙ্খল চিন্তা ও সুস্পষ্ট ধারণার অভ্যাস গঠনই হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের প্রধান উদ্দেশ্য। লক্ তাঁর Conduct of the Understanding-এ বলেছেন—"But I do not propose it as a variety and stock of knowledge but a variety and freedom of thinking, as an increase of the powers and activities of the mind, not as an enlargement of its possessions."[১১]

পূর্বেই বলেছি, ডিসিপ্লিনবাদীদের মতে মনের ক্ষমতা বাড়াতে কতগুলি বিষয়ের বিশেষ ক্ষমতা আছে। লক্‌ও এ মতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। বিশেষ করে এ ব্যাপারে অঙ্কশাস্ত্রের সার্থকতা অত্যধিক। অঙ্কের বিভিন্ন পদ্ধতি শেখাবার জন্যে অঙ্কশাস্ত্র চর্চা নয়, বুদ্ধি ও বিচারশক্তিই এতে বেড়ে যায়। তিনি বলেছেন: "Nothing does this better than mathematics, which therefore, I think should be taught to those who have the time and opportunity, not so much to make them mathematicians, as to make them reasonable."

শিক্ষার তিনটি স্তর

"তিনি শিক্ষার তিনটি আলাদা স্তরের কথা বলেছেন (১) প্রত্যক্ষ জ্ঞান, (২) স্মৃতিশক্তি ও (৩) যুক্তি-বিচার। এই তিনটিরই বিকাশ ও উৎকর্ষ নির্ভর করে চর্চা ও অনুশীলনের উপরে। সমস্ত জ্ঞানের মূল হচ্ছে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞান, কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সুব্যবহার শিক্ষা সর্বপ্রথম প্রয়োজন। এই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের কাঁচা উপাদানের যোগান দেয়। কিন্তু তাদের ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে গেলে স্মৃতিতে তাদের ধরে রাখতে হয়। কাজেই স্মরণশক্তির বিকাশ ও তার উৎকর্ষ সাধনের উপর জোর দিতে হয়। স্মৃতি দ্বারা সংরক্ষিত জ্ঞানের উপাদানই যুক্তিবিচার ও উচ্চতর শিক্ষার ভিত্তি। বিচারবুদ্ধিই মানুষের শ্রেষ্ঠ শক্তি এবং সমস্ত শিক্ষা প্রণালীতে গুরুতর কর্তব্যই হচ্ছে এই বিচারবুদ্ধির শ্রেষ্ঠ বিকাশ।[১২]

১০ Rusk—Doctrine of Great Educator P. 120

১১ Paul Monroe—Brief Course in the History of Education. F. 265

১২ E H. Wilds—The Foundations of Modern Education. P. 366

লক্ ও পরবর্তী ডিসিপ্লিনবাদিগণ

তিনি কিন্তু পরবর্তীকালের ডিসিপ্লনবাদীদের মতো না বুঝে "পাখী-পড়া" (rote learning) ভাবে মুখস্থের পক্ষপাতী ছিলেন না। ডিসিপ্লিনবাদীরা ভাবতেন, যে বিষয় যত দুর্বোধ্য ও নীরস, সেই বিষয়ই স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির পথে তত বেশী সহায়ক। তাছাড়া এ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি ছাত্রদের কঠিন তাড়ন-পীড়নের পক্ষপাতী ছিলেন না। লক্ কিন্তু মনে করতেন, শিশুর কাছে বিষয় সহজ, সরস ও সুন্দর করে উপস্থাপন করলেই শিশুদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং তাহলেই তারা ভাল শিখবে, বুঝবে ও মনে রাখবে। তিনি শিশুদের কঠিন শাসনের বিরোধী ছিলেন। খেলা, গল্প ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিক্ষাই বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়। এ বিষয়ে তাঁর মত পরবর্তীকালের দরদী শিক্ষাব্রতীদের (রুশো, ফ্রোএবেল, মণ্টেসরির) মতের ক্ষীণ ইঙ্গিত। ভয় দিয়ে শেখানোর চেয়ে শিশুর উৎসাহ ও আগ্রহ জাগিয়ে তাদের শিক্ষাদান অধিকতর স্থায়ী ও ফলপ্রসূ। প্রশংসা, পুরস্কার দ্বারা শিক্ষকেরা শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে যদি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন তবে প্রশংসা করলে তা সর্বসমক্ষে করা উচিত, কিন্তু সকলের সামনে তিরস্কার করে শিশুর আত্মসম্মান ক্ষুন্ন করা উচিত নয়। খুব বেশী একগুঁয়েমি ও বদমায়েসির ক্ষেত্র ভিন্ন দৈহিক শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। শিশুর অতিরিক্ত জেদ বহু অনিষ্টের কারণ, একে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। যখন ছোট থেকে বেড়ে উঠতে থাকে তখন শাসন কিছু কঠোর হওয়া দরকার, কিন্তু সে বড় হয়ে উঠলে তার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেই শিক্ষার কাজ সহজতর হয়।[১৩]

লক্ ও অন্যান্য শিক্ষাব্রতী

অনেক সময় লক্‌কে মনটেইন্ বা বেকন বা কমেনিয়াসের মতো এক শ্রেণীভুক্ত করা হয় কারণ এঁরা সকলেই ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। রুশোর মতো তিনিও শিশুর দৈহিক শিক্ষা স্বভাবানুযায়ী হওয়া প্রয়োজন একথা বলেছেন। কিন্তু লকের সঙ্গে এঁদের পার্থক্যও যথেষ্ট। শিক্ষার উদ্দেশ্য সাংসারিক ক্ষেত্রে যে সদ্‌গুণগুলির গুরুত্ব আছে সেগুলির বিকাশ কিন্তু এ সদগুণ বা চরিত্র কি এবং কিভাবেই বা শিক্ষার মধ্য দিয়ে এগুলি আয়ত্ত করা যায় সে বিষয়ে দুজনের মতের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। লকের শিক্ষাদর্শের প্রধান কথা হচ্ছে অনুশীলন দ্বারা সু-অভ্যাস গঠন।

---

১৩ E. H. Wilds—The Foundation of Modern Education P. 367.

লকের মতো হার্বার্ট (১৭৭৬—১৮৪১) পরবর্তীকালে চরিত্র গঠন বা ধর্মজীবনই (Virture) শিক্ষার ভিত্তি বলে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু চরিত্র বা ধর্ম লক্ ইংরেজের বণিক বুদ্ধিপ্রসূত সাংসারিক দৃষ্টি থেকে দেখেছেন আর হার্বার্ট গভীরতর দার্শনিক দৃষ্টি থেকে দেখেছেন। হার্বার্টের মতো তিনিও শিক্ষার আগ্রহ ও উৎসাহ কাজে লাগাবার কথা বলেছেন। তারা যে বিষয় পড়তে আনন্দ পায় না অথবা যে বিষয় কেবল তাদের প্রীতিই উৎপাদন করে তাতে তাদের কোন লাভ হয় না।[১৪] পরবর্তী কালে রুশো, পেস্তালৎসী বা মন্তেসরীও বলেছিলেন—আগ্রহ, উৎসাহ, ক্ষমতার উন্মেষ যথাসময়ে হয়, এ বিষয়ে জোর করে কোন লাভ হয় না।[১৫] তবে তিনি পরবর্তী শিক্ষাব্রতীদের মতো সেই ক্ষমতার উন্মেষের বৈজ্ঞানিক স্তর বিভাগ করেন নি। বেকন্ ও কমেনিয়াসের মতো প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের কথা তিনিও বলেছিলেন কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ এই যে, তিনি বিষয়বস্তুগুলিকে দেখেছেন উপাদান সংগ্রহের উপায় হিসাবে নয়, সু-অভ্যাস গঠনের উপায় হিসাবে। যদিও লক্ নিজে ডাক্তারী বিদ্যা শিখেছিলেন কিন্তু এটা আশ্চর্য যে প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার কথা তিনি বলেন নি। রুশো লকের কাছে তার ঋণের কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এক হিসাবে তিনি লকের উল্টো কথা বলছেন। রুশো বলেছেন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং প্রবণতাকে বাধা না দিয়ে শিশুকে তার নিজ স্বভাবেই গড়ে উঠতে দিতে হবে এবং শিক্ষার প্রথম স্তরে এটাই বরং প্রয়োজন যে শিশু কোন অভ্যাস গঠন করবে না।[১৬]

শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ কোন বৈপ্লবিক পথ দেখান নি। চিরাচরিত শাসনশৃঙ্খলার পথকেই সমর্থন করেছেন। পিতামাতা, সাধারণ শিক্ষাব্রতীরা এই পথকেই সাধারণতঃ সুফলপ্রসূ মনে করে তাকে সমর্থন জানান। তাই তার মতবাদ উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচী অপরিবর্তিত রাখবার সহায়ক হয়েছিল। Adams সত্যই বলেছেন, "লকের যশের তুলনায় তার প্রভাব অনেক বেশী বিস্তৃত।"[১৭]

---

১৪ Rusk—Doctrines of Great Education P. 125
১৫ Rusk— " " " " P. 124
১৬ Paul Monroe—Brief course in the History of Education P. 266
১৭ Adams—Herbartion Psychology P. 33

শিশুর জীবনের প্রথম বৎসরটি

ঐ যে ভ্রূকুটি করিয়া, ঘুষি পাকাইয়া, হাত-পা ছুঁড়িয়া বিষম যুদ্ধে প্রবৃত্ত বীর—উনি কে? উনি নবজাত মানবশিশু। হাঁ যুদ্ধই বটে। এ তাহার দীর্ঘ-জীবন সংগ্রামের ভূমিকা। এই বীর-শিশু সংগ্রাম কবিতেছে পৃথিবীর সাথে, তাহার পরিবেশের সাথে, তাহার ক্রমবর্ধমান নিজ শক্তি ও আকাঙ্ক্ষার সাথে। নবজাত মানবশিশুর পক্ষে জীবনের প্রথম এক বৎসরকাল সবচেয়ে সঙ্কটজনক সময়।

নবজাত মানবশিশুর মতো এমন অসহায় অথচ অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ জীব আর নাই। অন্যান্য ইতরপ্রাণীর শাবকেরা অল্পদিনের মধ্যেই দৈহিক ইন্দ্রিয়াদির সম্পূর্ণতা লাভ করে। ইহার জন্য তাহারা অল্পদিনমাত্র পিতামাতার উপর নির্ভর করে এবং শীঘ্রই নিজের খাদ্যসংগ্রহ নিজেই করিতে থাকে এবং আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু মানবশিশু বহু বৎসর পর্যন্ত সর্ববিষয়ে পিতা-মাতার স্নেহ যত্নের উপর নির্ভর করে। মানবশিশুর দীর্ঘ শৈশব ও পিতামাতার উপর নির্ভরতা মানুষের সভ্যতা ও সমাজজীবন গঠনের মূল কারণ। মানবেতর প্রাণীর জীবন তুলনায় অনেক কম জটিল ও কম সমস্যাপূর্ণ। প্রকৃতিদত্ত প্রবৃত্তি ও শক্তির দ্বারা তাহারা পরিচালিত হয়। তাহাদের জীবনে বিচার-বিবেচনার স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। তাহাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর বিকাশ নিতান্ত অপরিণত। কিন্তু মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, কারণ নিজের জীবন, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনার দ্বারা সে নিজেকে পরিচালনা করে। সে প্রকৃতির দাস নয়। তাই মানবশিশুর বিকাশের ধারায় মস্তিষ্ক বা স্নায়ুমণ্ডলীর বিকাশ সময়সাপেক্ষ। তাই নবজাত মানব-শিশুর বয়স্ক মানুষে পরিণত হইতে অনেক বৎসর সময়ের প্রয়োজন। এবং এই জন্যই নবজাত শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার অত্যন্ত অপটু।

কবিরা যাহাই বলুন না কেন, নবজাত শিশু দেখিতে সুশ্রী নয়। তাহার মাথাটা মস্ত বড়, হাত-পা গুলি কাঠি কাঠি, পেটটা মোটা, শরীরের চামড়া কোঁচকানো, চোখ পিট্‌পিটে, সারা গায়ে মুখে সরু লোম। বাস্তবিকপক্ষে নবজাত শিশু প্রায় অন্ধ ও বধির। মাতৃগর্ভের অন্ধকার, নিঃশব্দ ও উষ্ণ আবরণ হইতে হঠাৎ এই আলোকিত, কোলাহলময় ও শীতল বায়ু-প্রবাহিত

পৃথিবীতে আসিয়া শিশু বাস্তবিকই বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টাই সে ঘুমাইয়া থাকে। ইহাতে তাহার চক্ষুর ভিতরের কলকব্জা ও স্নায়বিক পদার্থগুলি তীব্র আলোকের আঘাত হইতে রক্ষা পায় এবং ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায়। নবজাত শিশু আলো ছায়ার পার্থক্য হয়ত অস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে, কিন্তু বর্ণ-বোধ তার জন্মে নাই—কারণ যে অক্ষিপটের (Retina) যে স্নায়বিক উপাদান বর্ণবোধের জন্য দায়ী, তাহা জন্মকালে দানা বাঁধিয়া উঠে না। কনিনীকার (Cornea) মধ্যস্থলে ছিদ্রটি নিয়ন্ত্রণ দ্বারা চোখেয় ভিতরে আলোক-রশ্মি প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু যে পেশী ও অন্যান্য কলকব্জার সাহায্যে এ কাজটি সম্পন্ন হয়, সেগুলি শিশুর চোখের ভিতর পরিণতি লাভ করে ধীবে ধীরে। আবার চোখ একসঙ্গে নাড়ানো, একই দ্রব্যে কেন্দ্রীভূত করা ইত্যাদি অনেকগুলি জটিল প্রক্রিয়া উপযুক্ত পরিণতি এবং অভ্যাস দ্বারা সুসঙ্গতি লাভ করিলে তবেই দৃষ্টির কাজটি সুসঙ্গত হইতে পারে। ইহা সময়সাপেক্ষ; সুতরাং নবজাত শিশু চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। একমাস বয়স হইলে জোরে শব্দ করিলে শিশু সেই-দিকে চোখ ফিরাইতে পারে। কিন্তু তখন সে সমস্ত জিনিসকেই নিতান্ত অস্পষ্টভাবে দেখে, কারণ দুটি চোখের দৃষ্টি একই কেন্দ্রবিন্দুতে নিবদ্ধ (focussing) করিতে হইলে অক্ষিগোলক সংলগ্ন পেশীগুলির যে বিকাশ প্রয়োজন, তাহা একমাসের শিশুতে সম্পূর্ণ হয় না। দুইটি চোখই একসঙ্গে একই দিকে নাড়ানো পেশীগুলির উপযুক্ত বিকাশ ও অভ্যাস এ দুইয়েব উপরই নির্ভর করে। এই সুসমন্বিত অক্ষিগোলক চালনা যেখানে ঠিক ঠিক ঘটে না, সেখানে শিশু 'ট্যারা' হয়। শিশু অন্ততঃ ৩।৪ মাসের না হওয়া পর্যন্ত কাছের ও দূরের জিনিসের প্রভেদ ঠিক ঠিক ধরিতে পারে না। ইহা করিতে হইলেও দুই অক্ষিগোলকেব সুসমন্বিত সঞ্চালন, চোখের ভিতরে উভয়দিকে উত্তল লেন্সের (double convex lens) সঙ্গে সংযুক্ত সূক্ষ্ম পেশী-সূত্রগুলির উপযুক্ত বিকাশ ও মসৃণ ক্রিয়ার প্রয়োজন। ইহা সময় ও অভ্যাসসাপেক্ষ। নবজাত শিশুর জগতের পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। সে চলাফেরা করিতে পারে না। খাদ্যসংগ্রহ ব্যাপারেও সে সম্পূর্ণভাবে মায়ের উপর নির্ভরশীল। কাজেই দ্রব্যের পরিস্ফুট আকার বা দূরত্ব বা বর্ণের জ্ঞান তাহার শৈশব জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়। তাই যথোপযুক্ত সময়ে এ সব জ্ঞান যাহাতে বিকশিত হয়, বিধাতা সেই ব্যবস্থাই করিয়াছেন।

সেই রকম শিশুর কর্ণের মধ্যভাগ (Middle Ear) জন্মকালে তরল পদার্থ পূর্ণ থাকে যাহাতে পৃথিবীর উচ্চ শব্দ তাহার অতি কোমল কর্ণপটাহ বিদীর্ণ না করে। ধীরে ধীরে এ জল সরিয়া যায়। শিশুর একমাস বয়স হইলে তখন সে মোটামুটি শব্দ শুনিতে পারে এবং জোরে শব্দ করিলে সেদিকে মুখ ফিরাইতে পারে। অবশ্য তখনও তার শব্দের সূক্ষ্ম তারতম্য—স্বরগ্রামে প্রভেদ ইত্যাদি বুঝিবার প্রয়োজন হয় না। এবং তাই ধীরে ধীরে তার কর্ণের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রপাতি ও স্নায়ুপদার্থগুলি সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করে। চার মাস বয়স হইলে সে মোটামুটি বিভিন্ন মানুষের স্বর ও বিভিন্ন রকমের শব্দের প্রভেদ বুঝিতে পারে। বিশেষ করিয়া যিনি তাহার জীবনে সকলের চেয়ে আপন এবং যাহাকে না হইলে তাহার চলেই না সেই মায়ের গলাটি সে তিন চার মাস বয়স হইতেই ভাল করিয়া চিনে। প্রায় দেড় মাস বয়স হইলে শিশু নিজে অস্পষ্ট শব্দ করিতে পারে এবং অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে নিজের এই নতুন শক্তির বিকাশে প্রবৃত্ত হয়। স্বরযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও পেশীগুলির সমন্বয় ক্রমশঃই অধিকতর কার্যকরী হইতে থাকে। তিন মাস বয়সেই শিশুর কান্নাটাও অর্থপূর্ণ ভাষার মর্যাদা লাভ করে। শিশুর কান্না শুনিয়াই মা বুঝিতে পারেন, শিশু ক্ষুধার্ত, বা সে বিছানা ভিজাইয়া ফেলিয়াছে বা পেট ব্যথা করিতেছে অথবা একা ভয় পাইয়াছে। শিশু নিজের কণ্ঠস্বর শুনিতে ভালবাসে এবং দুই তিন মাসের পর হইতে সে অনর্গল 'কথা বলিতে' চেষ্টা করে। তাহার এ অস্ফুট কল-ভাষণই বাস্তবিক ভবিষ্যতে ভাষার মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশের প্রথম সূচনা।

শিশুর জন্মকালে অন্য সমস্ত পেশী ও যন্ত্রই অপরিণত কিন্তু চোয়ালের পেশীগুলি জন্মাবধিই যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। তাই শিশু জন্মিবার অত্যল্পকাল মধ্যেই মায়ের স্তন হইতে নিজ খাদ্য আহরণ করিতে পারে। এবং কান্নার যন্ত্রটি জন্মাবধিই সক্রিয়, এটি দ্বারাই সে সেই অসহায় অবস্থায় নিজের প্রয়োজন সরবে প্রচার করিতে পারে। কিন্তু তিন মাস পর্যন্ত তাহার কান্না অশ্রুসজল নয় কারণ চোখের অভ্যন্তরে অশ্রুস্রাবী গ্রন্থি (lachrymal gland) তখনও পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। জন্মকাল হইতেই শিশুর ঘাড়ের পেশীগুলিও যথেষ্ট সবল থাকে। তাই অল্প কয়দিনের শিশুকেও উপুড় করিয়া শোয়াইয়া দিলে সে মাথাটা তুলিতে চেষ্টা করে। তাহার হাতের অঙ্গুলী সঞ্চালনের পেশীগুলিও অল্পদিনের মধ্যে বললাভ করে। তাই ছোট শিশুর হাতের মধ্যে আঙ্গুল বা

শক্ত পদার্থ দিলে সে বেশ জোরের সঙ্গে মুঠি করিয়া ধরিতে পারে।, নবজাত শিশু দিনে প্রায় দু'ঘণ্টার মতো কাঁদে। ইহাতে তাহার ফুসফুস ও শ্বাসনালী ইত্যাদির ব্যায়াম হয়, তাহাদের পরিপুষ্টির সহায় হয়। জন্মকালে ফুসফুসটি সম্পূর্ণ প্রসারিত হয় না। মাতৃগর্ভে থাকিতে তাহার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন মাতার রক্তপ্রবাহ হইতেই শিশু সংগ্রহ করে। কিন্তু জন্মমাত্রই সে অক্সিজেনের বিষম অভাব বোধ করে। এ বিষম সংকটত্রাণের ব্যবস্থা শিশুর দেহের মধ্যেই থাকে। বয়স্কদের দেহে প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা থাকে ৪০ হইতে ৫০ লক্ষ, কিন্তু শিশুর দেহে অক্সিজেনের অভাব দূরীকরণার্থ প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা ৬০ লক্ষ। যথেষ্ট অক্সিজেন শিশুর দেহের সর্বত্র যাহাতে দ্রুত সঞ্চালিত হইতে পারে সে জন্য শিশুর হৃদয়যন্ত্রটি বয়স্ক মানুষের তুলনায় দ্বিগুণ বেগে স্পন্দিত হয়। রক্তে বিষাক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাইলে শিশু হাই তুলিতে থাকে এবং ইহা দ্বারা নূতন কতকটা অক্সিজেন বাতাস হইতে গ্রহণ করে।

পূর্বেই বলিয়াছি, নবজাতকের মাথাটি দেহের তুলনায় প্রকাণ্ড—হাত পাগুলি কাঠি-কাঠি, পেটটা মোটা—ইহার কোনটাই কিন্তু নিরর্থক নয়। যে লক্ষ লক্ষ স্নায়ু (Cells) দিয়া পরিণত মানুষের মস্তিষ্ক গঠিত তাহার পূর্ণ সংখ্যাই শিশুর মস্তিষ্কে জন্মকালেই বিদ্যমান থাকে, যদিও অবশ্য সে স্নায়ুগুলি অপরিপুষ্ট এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অসংখ্য সংযোগ সূত্রগুলিও পরিণতির অপেক্ষা রাখে। কাজেই এতগুলি স্নায়ুর স্থান হইতে হইলে মাথাটি প্রকাণ্ড হইবেই। দেহের অন্যান্য অংশের স্নায়ুগুলির সংখ্যা দ্রুতগতিতে এক হইতে দুই, দুই হইতে চার, এইভাবে বাড়িয়া যায় তাই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আয়তনও ক্রমেই বাড়িয়া চলে। হাত-পাগুলি শিশুর এক বৎসর পর্যন্ত তাহার জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়। তাহার জীবনের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। পেটটা এত মোটা তার কারণ শিশুর যকৃৎ liver)-টি মস্ত বড়। শৈশবে তাহার খাদ্য মাতৃস্তন্যে লৌহ, স্নেহপদার্থ (fat) ও গ্লাইকোজেনের অভাব থাকে। সে অভাব পূরণের জন্য শিশুর যকৃতে এ পদার্থগুলি কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। শিশুর চিবুকটি জন্মকালে নীচু থাকে যাহাতে স্তনপানে তাহার কোন বাধা না হয়। জন্মকালে শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি সবই প্রায় অপরিণত।

স্পর্শানুভূতি খুব তীক্ষ্ণ থাকে না, তাই যথেষ্ট দলাই মলাই শিশু সহ্য করিতে পারে। কিন্তু জন্মাবধি স্বাদের অনুভূতি বেশ বিকশিত হয়—মধু মুখে দিলে সে বেশ খুসী হইয়াই চাটিয়া খায়। কিন্তু একফোঁটা লেবুর রস তাহার জিহ্বায় দিলে সে মুখ বিকৃত করে। গন্ধও সে বেশ বুঝিতে পারে - দুধের গন্ধ পাইলে চুক্ চুক্ করিয়া ঠোঁট চুষিতে থাকে।

শিশুর ইন্দ্রিয়ানুভূতি, পেশীর বিকাশ, অস্থি ও দেহের অন্যান্য উপাদান সবই সুশৃঙ্খল গতিতে একসঙ্গে পবিণতি লাভ করে। এই বিকাশ ও পরিণতিব নির্দিষ্ট ছন্দ ও গতি আছে। বিকাশের নির্দিষ্ট স্তর পরবর্তী স্তরের প্রস্তুতি। জীবনের প্রথম কয়টি সপ্তাহের মধ্যে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড হইতে সূক্ষ্ম ফিতার মতো স্নায়ুসূত্র দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও পেশী ইত্যাদির দিকে শিকড়ের মতো ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। এগুলির সাহায্যেই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বেচ্ছায় সঞ্চালনের ক্ষমতা জন্মে। প্রথমে মুখের বিভিন্ন স্নায়ুসূত্রগুলি বিকশিত হয়, কারণ চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ইত্যাদি প্রধান ইন্দ্রিয়গুলি মুখেই অবস্থিত এবং জীবনের প্রয়োজনে ইহাদের বিকাশ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ক্রমে ক্রমে অধমাঙ্গের সহিত সংলগ্ন স্নায়ুসূত্রগুলি পুষ্টিলাভ করে। সকলের শেষে পুষ্ট হয় পায়ের পেশীগুলি— কারণ শিশুর হাঁটা প্রয়োজন হইবে প্রায় এক বৎসর পূর্ণ হইলে কিন্তু এক মাস বয়সের মধ্যেই শিশুর গাল ও চোয়ালেব সংলগ্ন পেশী ও স্নায়ুসূত্রগুলি অনেকটা বিকশিত হয় এবং শিশু যে স্বেচ্ছাক্রিয়া দ্বারা সকলের মনোহরণ করিতে পারে তাহাব গোপন রহস্যটি আয়ত্ত করে—সে হাসিতে শেখে।

জন্মের কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত দিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টাই শিশু ঘুমাইয়া কাটায়। সমস্ত ইন্দ্রিয ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য শিশু তখনও প্রস্তুত নয়। তাহার প্রধান আনন্দ ও উৎসাহ মায়ের বুক হইতে খাদ্যসংগ্রহে। কিন্তু চার মাস বয়স হইলে শিশু অনেকটা সামাজিক জীব হয়। তাহার চোখ কান দিয়া সে তাহার চাবপাশের সমস্ত জিনিসকে জানিতে চেষ্টা করে। তাহার পেশীগুলির সঞ্চালন এখন ক্রমশঃ সুসংবদ্ধ—আগের মতো তাহা এলোমেলো বিশৃঙ্খল নয়। সে নিজের হাতের মুঠি মুখে পুরিতে পারে। নিজের হাত দিয়া পা ধরিতে পারে। যতক্ষণ জাগিয়া থাকে সে অনবরত হাত পা নাড়িয়া খেলা করে, নানা রকমের শব্দ করিতে চেষ্টা করে- খুসী হয়, বিরক্ত হয়। সাবাদিনই নিজের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে নানা পরীক্ষায় ব্যস্ত থাকে। সে সমাজের একজন হইতে চেষ্টা করে।

জন্মকালে তাহার হাড়গুলি কোমল ও নমনীয় থাকে। তিন মাসের পর হইতে হাড়গুলি ক্রমশঃ শক্ত হয়। চার মাস হইলে সে নিজ হইতেই উপুড় হইতে চেষ্টা করে। আর একটু বড় হইলে সে বিছানার চাদর মুঠ করিয়া ধরিয়া বুকে ভর দিয়া সামনে আগাইবার চেষ্টা করে। তাহার চোয়াল ও নীচের মাড়ির হাড়গুলি শক্ত হয়। ছয় মাসের কাছাকাছি নীচের মাড়িতে প্রথম দাঁত বাহির হয় এবং তাহার কিছুদিন আগে হইতে শিশু মাড়ি দিয়া কিছুটা শক্ত জিনিস চিবাইতে চায়। আমাদের দেশে তাই এ সময় শিশুর 'মুখে ভাত' দেওয়া হয়। বিদেশী মত অনুযায়ী এ সময় হইতে শিশুকে দুধের সঙ্গে শ্বেতসার (Starch) মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া হয়। চার মাসের সময় হইতেই চোখ, কান ও হাত-পা সঞ্চালনের মধ্যে অনেকটা সমন্বয় দেখা যায়। শিশু হাত বাড়াইয়া রঙীন খেলনা ধরে। ডাকিলে সেদিকে ঘাড় ফেরায়, তাকায়। ছয় মাসের পর হইতে সে অল্প অল্প হামা দিতে শিখে। তাহার জগতের ও অভিজ্ঞতার পরিধি ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। সাত মাস বয়সে তাহাকে বসাইয়া দিলে সে অনেকক্ষণ বসিতে পারে। নয় মাস কি দশ মাসে সে বেশ স্বচ্ছন্দে হামা দিয়া অনেকখানি চলিয়া যাইতে পারে। এ সময় সে ধরিয়া দাঁড়াইতে পারে এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহার পায়ের হাড়, অস্থিসংযোগ, পেশী ইত্যাদি এতটা মজবুত হয় যে সে নিজের চেষ্টায় দাঁড়াইতে পারে এতদিনে সে অন্যান্য ইতরপ্রাণীর মত চারপায়ে না চলিয়া মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দুপায়ে দাঁড়াইয়া (Homo sapiens) প্রকৃত মানুষের পদমর্যাদা লাভ করিল। নৃতত্ত্ববিদদের মতে মনুষ্য জাতির সভ্যতার বিকাশে ইহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

এখন হইতে সে সব কিছু অনুকরণ করিতে শেখে। এতদিনে তাহার সত্যিকার 'বুলি' ফোটে। 'মা' এই প্রাণকাড়া ডাকটি সে এখন আয়ত্ত করিয়াছে।

এই সাত আট মাসে তাহার বৃদ্ধি ও বিকাশের হিসাব নিলে যাহা দেখা যাইবে তাহা বিস্ময়কর। জন্মকালে তাহার ওজন থাকে প্রায় ৬ পাউণ্ড (সাহেবী বাচ্চাদের গড় ওজন ৭ পাউণ্ড)। চার মাসের শেষে তাহা দ্বিগুণ বা তারও বেশী হইয়া দাঁড়ায়। এর মধ্যে মাথায়ও সে চার পাঁচ ইঞ্চি বাড়িয়াছে! এই হারে বৃদ্ধি যদি চলিতে থাকিত তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তাহার ওজন দাঁড়াইত প্রায় চৌদ্দ মণ এবং উঁচুতেও সে বত্রিশ হাত লম্বা দৈত্য হইত।

আট মাস বয়স হইতে ক্রমেই তাহার চেহারা ভদ্র মানুষের মতো হইয়া দাঁড়ায়; নাক, চিবুক ইত্যাদি সুগঠিত হইয়া ওঠে। এখন হইতে পৃথিবীটা তাহার কাছে শুধুই সংগ্রামক্ষেত্র না হইয়া উপভোগ্য হইয়া ওঠে। নানা দুষ্টুমি সে শেখে, নানা ভঙ্গী আয়ত্ত করে। সে এবার 'হাঁটি হাঁটি পা পা' করিয়া পৃথিবীর বুকে নিজের অধিকার বিস্তার করিতে সচেষ্ট। তাহার চলাফেরা, অঙ্গসঞ্চালন সবই অধিকতর সমন্বিত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ হইতে থাকে। তাহার ইচ্ছা, অনিচ্ছা, অনুরাগ, বিরক্তি ক্রমেই সে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে শেখে। এখন সে মা, মাসী, বাবা, দাদু এ সব প্রভেদ মোটামুটিভাবে বুঝিতে পারে। তাহার স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ হিসাবে সে নিজের হাতে খাইতে চেষ্টা করে। এটা আমরা খুব সহজ ঘটনা মনে করি কিন্তু শিশুর পক্ষে ইহা একটি অত্যাশ্চর্য পরীক্ষা। এ কাজটি সুসম্পন্ন করিতে হইলে হাত আঙ্গুল, মুখ, জিহ্বা, চোয়াল সংলগ্ন বহু পেশীর মসৃণ সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। অবশ্য অনেক খাদ্য সে ছড়ায়, ছিটায়, নাকে, মুখে, চোখে মাথে কিন্তু তাহার হাত ও আঙ্গুল যে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যস্থান মুখগহ্বরে মাঝে মাঝেও খাদ্য পৌছাইয়া দিতে পারে তাহাই পরম বিস্ময়ের বিষয়। ছয় সাত মাস বয়স পর্যন্ত শিশু অন্য শিশু সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন। কিন্তু আট মাস বয়স হইলে সে বিড়াল কুকুর বা অন্যান্য শিশুদের সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করে। ক্রমশঃ সে সমাজ জীবনে অভ্যস্ত হইতেছে। তাহার বুদ্ধি, স্মৃতি, অনুভূতি, মেজাজ ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত এখন হইতে কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাহার বিচার-বিবেচনার অঙ্কুর এখন হইতে বিকাশ লাভ করিতে থাকে।

আট মাসের পর হইতে এক বৎসর পর্যন্ত খুব একটা চমকপ্রদ পরিবর্তন দেখা যায় না। তবে ইতিপূর্বে যে সমস্ত শক্তি ও কুশলতা শিশু আয়ত্ত করিয়াছে তাহার বুনিয়াদ আরো পাকা হয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পেশীর ব্যবহার অধিকতর সহযোগিতামূলক, সমন্বিত ও নির্ভুল হয়। এতদিন শিশুর শারীরিক বিকাশই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত কিন্তু এক বছর বয়স থেকে তার মানসিক বিকাশও উল্লেখযোগ্য হয়।

ছ'মাস বয়স থেকেই শিশুর খাদ্য, পায়খানা, প্রস্রাব, ঘুম ইত্যাদি বিষয়ে সু-অভ্যাস গঠনে চেষ্টিত হওয়া ভাল। এ সব অভ্যাস তাহার সমস্ত জীবনকে প্রভাবিত করিবে। এক বৎসর বয়স হইলে এবং যখন কিছু কিছু হাঁটিতে শিখে তখন সে তাহার নাগালের মধ্যে সব জিনিস ধরিতে চায়, ছোট জিনিস

পাইলে মুখে পোরে বা মুখে ফেলে। এখন হইতেই প্রচুর স্নেহ ও ধৈর্য এবং কিছুটা শাসন দ্বারা শিশুকে বিপজ্জনক ও কাজের জিনিসে যাহাতে হাত না দেয় তাহা ধীরে ধীরে শিখাইতে হইবে। এ সময় অতিরিক্ত প্রশ্রয় ও অতিরিক্ত শাসন তাড়না দুইয়েরই ফল অশুভ। খাওয়া, প্রস্রাব, পায়খানা, ঘুমের অভ্যাস সম্পর্কেও একই কথা। বর্তমান কালে কোন কোন শিশু-মনোবিজ্ঞানীর মতে এ বিষয়ে ঘড়ি ধরিয়া, আউন্স মাপিয়া, কঠিন নিয়ম অনুসারে না চলিয়া শিশুর নিজস্ব দাবী—তাহার দেহের নিজস্ব ছন্দ অনুযায়ী (self demand) চলাই উচিত। না হইলে শিশুর বাড়ন্ত মন ও স্ফুটোনোন্মুখ ইচ্ছাশক্তির স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দেওয়া হয় যাহার ফল শুভ হয় না। ভবিষ্যতে শিশুর ব্যক্তিত্ব ইহাতে খর্ব করা হয়। অন্যদিকে ইংরেজ ও জার্মান মনোবিজ্ঞানীরা গোড়া হইতেই শাসন-শৃঙ্খলা (discipline) কড়াকড়িভাবে অনুসরণের উপদেশ দেন। সম্ভবত অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও মধ্য পন্থাই সত্য পন্থা। প্রত্যেক শিশুরই বিকাশের নিজস্ব ছন্দ আছে। তাহা ধৈর্যের সঙ্গে আবিষ্কার করিতে হইবে, কিন্তু সে বিকাশ ও গতির ধারা যাহাতে সুশৃঙ্খল ও ছন্দোময় হয় সেজন্য কিছুটা শাসন ও নিয়ন্ত্রণের অবশ্য প্রয়োজন আছে। আমেরিকার মনোবিজ্ঞানী উইলিয়ম জেমসের মতে সমস্ত সুশিক্ষার মূল হইতেছে বাল্যকালেই সু-অভ্যাস গঠন ও কু-অভ্যাস বিদূরণ। এ বয়স হইতে শিশু অনুকরণ করিতে শিখে। সুতরাং পরিবার সদাচারী হইলে তবেই শিশু অনুকরণ দ্বারা সু-অভ্যাস আয়ত্ত করে।

শিশুর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন স্নেহ ও নিরাপত্তা বোধ। ইহা তাহার দৈহিক ও মানসিক উপযুক্ত বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক পিতা-মাতার সন্তানের জন্য স্বাভাবিক স্নেহ থাকে, কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়। স্বাভাবিক স্নেহ বুদ্ধিমার্জিত এবং প্রচুর ধৈর্য ও স্বার্থত্যাগ দ্বারা সক্রিয় ও সফল হওয়া চাই। মাতাকে স্বাস্থ্যবিধি অবশ্যই জানিতে হইবে এবং তাহা অনুসরণে অনলস হইতে হইবে। ঠিক সময়টিতে শিশু যাহাতে সম্পূর্ণ তৃপ্তিকর খাদ্য পায়, যাহাতে সে নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে যথোচিত ঘুমাইতে পায়, এ দুটি বিষয়ে মাতার বিশেষ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। অধিক কোলাহল, তীক্ষ্ণ আলো, বদ্ধ ঘর, যানবাহনে অতিরিক্ত ভ্রমণ, ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তন, মানসিক সংঘাতপূর্ণ গৃহ-পরিবেশ শিশুর নিরাপত্তাবোধকে বিঘ্নিত করে। আজকাল অনেক শিক্ষিত পিতামাতা শিশুকে দামী পাউডার মাখাইয়া, দামী পোশাক পরাইয়া

এবং অবসরমত শিশুকে অতিরিক্ত আদর করিয়া নিজ কর্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করেন—অর্থাৎ শিশু তাঁহাদের কাছে জীবন্ত খেলার পুতুল মাত্র। কিন্তু শিশুকে নাওয়ানো, খাওয়ানো, পরিষ্কার করা, তাহাকে নিয়া নিয়মিত বেড়ানো ক্লান্তিকর, ও অনেক সময় অপরিচ্ছন্ন কাজগুলি ঝি চাকরের হাতেই ছাড়িয়া দেন। সিনেমা বা নিজেদের দৈনিক অন্যান্য আমোদ আহ্লাদের পথে শিশুকে তাঁহারা বিঘ্ন বলিয়াই মনে করেন এবং ঝি চাকরেব কাছে শিশুকে ফেলিয়াই তাঁহাবা সন্ধ্যার সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাহিরে কাটাইয়া আসেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া ঘুমন্ত শিশুকে জাগাইয়া প্রচুর আদব করিয়া তাহার স্নেহের ক্ষতিপূবণ করিতে চান। কিন্তু এ ফাঁকি শিশুর কাছে খাটে না। তাহার বঞ্চিত হৃদয়ে পিতামাতার প্রতি অভিমান সঞ্চিত হইতে থাকে। তাহার অবচেতন মনে পিতামাতার প্রতি বিদ্বেষ জমা হয়—যাহার ফল ভবিষ্যৎ জীবনে শুভ হয় না। বাড়ন্ত শিশু স্নেহ ভালবাসার কাঙ্গাল—এজন্য সে তাহার সমস্ত সত্তা দিয়া পিতামাতাকে জড়াইয়া ধরিতে চায়। আবার আর একদিকে সে তাহার স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিতে চায়। তাহার কৌতূহল অপরিসীম—নানা পরীক্ষা দ্বারা সে তাহার চারিপাশের পৃথিবীটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া চাখিয়া দেখিতে চায়—তাহার অশান্ত মনে হাজারো অস্পষ্ট প্রশ্ন ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। এখানে তাহার স্বাধীনতার প্রথম দাবী। এ দাবীকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। তাহার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকাশেব সুযোগ দিতে হইবে। তাহার জিজ্ঞাসু দেহমনকে উৎসাহিত করিতে হইবে। এজন্য প্রয়োজন যথেষ্ট বুদ্ধি, বিবেচনা ও ধৈর্য।

শিশু বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। তাহার বিকাশের ইতিহাস অত্যাশ্চর্য বিস্ময়। কিন্তু সুন্দর, সুস্থ, ও বুদ্ধিমান শিশু চাহিলেই পাওয়া যায় না। তাহাকে অসীম যত্নের সঙ্গে তিলে তিলে গড়িতে হয়। সুস্থ সুন্দর শিশু আকস্মিক ঘটনা নয়, অন্ধ অদৃষ্টমাত্র নয়। তাহাকে পাইতে হইলে উপযুক্ত সাধনা চাই। সে সাধনায় ধৈর্যশীল, আত্মত্যাগী ও বুদ্ধিমান পিতামাতা সিদ্ধিলাভ করেন—তাঁহারা নিজেরাও সুসন্তানলাভে ধন্য হন—সমাজকেও ধন্য করেন।

যে যে বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :—

1. The Gesell Institute's Child Behaviour.
2. Mr. Benjamin Spock—'Baby & Child Care'
3. Ratcliff—'Your year of Miracles'—Reader's Digest—Nov. 1960
4. Bowley—'The Natural Development of the Child.'

এক হইতে তিন বৎসর

কোন্ বয়সের শিশু সবচেয়ে বেশী মন কাড়িয়া লয়? হয়তো এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়, কারণ ভিন্ন রুচিহি লোকাঃ। ইহা অসম্ভব নয় যে দুই মাসের কচি বাচ্চা তাহার করুণ অসহায়ত্বের জন্যই অনেক মায়ের বাৎসল্য রস সবচেয়ে বেশী উদ্রেক করে। তবে সম্ভবতঃ ১ বৎসর হইতে ৩ বৎসরের বাচ্চাদেরই বেশীর ভাগ লোক পছন্দ করেন।

ছয় মাসের নীচের শিশুরা দেহের দিক দিয়া নিতান্ত অপরিণত। তাহাদের মাথাটি দেহের তুলনায় প্রকাণ্ড, পেটটি মোটা। হাতগুলি কাঠি কাঠি, পেশীগুলি একেবারে অপরিণত, মুখখানা ফোক্‌লা, হয়তো বা দুই একটি দাঁত সবে উঠিয়াছে। সে পশুর মতো চারপায়ে চলে কারণ তাহার হাত দুইটি তখনো বাস্তবিক পক্ষে হাতের কাজ করিতে শিখে নাই। যদিও তখন হইতেই নিজের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আরাম, বিরক্তি কিছু কিছু প্রকাশ করিতে পারে তবুও খাওয়া, শোওয়া, প্রস্রাব, পায়খানা ইত্যাদি দেহের মৌলিক দাবী ও প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই মায়ের উপর নির্ভর করে। তাহার দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি তখনও অপরিপুষ্ট। তবে তখন হইতে সে দুই চোখের দৃষ্টি একই দ্রব্যের দিকে নিবদ্ধ করিতে শিখিয়াছে—শব্দ হইলে সেদিকে সে ঘাড় ফিরাইতে পারে। তাহার স্বাদবোধ তখনও একান্তই অপরিণত কারণ তখনও তাহার একমাত্র খাদ্য মায়ের বুকের বা বোতলের দুধ। ইহার পূর্ব হইতেই দ্রুতবেগে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাড়িতেছে এবং সে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়া পৃথিবীর আলো, রং, স্পর্শ, গন্ধের সহিত পরিচিত হইতেছে। কিন্তু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সমন্বয় করিয়া তাহাদের তাৎপর্যবোধ করিতে শেখে নাই। বাবা, কাকা, মা, মাসী, পিসী দাদু, দিদিমা এসব সাংসারিক সম্বন্ধের প্রভেদ তাহার কাছে একেবারেই স্পষ্ট নয়। এখনও দিনের মধ্যে ১২।১৪ ঘণ্টা তাহার ঘুমাইয়া কাটে। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের মধ্যে সমন্বয় সাধনে এখনও কিছু বিলম্ব আছে—এবং দেহের বিভিন্ন অংশের অসমান বৃদ্ধির জন্য তাহার চেহারার মধ্যে একটা খাপছাড়া ভাব ফুটিয়া ওঠে, তখনও তাহার দেহে শ্রীছাঁদ ঠিক আসে নাই। বাস্তবিকপক্ষে দেহের দিক হইতে একবৎসর কাল

পর্যন্ত শিশুর বিশেষ সংকটের সময়। শিশুমৃত্যুর একটা মস্ত বড় অংশ অধিকার করিয়া থাকে হতভাগ্য এক বৎসরের নীচের শিশুরা। আবেগের প্রকাশও নিতান্তই প্রাথমিক ও অস্পষ্ট। নিতান্ত জান্তব তুষ্টির প্রকাশ নিঃশব্দ হাসিতে এবং জান্তব বিরক্তির প্রকাশ, সরব কান্নায়। এক বৎসরের কিছু আগে হইতে মুখে বোল ফুটিলেও সত্যিকার কথা বলিতে তাহারা পারে না। কথার অর্থবোধ এবং বুঝিয়া শুনিয়া শব্দ ব্যবহার করিতে দেড় হইতে দুই বৎসরের আগে শিশুরা সমর্থ হয় না। এক বৎসরের নীচে শিশু ব্যক্তি পদবাচ্য নয়।

কিন্তু এক বৎসরের পর হইতে তিন বৎসর পর্যন্ত শিশুরা সব চেয়ে মানুষের মন কাড়িতে পারে, কারণ তখন তারা নানা রং ঢং করিতে পারে, আদর বোঝে এবং প্রতিদানে আদর করে, সব কাজ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে, নানা দুষ্টামী তাহাদের মাথায় আসে। আধো আধো কথা বলে, আবার বড়দের মতো বিষম বিজ্ঞের মত কাজ করিয়া বা কথা বলিয়া সবাইকে হাসাইয়া দেয়। এ বয়সে শিশুর কমনীয়তা ও লাবণ্যও থাকে, অথচ সে একেবারে অসহায় অপোগণ্ড নয়। তাহাকে নিয়া নানা খেলা ও আমোদ করা চলে।

শারীরিক দিক দিয়া এক বৎসর হইতে তিন বৎসরের মধ্যে শিশুর খুব আকস্মিক ও গুরুতর পরিবর্তন হয় না। ছয় মাসের পর হইতেই ক্রমে ক্রমে তাহার চেহারা মানুষের মত হইতে সুরু করে। তাহার গোলগাল চীনা ভাবটা দূর হইয়া ক্রমে ক্রমে নাক চিবুক ইত্যাদি কোণগুলি দেখা দেয়। শিশুর এক বৎসর বয়স হইলে, তাহার চেহারাটা ভবিষ্যতে কেমন দাঁড়াইবে তাহার কিছুটা আঁচ করা যায়। তিন বৎসর বয়সে সে পরিপূর্ণ খুদে মানুষ হইয়া দাঁড়ায়। তাহার ব্যক্তিত্বের ছাপ চেহারায় ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এক বৎসর বয়সে তাহার ইন্দ্রিয়গুলি অবশ্যই সম্পূর্ণ পরিণত নয়। বয়স্ক মানুষের মত রং বা দূরত্বের প্রভেদ বা শব্দের সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝিতে না পারিলেও চক্ষু ও শ্রবণেন্দ্রিয় মোটামুটি কাজ চলার মত পরিণতি লাভ করিয়াছে। ছোট শিশুর স্পর্শের অনুভূতি তীক্ষ্ণ নয় তাই তাহাকে যথেষ্ট দলাই মলাই করিলেও সে খুব বিরক্ত হয় না। কিন্তু একবৎসরের শিশুর স্পর্শেন্দ্রিয় অনেকখানি তীক্ষ্ণতা ও পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাহার হাত পায়ের পেশীগুলি এখনও খুব সবল নয় তাই যদিও সে হাঁটিতে শিখিয়াছে (দশ মাস বয়স হইতেই শিশু প্রথমে দাঁড়াইতে ও পরে ধরিয়া ধরিয়া হাঁটিতে শিখিয়াছে) তথাপি মাঝে মাঝেই সে হামাগুড়ি দেয়। ক্রমেই সে সম্পূর্ণ নির্ভয়ে এবং

বেশীক্ষণ হাঁটিতে পারে এবং তিন বৎসর বয়স হইলে (নিতান্ত ক্লান্ত না হইয়া থাকিলে) কোলে উঠিতে লজ্জা বোধ করে। এক বৎসরের শিশু নিজে হাতে খাইতে পারে না, তবু তাহার হাতে খাবার নেওয়া চাই, কিন্তু দুধ ভাত সমস্ত গায়ে মুখে ছিটাইয়া ছড়াইয়া একাকার করে। এই হাতে খাওয়া ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। এর জন্য হাতের আঙ্গুলের, চোয়ালের, ঠোঁটের, জিহ্বার, চোখের অনেকগুলি পেশীর সামঞ্জস্য ও সমন্বয় প্রয়োজন। সেটি সম্পূর্ণ হইতে সময় লাগে। এমন কি দুইবৎসর পূর্ণ হইলেও অধিকাংশ শিশু নিজ হাতে না ছড়াইয়া ছিটাইয়া খাইতে শেখে না। দেড় বৎসর বয়স হইতে সে কিছু কিছু দৌড়াইতে পারে এবং আর একটু বড় হইলে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে পারে কি? একা একা নাবিতে ভয় পায়। এক বৎসরের শিশুর কয়েকটি দাঁত গজাইয়াছে এবং কিছু কিছু শক্ত খাদ্য সে খাইতে শিখিয়াছে কিন্তু আড়াই বৎসর পর্যন্ত তাহার প্রধান খাদ্য তরল পদার্থ। দুই বৎসর পর্যন্ত অনেক শিশু বোতলেই দুধ খায়। ক্রমে সে চুমুক দিয়া খাইতে শিখে। কোন কোন শিশু দুই বৎসরের আগেও চুমুক দিয়া খাইতে পারে। এক বৎসর বয়সে শিশু লাঠি দিয়া আঘাত করিতে পারে, বল ছুঁড়িতে পারে, যদিও এখনও সে তাক করিয়া ছুঁড়িতে পারে না, বেশী দূরও ছুঁড়িতে পারে না। তাহার প্যারাম্বুলেটরটি ঠেলিয়া কিছুদূর নিতে পারে। তিন বৎসর বয়স হইলে তাহার পেশীগুলি অনেকখানি সবল হয় এবং তাহাদের ক্রিয়া অনেকখানি সুসমন্বিত হয়। কাজেই সে তখন স্বচ্ছন্দে ট্রাইসাইকেল চালাইতে পারে, মার্বেল খেলিতে পারে, ব্যাট দিয়া বলকে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে মারিতে পারে। অর্থাৎ এই বয়সটা ইন্দ্রিয় ও পেশীগুলির ক্রমশ পরিণতি ও সুমঞ্জস সম্বন্ধের সময়। মোটামুটি এ পরিণতি ও সমন্বয়ের একটি মসৃণ উন্নতির ছন্দ লক্ষ্য করা যায়।

এক বৎসরের পর হইতে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে থাকে। সে ক্রমেই তাহার আশে পাশের জিনিষগুলি চিনিতে শেখে, তাহাদের প্রভেদ বুঝিতে শেখে। এক বছরের শিশু জানে মা বাবা নয়, দুধ আর জল এক জিনিষ নয়। এক বৎসর বয়সে খুব অল্প জিনিষেরই সে নাম বলিতে পারে। ক্রমেই মা, বাবা, ভাই বোনেরা তাহাকে নানা জিনিষ দেখাইয়া বলে, 'ওটা পাখী' 'ওটা ঘোড়া,' 'এ পুতুল।' শিশু তাহার আধো ভাষায় অনুকরণ করিয়া বলে 'পাকি' 'ঘোলা', 'তুতু'। কোন কোন জিনিষের

সে অদ্ভুত নামকরণ করিয়া বসে, নিতান্ত অকারণে। যেমন ভৃত্য দয়ারাম্‌কে সে বলিবে 'ততা'! প্রত্যেক দ্রব্যেরই নির্দিষ্ট নাম আছে এবং প্রত্যেকের আলাদা গুণ ও ক্রিয়া আছে এ বোধ ক্রমে ক্রমে হয়। ইহাও শেখে অনুকরণের ফলে। মা বলেন, পাখী কা-কা 'বাঁশী-পুঁ-উ-উ', 'ঘোড়া-টক্‌-টক্‌'। খোকাও তাই শেখে। অনেক সময় ওই ক্রিয়া বা গুণই শিশুর কাছে দ্রব্যের নাম হইয়া দাঁড়ায়। যেমন আমার নাতি বাপ্পি দেডবছর বয়সে ঘোড়াকে বলিত 'তক্‌ তক্‌', সঙ্গে সঙ্গে পা দুলাইত। দেড বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন নাম জানিলেও সম্পূর্ণ বাক্য শিশুদের আয়ত্তের বাইরে থাকে। দুই বৎসরের সময় ছোট ছোট বাক্য শিশু বলিতে শেখে। দু'বছরের বাপ্পি এখন বলে, 'বেলেতে দাবো '(বেড়াতে যাবো)' 'ওপ্‌পে চল, '(উপরে ছাতে চল), 'নুটু দাও-ও' '(রুটি দাও)'। দ্রব্যের সঙ্গে গুণ ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ দু' বছরের শিশু কিছুটা বুঝিতে পারে। বাপ্পিকে এক গরম দিনে এক টুকরা বরফ কিনিয়া ওর হাতে দিয়া বলিয়াছিলাম—'বরফ—ঠাণ্ডা'। সে বরফ হাতে পাইয়া খুব খুসী, কপালে পায়ে, মাথায় বারে বারে বরফের টুকরাটি মাখিয়া সে বলিতে লাগিল 'বঅফ্‌ থান্‌দা।' তারপর হইতে রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলেই বরফের দোকানের দিকে হাত দেখাইয়া সে বলে 'বরফ থান্‌দা।' তারপর একদিন বাসায় কয়েকজন মহিলা বেড়াইতে আসিলে বাজার হইতে বরফ আনিয়া সরবৎ করা হইল। তৎক্ষণাৎ সে মায়ের কাছে গিয়া হাত পাতিয়া বায়না ধরিল 'ব-অফ্‌ থান্‌দা। সেদিন সে সরবতের মধ্যে বরফ দিয়া খাইতে শিখিল। এখন সে বরফ পাইলেই প্রথমে কপালে গালে মাখিবে, এবং নিষেধ সত্ত্বেও মুখে পুরিয়া দিবে। এ বয়স হইতে দ্রব্য হইতে পৃথক করিয়া গুণকেও বুঝিতে শেখে। বাপ্পি বরফ ঠাণ্ডা ইহা শিখিবার কদিন বাদেই খুব ঠাণ্ডা জল দিয়া তাহাকে স্নান করাইতেই সে চীৎকার করিয়া কান্না সুরু করিল 'থান্‌দা।' সে আগুনের কাছে গিয়া বলে 'গ-ও-ম্‌' (গরম), আবার গরম ইলেকট্রিক ইস্ত্রীতে হাত দিতেই তৎক্ষণাৎ হাত সরাইয়া চোখ বড় বড় করিয়া বলিল 'গ-ও-ম্‌'। বাল্যকাল হইতে অন্ধ ও বধির হেলেন্‌ কেলার তাঁহার আত্মজীবনীতে বাল্যকালে ভাষা শিক্ষার প্রথম অভিজ্ঞতা ঠিক অনুরূপ ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন তাঁহার আবাল্য শিক্ষিকা ও সহকারী বিভিন্ন জিনিষ তাঁহার হাতে স্পর্শ করাইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হাতের তালুতে ধীরে ধীরে জিনিষটির নাম লিখিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই

জিনিষের নামটি বারে বারে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিতেন। হেলেন্ কেলার আর একহাতের আঙ্গুল মিস্ সুলিভ্যানের ঠোঁটের উপর রাখিয়া শব্দের উচ্চারণটি অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিছুদিন যাবৎ এ শিক্ষা চলিতেছিল কিন্তু বড়ই ধীরে শেখার কাজ হইতেছিল। একদিন সকালবেলা মিস্ সুলিভ্যান কেলারের হাত জলের ট্যাপের নীচে ধরিলেন এবং অত্যন্ত দ্রুত আঙ্গুল দিয়া দু'তিনবার লিখিলেন water এবং স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে লাগিলেন 'ও-য়-ট-র' 'ও-য়-ট-র, কোল্ড্ 'কো-ল্-ড্' তীক্ষ্ণ শীতল স্পর্শ হঠাৎ যেন চেতনার একটি দ্বার খুলিয়া দিল কেলার বুঝিল হাতে যে তরল পদার্থের শীতল স্পর্শ লাগিতেছে, তাহার নাম water। কেলার শীঘ্র এ নামটি আয়ত্ত করিলেন এবং ইহাও বুঝিতে পারিলেন প্রত্যেক দ্রব্যেরই আলাদা নাম আছে। এবং সে একদিনেই তিনি অনেকগুলি জিনিষের নাম শিখিয়া ফেলিলেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন সেদিনই আমি বুঝিতে পারিলাম জলের যে শীতল ও স্পর্শ আমাকে প্রথম সচকিত করিয়াছিল সেই গুণের নাম 'Cold।' সেদিন হইতেই ভাষা আমার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া উঠিল।' তিন বৎসর বয়সে শিশুর ভাষা জ্ঞান দ্রুত অগ্রসর হয়। সে বিভিন্ন গুণের তারতম্য বুঝিতে শেখে, তাহাদের নামও শেখে। যেমন ঘোর লাল ও গোলাপীর তফাৎ সে বেশ বুঝিতে পারে। সে তখন স্পষ্ট বলে, 'বড থালায় ভাত খাবো—ছোট থালায় খাবো না।' তিন বৎসরে ভাষার উপরে অধিকার অনেক খানিই পরিপুষ্ট হয়। দুই বৎসর বয়সেই দ্রব্যের সঙ্গে গুণের ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ কিছু কিছু বোঝে যদিও শিশুর প্রকাশ ভঙ্গী তখন সম্পূর্ণ নয়—সে হয়তো বলিবে 'মোতরগাড়ী-হু-উ-ছ্'-'তুপি নাল্' (টুপী লাল)। ক্রমে দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের সম্বন্ধ, দ্রব্যের সঙ্গে ঘটনার কার্যকারণ সম্বন্ধও সে অস্পষ্ট ভাবে হইলেও বুঝিতে শেখে। আকাশে মেঘ দেখাইয়া বাপি বলে, 'ফোতা ফোতা বিট্টি' (ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি)। বেড়াইয়া আসিয়া দরজার তালা খুলিতে সে বাবার পকেট হইতে চাবি নিয়া আসিবে। কোয়েহ্লার শিম্পাঞ্জীর উপর নানা পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে তাহাদের শেখার ব্যাপারটা নিতান্ত যান্ত্রিক অনুকরণ বা অন্ধ 'ভুল ও সংশোধন' (blind error and trial) দ্বারা অগ্রসর হওয়া নয়, তাহার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি ও বুদ্ধির পরিচয় আছে, কারণ সে শেখার মধ্যে স্থান বা দেশের সম্বন্ধ (space relations), দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের সম্পর্ক, কার্যকারণ সম্বন্ধ বোধ অত্যন্ত আবছায়া হইলেও আছে এ রকম অনুমান করা অন্যায়

নয়। কোয়হ্লার একটি শিম্পাঞ্জীকে বড় ও উঁচু একটি তারের ঘরে আটকাইয়া সেই ঘরের ছাতে একটি বড় কলা ঝুলাইয়া দিলেন। শিম্পাঞ্জী বারে বারে লম্ফ ঝম্প করিয়া বা তারের বেড়া বাহিয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করিয়াও তাহার লোভনীয় খাদ্যটি সংগ্রহ করিতে পারিল না। সে ঘরের মধ্যে দুটি ভাঙ্গা কাঠের বাক্স ছিল তাহার উপর শিম্পাজী মাঝে মাঝে বসিত। অনেকক্ষণ লাফালাফির পর ক্লান্ত হইয়া নিতান্ত বিষন্ন মনে সে বাক্সের উপর বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর উঠিয়া সে বাক্সটি ধরিয়া টানিয়া ঠিক কলাটির নীচে রাখিল, তাহার পর বাক্সটির উপর উঠিয়া এবার কলাটি পাড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কলাটি অনেক উপরে থাকাতে এবারও সে সফল হইল না। এবার সে নামিয়া আর একটি বাক্সও টানিয়া আনিয়া প্রথম বাক্সটির উপরে সাজাইয়া এবং তাহার উপরে উঠিয়া হাত বাড়াইয়া কলাটি নাগাল পাইল, এবং পরম আনন্দে তাহা খাইতে লাগিল। ঠিক এ প্রকার বুদ্ধির পরিচয় দুই বৎসরের শিশুর মধ্যেও দেখা যাইবে। একটি আলমারীর মাঝের উপর তাকে পেয়ারার জেলী রাখা হইয়াছে, তাহা বাপ্পি দেখিয়াছে। ইহা তাহার নাগালের বাহিরে। কান্নাকাটি করার পরও মা তাহা উহাকে নামাইয়া দেন নাই। দুপুর বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া সে আলমারীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া পাল্লা খুলিয়া পায়ের আঙ্গুলের উপর দাঁড়াইয়া জেলীর বোতলটি পাড়িতে চেষ্টা করিল। না পারিয়া আলমারীর পাল্লা খুলিয়া খুব ঝাঁকাইতে লাগিল। তাহাতেও কোন ফল হইল না। হঠাৎ আলমারীর কাছে চৌকির নীচে আমার হাল্কা টিনের স্যুটকেশটি তার চোখে পড়িল। সে নীচু হইয়া তাহা টানাটানি করিতে সুরু করিল। তাহার পক্ষে স্যুটকেশটি যথেষ্ট ভারী তাই সে 'দাদু' 'দাদু' বলিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। আমি স্যুটকেশটি আলমারীর সামনে আনিয়া দিলাম কিন্তু তাহাতে আলমারীর পাল্লাটি আটকিয়া গেল। ইহাতে সে খুব বিরক্ত হইয়া আলমারীর একটি পাল্লা ধরিয়া টানিতে লাগিল। কিছুক্ষণ টানাটানির পর স্যুটকেশটি সরিয়া গিয়া পাল্লাটি সম্পূর্ণ সরিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ স্যুটকেশটিকে ধাক্কা দিয়া আলমারীর কাছে নিয়া গেল এবং তাহার উপর উঠিয়া জেলির বোতলটি ধরিল। অবশ্য জেলীর ক্যাপ সে খুলিতে পারিল না। তাহার বুদ্ধির পুরস্কার স্বরূপ চামচ দিয়া জেলী বাহির করিয়া বিস্কুটে মাখাইয়া তাহাকে দিলাম। আমার কোলে বসিয়া পরম তৃপ্তির সঙ্গে তাহা খাইতে লাগিল।

তিন বৎসর বয়স হইলে এ বুদ্ধি নিশ্চয়ই আরো অনেকটা পরিপক্কতা লাভ করিবে। বাস্তবিক পক্ষে বিনে (Binet) প্রথম যখন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মাপ আবিষ্কার করেন, তখন ৩ হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত শিশুর বুদ্ধির মাপের scale তৈরী করেন। অবশ্য তাঁহার পর অন্য মনোবিজ্ঞানীরা আরো নীচু বয়সের শিশুদের বুদ্ধি পরিমাপের চেষ্টা করিয়াছেন। তবে মোটামুটি ভাবে ইহা স্বীকৃত যে দুই বৎসরের পর হইতেই নির্ভরযোগ্য বুদ্ধির মাপ সম্ভব। টারম্যান্ মেরিল্ স্কেল্ এখন প্রায় সর্বদেশে স্বীকৃত বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence test)। তাহা হইতে তিন বৎসরের শিশুর বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা ও প্রশ্ন গুলি এখানে দিতেছি তাহাতেই বুঝা যাইবে তিন বৎসরের শিশুর বুদ্ধি কতখানি পরিণত হয়।

৩ বৎসর বয়সের পরীক্ষা (এল ফর্ম)

১। সুতো পরানো…পরীক্ষক একটি জুতোর ফিতে নিয়া, বিভিন্ন আকারের (গোল, চৌকা ইত্যাদি) পুঁতি (beads) একটার পর একটা গাঁথিবেন এবং বলিবেন, "এসো এই খেলাটা খেলি, দেখো"। শিশুকে আর একটি ফিতে দিবেন এবং পুঁতিগুলি গাঁথিতে উৎসাহ দিবেন। চারিটি পুঁতি গাঁথিতে হইবে। সময় দু'মিনিট।

২। ছবি দেখিয়া দ্রব্যের নামকরণ—সাধারণ ও পরিচিত দ্রব্যের ১৮টি ছবির কার্ড। প্রত্যেকটি কার্ড ৪ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া। পরীক্ষক প্রত্যেকটি ছবি আলাদা আলাদা করিয়া শিশুকে দেখাইবেন, এবং জিজ্ঞাসা করিবেন, "এটা কি? এটার নাম কি?" ১২ টি দ্রব্যের নাম বলিতে পারা চাই।

৩। কাঠের টুকরা নিয়া গঠন—পুল তৈরী। ১২ টি এক ইঞ্চি চওড়া কাঠের টুকরা এলোমেলো ভাবে ছড়ানো থাকিবে। পরীক্ষক তিনটি কাঠের টুকরা দিয়া পুল তৈরী করিয়া দেখাইবেন এবং শিশুকে একটি বিশেষ জায়গা দেখাইয়া সেখানে অনুরূপ পুল তৈরী করিতে বলিবেন। শিশুর তৈরী পুল নড়বড়ে হইলেও চলিবে, দুটি টুকরোর উপর ভর করিয়া আর একটি থাকিবে।

৪। ছবির স্মৃতি—জীবজন্তুর ছবি আঁকা চারিটি কার্ড। পরীক্ষক প্রথম ছবিটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন "এটা কি?" শিশু নাম না জানিলে তাহা বলিয়া দিবেন, যেমন, 'এটা গরু'। এবার ছবিটি সরাইয়া অন্য, তিনটি ছবির সঙ্গে মিশাইয়া বলিবেন, "এবার আমরা গরুর ছবিটি খুঁজিয়া বাহির করিব।"

সবগুলি ছবি শিশুর সামনে মেলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন "গরুর ছবি কোনটি?" অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয় ছবিটি দেখাইয়া নাম না জানিলে নাম বলিয়া দিবেন। তাহার পর বলিবেন "এবার আমরা গরু ও ঘোড়ার ছবি খুঁজিয়া বাহির করিব।" তাহার পর সব ছবিগুলি শিশুর সামনে মেলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন "কোনটি গরু?" "কোনটি ঘোড়া?" চারিটি পশুর নাম ঠিক ঠিক বলা চাই।

৫। একটি বৃত্ত দেখিয়া অনুরূপ একটি বৃত্ত অঙ্কন করা—পরীক্ষক একটি কপি বই শিশুর সামনে ধরিবেন তাহাতে একটি বৃত্ত ছাপা আছে। তারপর কপি বইয়ে খালি জায়গায় আর একটি অনুরূপ বৃত্ত আঁকিতে হইবে, তাহা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবেন।

৬। তিনটি সংখ্যার পুনরুক্তি করা—পরীক্ষক বলিবেন, "শোন, বল চার—দুই"; "এবার বল ছয়-চার-এক"; "তিন-পাঁচ-দুই"; "আট-তিন-সাত।" একবার পড়ার পর সব কয়টি সংখ্যা শুনিয়া শুনিয়া নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করা চাই।

অথবা

কাঠের মধ্যে ফুটো করা বোর্ডে, তিনটি বিভিন্ন আকারের কাঠের টুকরো জায়গামত বসাইতে হইবে। ইত্যাদি

দেড় বৎসর বয়সের পর হইতে শিশুর দিকজ্ঞান (Orientation) এবং অবস্থান জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বাপ্পিকে নিয়া বেড়াইতে বাহির হইলে (ছয় মাসের শিশুও সকালে বিকালে বেড়াইতে ভালবাসে) রাত্রি হইয়া গেলে, যখন তার ক্ষুধা বা ঘুম পায়, সে বারে বারে বাসার দিকে হাত দেখাইয়া বলিবে 'বাছা চলো, (বাসায় চলো), বেড়াইতে বেড়াইতে খুব অনেকবার দিক পরিবর্তন না করিয়া থাকিলে সে বাড়ীর দিকটা দেখাইতে বড ভুল করে না। তা ছাড়া পরিচিত জায়গা বা বাসাগুলি সে স্থানে পৌছিবার আগেই সে ঠিক ঠিক দেখাইয়া দিতে পারে বলে "এতা মন্দির, 'কাকু বাছা চলো, 'বিবি বাছা যাবো।"

একেবারে শিশু বয়সে কল্পনার ক্ষমতার স্পষ্ট প্রকাশ বোঝা যায় না। তবে খুব সম্ভবত ছয় মাসের শিশুও স্বপ্ন দেখে, ঘুমের মধ্যেও শিশু হাসে কাঁদে। দেড় বছরের পর শিশুর কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। সে লাঠিকে ঘোড়া বানায়, ভাঁজ করা কাগজের লেপাফাকে এরোপ্লেন কল্পনা করিয়া বলে 'লু-উ-উ-হু'!

তিন বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের পুতুল খেলায়।—তাহারা ধুলামাটি দিয়া ভাত তরকারী রাঁধে, পুতুলকে কোলে নিয়া আদর করে, শাসন করে, সাজায়, মারে। দু'বছরের বাপ্পিও বাবার দেখাদেখি বগলে একটি খবর কাগজ ভাঁজ করিয়া বলে 'অফিছ্-যাব।

বাস্তবিক পক্ষে এক হইতে তিন বৎসরের ছেলেমেয়েদের সব চেয়ে প্রধান সংস্কার হইতেছে কৌতুহল ও অনুকরণ। তাহাদের ইন্দ্রিয়াদির নবজাগ্রত ক্ষমতার দ্বারা তাহারা তাহাদের চতুপার্শ্বস্থ সমস্ত দ্রব্য ও ঘটনাকে অসীম মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করে, নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, তাহাদের সামান্য সাধ্যমত পরীক্ষা করে। এই কৌতূহল ও অনুকরণ বুদ্ধি ও কুশলতা বৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এবং এই পথেই শিশু সমাজ জীবনের রীতিনীতি রুচিও আদর্শের সহিত পরিচিত হইতেছে। অনুকরণই ভাষা শিক্ষার সোপান—সে যেমন শোনে তেমনই শেখে। আমরা দিল্লীতে আছি। ভৃত্যটি হিন্দীতে কথা বলে তাহার অনুকরণে বাপ্পি বলে 'পাণি লাও' 'নেই নেই' 'হঠ্ যাও' ইত্যাদি। আবার আমরা যখন বলি 'জল'—তখন সেও বলে 'জল'। একদিন ছাদ হইতে দেখিলাম একটি বলদের গাড়ীর গাড়োয়ান বলদটিকে নিষ্ঠুর ভাবে মারিতেছে। আমি জোরে জোরে বলিলাম "মানুষ, মেরো না, মেরো না"। আমার দেখাদেখি বাপ্পি ও বলিয়া উঠিল" মানুছ মেলো না, মেলো না।" শিশু কাজ করিতে এরকম ভাবেই শেখে। দিল্লীতে গ্রীষ্মকালে ছাতে শুইতে হয়। আমরা হাতে হাতে বালিশ চাদর নিয়া উপরে যাই, চারপয়গুলি পাতি, বিছানা পাতি, সঙ্গে সঙ্গে বাপ্পিও তাহার ছোট বালিশ, কাঁথা টানিয়া টানিয়া চারপয়র উপর রাখে, চারপয় ঠেলিয়া যথাস্থানে রাখিতে চেষ্টা করে। যেদিন ছাত ধোওয়ানো হয়, সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছোট ঘটি নিয়া ছাতে জল ঢালে, মার সঙ্গে রান্নাঘরে গিয়া উনুনে কয়লা দিতে যায়, সব্জী কাটিবার জন্য বায়না ধরে। এ বয়সের শিশু কখনো কখনো অন্যায় বায়না ধরে, মেজাজ মর্জি করে (temper tantrums) জিনিষপত্র ছিঁড়িয়া, ভাঙ্গিয়া, ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নষ্ট করে; জামায় কালি ঢালিয়া ফেলে, চিনির কৌটায় জল ঢালিয়া দেয় ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার মূলে আছে শিশুর অদম্য কৌতূহল এবং অঙ্গসঞ্চালনের মধ্য দিয়া নিজ শক্তি প্রমাণ করিবার আগ্রহ। তাহার কাছে এই সব 'অকাজ'ই ভীষণ প্রয়োজনীয়, তাই তাহাতে বাধা দিলে, তাহার প্রশ্নের উত্তর না পাইলে সে বিরক্ত হয়, চটিয়া যায়, মেজাজ মর্জি

করে। বুদ্ধিমান পিতামাতা শিশুর বাড়িয়া উঠিবার পথে নিতান্ত আবশ্যক এই কৌতূহল ও উদ্যমকে পদে পদে বাধা দিয়া শিশুকে অক্ষম করিয়া রাখেন না,—ধৈর্য্য ও ক্ষমার সঙ্গে তাহার কৌতূহল ও অনুকরণ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এ সময়ে শিশুকে সব কাজে বাধা দেওয়াও যেমন ভুল, তেমনি যাহা খুসী তাহা করিতে দেওয়াও ঠিক নয়। শিশুর মৌলিক আগ্রহ ও ক্ষমতা সুনিয়ন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে।

আমেরিকার গেসেল ইনষ্টিটুটে বিভিন্ন শিশুদের পরিণতি ও ব্যবহার নিয়া নিরন্তর বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে। তাঁহাদের প্রকাশিত Child Behaviour গ্রন্থে শিশুদের মেজাজ মর্জি সম্পর্কে Dr Ily Dr Ames কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের ভূয়োদর্শনের ফলে তাঁহারা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সব শিশুর পরিণতির হার (দৈহিক ও মানসিক) সমান নয় এবং কোন শিশুরই পরিণতির গতি মসৃণ নয়। কিছুদিন দেখা যায় শিশু, বেশ হাসি-খুসী সন্তুষ্ট, পরিবেশের সঙ্গে তাহার বেশ মিল হইয়াছে (well adjusted) তাহার জীবনধারার নির্দিষ্ট রুটিন সে বেশ মানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু আবার কিছুদিন খাওয়া নিয়া, ঘুম নিয়া, সে বিষম যন্ত্রণা করে, কেবল মেজাজ মর্জী করে, কিছুতেই সে সন্তুষ্ট নয়। এই শিশু মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন স্বাভাবিক শিশুর পক্ষেও এরকম বিশৃংখলার স্তর আসিবেই। অনেক সময়ই ইহা অসুখের লক্ষণ নয়, যদিও অসুখ হইলেও শিশুরা ছটফট কান্নাকাটি করে। স্বাভাবিক শিশুর এই মেজাজমর্জি তাহার দেহমনের পরিণতির ধারার সঙ্গে পরিবেশের সাময়িক গরমিলের লক্ষণ। এক বৎসর হইতে চার বৎসরের মধ্যে এরকম গরমিলের স্তর একাধিকবার প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। ইহা স্বাভাবিক পরিণতি ও বিকাশের ধারার অবশ্যম্ভাবী অনুসঙ্গী। ইহা শিশুর দেহমনের পরিণতির অধীর আগ্রহের বেদনাদায়ক মূল্য (growing pains)।

এক বৎসর হইতে তিন বৎসরের মধ্যে শিশুর আবেগ জীবন ও দ্রুত পরিণতি, ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও প্রকাশের বিভিন্নতা (differentiations in expression) লাভ করে। তিন চার মাস পর্যন্ত শিশুর জান্তব তুষ্টিজনিত অমুখর স্মিতহাস্য এবং অস্বস্তিজনিত সরব ক্রন্দন ভিন্ন আবেগের লক্ষণ শিশুতে দেখা যায় না। কিন্তু এক বৎসরের শিশুর মধ্যে রাগ, ভয়, বিরক্তি উল্লাসের প্রকাশ যথেষ্ট সুস্পষ্ট। ক্রমে যত বয়স বাড়ে অনুভূতির সংখ্যাও বাড়ে এবং

একই অনুভূতির মধ্যে সূক্ষ্মতর প্রভেদও দেখা দেয়। শিশুর আবেগ জীবনের (life of emotions) সুষ্ঠু ও সুস্থ পরিণতির উপব তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ শান্তি অনেকখানি নির্ভর করে। সুতরাং শৈশবকাল হইতেই আবেগের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ এবং সুনিয়ন্ত্রণ নিতান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে পিতামাতার সমধিক দায়িত্ব আছে। তাই ছোট ছেলেমেয়েদের ·বিষম মারধর করা অযথা তাহাদের আবেগ প্রকাশকে অতিরিক্ত শাসন দ্বারা রুদ্ধ করা অথবা অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া অথবা তাহাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত থাকা এ সবই অন্যায় এবং শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে হানিকর। বুদ্ধিমান পিতা-মাতা ও সুশিক্ষক শিশুদের সামনে অসংযত রাগ, ভয়, ঘৃণা এবং কাম প্রবৃত্তি কখনও প্রকাশ কবিবেন না। শিক্ষাব ক্ষেত্রে শিশুব আবেগের গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান আছে। "আধুনিক শিক্ষাবিধিতে প্রত্যক্ষভাবে অনুভূতির মধ্য দিয়া কি কবিয়া সৌন্দর্যপ্রীতি, শিল্প সাহিত্য ও সঙ্গীতে রুচিবোধ বিকশিত করা যায়, তাহাও শিক্ষাদানেব বিশেষ বিষয় বলিয়া স্বীকৃত।"

শিশুব এক হইতে তিন বৎসব বয়স সমাজজীবনে প্রবেশের প্রস্তুতির পক্ষে সবচেযে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই বয়সেব শিশুর অনুকরণ প্রবৃত্তি ও ভাষা শিক্ষার আগ্রহ দ্বারা সে অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধের সেতুর বিভিন্ন সূত্র স্থাপন করে। ছয় মাসের শিশু নিজেকে নিয়াই ব্যস্ত। যে মাতা তাহার খাদ্যদাত্রী এবং ঝি, চাকর, দাদু বা বাবা যে তাহাকে সকালে বিকালে বেডাইয়া আনেন ইহা ভিন্ন অন্য কাহারও সম্বন্ধে তাহার আগ্রহ কমই দেখা যায়। কিন্তু এক বৎসরের পর হইতে শিশু অন্য শিশু, কুকুর, বেড়াল, পাখীর সঙ্গে ভাব করিতে খেলা করিতে ভালবাসে। অবশ্য ঝগড়া মারামারি করিতেও এ বয়সেই শিখে। তাহার জিনিষ অন্য কোন শিশু নিলে অনেক সময়ই সে তাহা সহ্য করে না, আবার অন্য শিশুর হাতে নূতন খেলনা দেখিলে সে তাহা কাড়িয়া নিতেও প্রস্তুত, কারণ সে ব্রহ্মজ্ঞানী, আত্মপর ভেদ তাহাব নাই, সে জানে "অয়ং নিজপরোবেতি গণনা লঘুচেতসাং।" এই বয়স হইতেই কিন্তু সে ডিপ্লো-ম্যাসীর প্যাঁচগুলি কিছু কিছু আয়ত্ত করিতে থাকে। কাহার কাছে গেলে আদব পাওয়া যায়, কে তাহার আবদাব সহ্য করিবে, কখন মাথা হেলাইয়া হাসিয়া মন ভিজাইতে হইবে, কে প্রবল, কাহাব নিকট হইতে কাড়িয়া নেওয়া যাইবে না তাহা দুই বছরের শিশু বেশ বোঝে। ছয় মাস বয়স হইতেই শিশুকে যথাস্থানে পায়খানা প্রস্রাব করিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। এক বৎসর

বয়সে যখন সে হাঁটিতে শিখিয়াছে, সমস্ত জিনিষে হাত দিতে শিখিয়াছে, তখন হইতেই কোন্ জিনিষে হাত দিতে নাই, কোথায় যাইতে নাই, এ সব সামাজিক ভদ্রতার রীতি শিশুকে শেখানো প্রয়োজন। অনেক বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের যখন তখন খাইতে দেওয়া হয়। উলঙ্গ হইয়া ঘুরিতে দেওয়া হয়, সমস্ত জিনিষে হাত দিতে দেওয়া হয়, সমস্ত রকম উৎপাৎ তাহাদের 'ষাট' 'ষাট' বলিয়া সহ্য করা হয়। এ রকম অন্ধ-স্নেহের ফলে সে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ও অভদ্র কদভ্যাস আয়ত্ত করে যাহা ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদের দুঃখের কারণ হয়। অতিরিক্ত শাসন, অতিরিক্ত ভদ্রতা, অতিরিক্ত 'পুতুপুতু'ও ভাল নয় তাহাতে শিশুর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা হয়, সে অত্যন্ত পর-নির্ভর হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান পিতামাতা এ বয়স হইতেই উপযুক্ত শাসন ও স্নেহের সহায়তায় স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার সহজ মৌলিক বিধিতে শিশুকে অভ্যস্ত করান। অনেক শিশু অন্য বাড়ীতে গিয়া জুতো শুদ্ধ বিছানায় উঠিয়া বসে, অথবা অন্য কাহাকেও খাইতে দিলে তৎক্ষণাৎ হাত পাতিয়া বসে। শিশুদের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু ইহাতে প্রতিবেশীরা বিরক্ত হয় এবং পিতামাতা সাবধান হইলে শিশুদের এ সব অভ্যাস হইতে নিরত করিয়া কিঞ্চিৎ 'ভদ্র' করিয়া তোলা যায়। কিন্তু এটা বাহ্য। এই বয়স হইতে শিশুকে প্রকৃত ভদ্রতা অর্থাৎ অন্যের প্রতি প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। কোন কোন বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা অন্য বাড়ীর ছেলেমেয়েকে দেখিলে লাথি দেখায়, ভ্যাংচায়, ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়। এ সব ছেলেমেয়েদের মা সন্তানদের এ কুৎসিৎ আচরণ দেখিয়াও দেখেন না। মায়ের প্রশ্রয় পাইলে শিশুরা সেকাজে বরং উৎসাহ পায়। কিন্তু এমন নির্বোধ মায়েরা বোঝে না যে তাঁহাদের সন্তানেরা যে কুৎসিত ইতর আচরণে অভ্যস্ত হইতেছে ইহার চেয়ে কুশিক্ষা আর কিছু হইতে পারে না। শিশুর নিজস্ব ন্যায় অন্যায় বিচারের ক্ষমতা জন্মায় না, তাহার পিতামাতার ব্যবহার হইতেই সহজে ইহা সংগ্রহ করে। পরবর্তী জীবনে গম্ভীর উপদেশ দিয়া শিশুর নীতিবোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা বৃথা। শিশু এইটুকু বোঝে, কোনটায় তাহার বাবা মা খুসী হন, কোনটায় তাঁরা বিরক্ত হন। ইহাই তাহাদের নীতিবোধের মাপকাঠি। কাজেই পিতামাতার নীতিবুদ্ধি যদি শিথিল হয় তাঁহাদের ব্যবহারে যদি নীচাশয়তা, অভদ্রতা, আত্মম্ভরিতা, ঈর্ষা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে শিশুর মনে নৈতিক আদর্শের মূল কখনও দৃঢ় হইতে পারে না ফ্রয়েড এবং অন্য সমস্ত মনোবিজ্ঞানীরা

শিশুর নৈতিক বুদ্ধি বিকাশে পিতামাতার চরিত্র ও ব্যবহারের উপর অতিশয় গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। অনেক বাপ মায়ের ধারণা অন্য বাড়ীর ছেলেমেয়েরা নোংরা, অসভ্য, ইতর, গরীব সুতরাং তাহাদের সর্বগুণধর ছেলে বা মেয়েটি তাহাদের সঙ্গে 'খারাপ' হইয়া যাইবে। এই যে পিতামাতার মনে অন্য সমস্ত মানুষ সম্পর্কে ঘৃণা ও তুচ্ছতার ভাব তাহা তাঁহাদের ব্যবহারে ও কথাবার্তায় অত্যন্ত পরিস্ফুট এবং অল্প বয়সের শিশুর মনে ইহার প্রভাব গভীর। আমি 'পদস্থ' বহু ভদ্রপরিবারে এই মনোভাবটি লক্ষ্য করিয়াছি এবং ইহাও দেখিয়াছি সে পরিবারের ছোট ছেলেমেয়েরাও কী প্রচণ্ড 'স্নব্' তৈরী হইতেছে। শিশুকাল হইতেই এ আদর্শে তাহারা বিশ্বাস করিতে শেখে যে মানুষের দাম টাকায়, গাড়ীতে দামী কাপড-চোপরে। এই 'পদস্থ' ব্যক্তিরা তাঁহাদের সন্তানদের যে কতখানি সর্বনাশ করিতেছেন তাহা তাঁহারা জানেন না।

অনেক বয়স্ক ব্যক্তিরই ধারণা শিশুরা কিছুই বোঝে না, কাজেই তাহাদের সামনে যে কোন বিষয়ে যে ভাবে খুসী আলোচনা করা চলে। ইহা একটি মারাত্মক ভুল ধারণা। দুই তিন বৎসরের শিশু তাহার নবজাগ্রত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দ্বারা তাহার চাঁরিদিকের সম্বন্ধ বস্তু ও ঘটনাকে লক্ষ্য করে, অস্পষ্ট ভাবে হইলেও তাহার তাৎপর্য বোধ চেষ্টিত হয়। সে বিচার করিয়া স্পষ্ট বিশ্লেষণ করিয়া খুব পরিষ্কার করিয়া সমস্ত কথা, সমস্ত আলোচনা বুঝিতে না পারিলেও ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া অস্পষ্ট ভাবে যাহা সে বোঝে তাহা তাহার মনে গভীর রেখায় অঙ্কিত হয়। বিখ্যাত সমাজ ও মনোবিজ্ঞানী ডাঃ জেমস্ বোসার্ড এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে "আমাদের পারিবারিক জীবনে যে সমস্যাটির দিকে আমরা মোটেই দৃষ্টি দেই না, সেটি হইতেছে, পিতামাতারা তাহাদের শিশুদের সঙ্গে এবং শিশুদের সামনে অন্যান্য মানুষদের সঙ্গে বা অন্য মানুষদের সম্বন্ধে কি ভাবে আলোচনা করেন"। তিনি এ বিষয়ে কিছুদিন যাবৎ বিভিন্নস্তরের অনেক পরিবারের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে পরিবারে যখন আমরা খাবার টেবিলে সকলে একত্র হই তখন আমাদের আলাপ বিশেষ কয়েকটি ধারা (patern) অনুসরণ করে। (১) সবচেয়ে বেশী যে ধারাটি দেখা যায়, সেটি হইল পরনিন্দা ; অন্য সমস্ত মানুষের দোষ অনুসন্ধান ও উদ্ঘাটন, এই নিন্দার হাত হইতে দেশের শাসক, উপরওয়ালা, বন্ধু, প্রতিবেশী, আত্মীয়, মুদি, ডাক্তার, চাকর কেহই অব্যাহতি পান না। এ পরনিন্দার মধ্যে এ আত্মতুষ্টি অত্যন্ত প্রকট, যে পৃথিবীতে আমরাই শুধু ভদ্র, বিবেচক

ও বুদ্ধিমান। অন্য সকলে চোর, নির্বোধ, অসভ্য। এ সমস্ত আলাপের ফল শিশুদের উপর যাহা হয় তাহা হইল তাহারা ভবিষ্যতে তিক্ত, অসামাজিক, কটুভাষণে অভ্যস্ত ও জননিন্দিত হয়।

(২) দ্বিতীয় ধারা হইতেছে খাবার টেবিলে বসিয়া নিত্যকলহ, পিতা মাতার পরস্পরের প্রতি দোষারোপ ও অশিষ্ট ভাষা ব্যবহার। ইহার ফলও সহজেই অনুমেয়। এসব পরিবারের শিশুদের ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবন সুখের না হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক।

(৩) তৃতীয় ধারাটির শিশুদের উপর প্রতিকূল প্রভাব সূক্ষ্মতর কিন্তু ইহার কুফল সামান্য নয়। এ ধারাটি হইতেছে এখানে পরিবারের প্রত্যেকেই নিজের নিজের বাহাদুরী দেখাইতে (showingoff) ব্যস্ত। কথায় বার্তায় সকলেরই চেষ্টা, চমক লাগাইবার। কোন বিষয়েই আলোচনায় গভীরতা থাকে না, নিতান্তই পল্লব গ্রাহিতা। এঁদের ডাঃ বোসার্ড বলিয়াছেন—'the exhibitionists'। এসব পরিবারে বাবা মার চেষ্টা হয় অল্প বয়স হইতেই ছেলেমেয়েদের ইংরাজী কবিতা বা নরওয়েজীয়ান্ গানের সুর বা হুলা হুলা নাচের তাল (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল ও বিকৃত) কিছু শিখাইয়া বন্ধু বান্ধবদের সামনে তাহাদের সন্তানদের কৃতিত্ব দেখাইয়া বাহবা কুড়ানো। ইহাতে তাঁহাদের মস্ত আত্মসন্তুষ্টি ঘটে যে তাহারা খুব cultured। ইহাতে প্রথমতঃ শিশুদের মনে বাস্তবিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে সস্তা ও মিথ্যা ধারণা জন্মানো হয় এবং দ্বিতীয়তঃ সহজ সরল স্বাভাবিক প্রকাশকে অবজ্ঞা করিতে শেখানো হয়। এ সমস্ত শিশু নিতান্ত তরল রুচি নিয়া বাড়িয়া ওঠে এবং চালিয়াতীকে 'শিক্ষার' লক্ষণ বলিয়া ভুল করে, এবং নিতান্ত কৃত্রিম ও আন্তরিকতাহীন আত্মপ্রকাশে অভ্যস্ত হয়।

অনেক পিতামাতার কাছে তাঁহাদের সন্তানেরা' তাঁহাদের খেলার পুতুল মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে এমন পিতা মাতার শিশুদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা নাই। কথাটা অদ্ভুত শুনাইলেও, ইহা গভীর ভাবে সত্য। শিশুদেরও ব্যক্তিত্ব আছে এবং প্রত্যেক চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতী একথা বলিবেন যে শিশুর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইবার অধিকারকে স্বীকারই বর্তমান যুগে শিশু শিক্ষার ভিত্তি। আমরা অনেক সময়ই আমাদের ইচ্ছাও ব্যক্তিত্ব শিশুর উপর চাপাইয়া দেই। নিজেদের দম্ভ ও আত্মম্ভরিতা পোষণের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করি। কিন্তু প্রত্যেক শিশুই একটি বিশিষ্ট সত্তা। প্রত্যেক শিশুর

নিজস্ব বিকাশের ধারা আছে। কতজন পিতামাতা আপন সন্তানের রুচি, ইচ্ছা, সম্ভাবনা, বিকাশের ধারা যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করেন এবং তাহাকে কল্যাণময় পরিণতিতে বিকশিত করিয়া তুলিতে চেষ্টিত হন? পিতা মাতার কর্তব্য মোটেই সহজ নয়। একদিকে শিশুর জীবনের প্রাথমিক দাবী ভালবাসা, নিরাপদ আশ্রয়ের (love and security) এখানে সে পিতা মাতার উপর নির্ভরশীল, এ দাবী পিতামাতাকে পরিপূর্ণভাবে মিটাইতে হইবে। অন্যদিকে তাহার বিপরীত দাবী স্বাধীনতার,—সে কৌতূহলী, সে প্রশ্ন করিতে চায়, পরীক্ষা করিতে চায়, নিজের শক্তিকে যাচাই করিতে চায়, বাড়াইতে চায়। এখানে সে আত্মনির্ভর প্রয়াসী। পিতামাতাকে এ দাবীও মিটাইতে হইবে। কাজেই বুদ্ধিমান পিতামাতার কর্তব্য হইতেছে এই দুই বিপরীত দাবীর সুসমন্বয়। শিশুকে অকুণ্ঠ স্নেহ ভালবাসা দিতে হইবে, আবার কঠিন হইয়া শাসনও করিতে হইবে। তাহাকে স্বাধীনতা দিতে হইবে আবার তাহাকে বাধাও দিতে হইবে, পরিচালনাও করিতে হইবে। শিশু তো নির্বোধ, সে কি জানে তাহার পক্ষে কল্যাণকর, স্বাস্থ্যপ্রদ, সুশৃঙ্খল বিকাশের পথ কোনটি? প্রকৃতির শক্তি তাহার দেহ মনের মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়াছে। কিন্তু সে শক্তি তো প্রায় অন্ধ, অনির্দিষ্ট। ইহাও তাই শিশুর মৌলিক অধিকার যে সে দাবী করিবে যে পিতামাতার পরিণত বুদ্ধি বৃহৎ অভিজ্ঞতা ও স্বাভাবিক কল্যাণ-কামনা তাহার শক্তি ও ইচ্ছাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে সাহায্য করিবে। ডিউই তাই বলিয়াছেন শিশুপালনে ও শিশুর শিক্ষার পিতামাতা শিক্ষকের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় দর্শকের নয় সক্রিয় ও চক্ষুষ্মান্ সহযোগিতার ও সুপরিচালনার।

অনেক সময় পিতামাতা মনে করেন শিশু বড় হইয়া ইস্কুলে ভর্তি হইলে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। ইহা সত্য, ভাল ইস্কুলে সুশিক্ষকের নেতৃত্বে এবং সমবয়স্ক অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলাধূলা (এবং কিছুটা ঝগড়া মারামারিও) করিয়া শিশুর দেহ ও মন বিকশিত হইয়া উঠিবে কিন্তু পিতা মাতাকে এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে শিশুর ব্যক্তিত্বের ভিত্তিস্থাপন বহু পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। এ ভিত্তির উপরই শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন কি রকম হইবে তাহা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। কাজেই সেখানে ত্রুটি ঘটিয়া থাকিলে, ভবিষ্যতে তাহা সংশোধনের উপায় খুব বেশী নাই। ভিৎ কাঁচা থাকিলে ইমারত দুর্বল হইবেই। আর শিশু তিন বছরের হইয়া স্কুলে গেলেই

কি শিশুসম্বন্ধে পিতামাতার কর্তব্য শেষ হইয়া গেল? শিশু পিতামাতার শ্রেষ্ঠ আনন্দের উৎস, আবার কঠিনতম দায়িত্বেরও আধার। সুসন্তান গড়িয়া তুলিবার মস্ত দায়িত্ব পিতামাতার এবং ইহাও সত্য ইহাতেই পিতামাতার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ও গৌরব।

শিক্ষা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহ নেই এমন লোক আছে কিনা সন্দেহ। পিতামাতা, শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিচালক, ধর্মোপদেষ্টা, ছাত্র, রাজনীতিবিদ্ সকলেই শিক্ষাসম্পর্কে কোন না কোন মত প্রকাশ করেন। তাই এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে শিক্ষা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু ধারণা প্রত্যেকেরই আছে। শিক্ষাতত্ত্বের গোড়ার কাজটা হচ্ছে শিক্ষাসম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণাগুলি বিশ্লেষণ ও বিচার করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছান। শিক্ষা কি এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য কি এ সম্বন্ধে অস্পষ্ট বা বিকৃত ধারণাই শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক ত্রুটির জন্য দায়ী। কিন্তু শিক্ষার মত একটি মৌলিক ও সাধারণ ধারণার বিশ্লেষণ ও সুস্পষ্ট প্রকাশ একেবারেই সোজা কথা নয়। একটি সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় আমরা শেষ পর্যন্ত পৌছিতে পারব কিনা সেটা বড় কথা নয়,—কিন্তু তার সন্ধানের প্রয়োজন আছে, কেননা সেই সন্ধানের পথেই হয়তো বিচারে বহু ধারণাই অসম্পূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হবে।

শিক্ষা কথাটি ব্যাপক ও সংকীর্ণ দুটি ভাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাপক অর্থে হচ্ছে মানুষের শৈশব থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত তার বিকাশের সমগ্র পদ্ধতিটিকেই শিক্ষা বলা যেতে পারে। এই অর্থেই রুশো ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিই আমাদের শিক্ষক। এই অর্থেই বাউলরা গেয়েছেন

"কারে গুরু বলে প্রণাম করবি মন?
অথিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন!

কিন্তু সংকীর্ণ ও নির্দিষ্ট অর্থে, সাধারণ ভাষা অনুযায়ী বা আইনগতভাবে মানুষ স্বীয় চেষ্টায় বা তার পরিবেশ থেকে অনায়াসে যা আয়ত্ত করে তাকে শিক্ষা বলা হয় না। সমাজের অল্পবয়স্কদের কাছে, বড় যাঁরা, তাঁরা সচেতন

ভাবে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নির্দিষ্ট প্রণালীতে যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন, তাকেই বলা হয় শিক্ষা। শিশুর বিকাশের উদ্দেশ্য তাকে একটি বিশেষ দিকে সচেতন করে, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গড়ে তোলার জন্যে গুরুজন ব্যক্তিরা যে চেষ্টা করেন তাকে শিক্ষা বলা হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্নটি, পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজসেবী, শ্রমিকদের যাঁরা চালান, ধর্মনেতা ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুস্থানীয়েরা ঠিক একই চোখে দেখেন না। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্‌, দরিদ্র পিতামাতা বা সাধারণ মানুষকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তাঁরা এ প্রশ্নের গভীরে প্রবেশ না করে নিঃসঙ্কোচে উত্তর দেবেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভবিষ্যতে জীবিকা অর্জন। এবং যে বিষয় যতটা প্রত্যক্ষভাবে এ বিষয়ে সাহায্য করে—শিক্ষা হিসাবে তার মূল্যও তত বেশী। কাজেই সাধারণ শিক্ষার থেকে কারিগরী শিক্ষার দাম বেশী; ইতিহাস শিক্ষার চেয়ে টাইপ রাইটিং শেখার দাম বেশী। এ জাতীয় মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের অনেকেই বলবেন, ছাত্রদের প্রাথমিক স্তরে লিখতে পড়তে না শিখিয়ে বাগান করা বা সেলাই করা শেখানো অনেক বেশী দরকারী।

এ মতবাদ সবটাই ভ্রান্ত এমন কথা বলা চলে না। যে শিক্ষা জীবিকার কোন কাজেই কোন ভাবে লাগে না সে শিক্ষা সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করা অন্যায় বা অশোভন নয়। কিন্তু শুধু "পেটের ভাতে"র জন্যে শিক্ষা লাভ করে কেউ কি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকতে পারে? দশ জনের সঙ্গে সমানে মিলে পৃথিবীর নানা বিষয়ে জানতে কে না চায়? 'Man does not live by bread alone' বাইবেলের এই কথাটা একেবারে ফাঁকা কথা নয়। তা ছাড়া এই গণতন্ত্রের যুগে মুদির ছেলে মুদিই হবে, চামারের ছেলে চামারই হবে এমন আশা আর করা যায় না। তাই কোন একটা কারিগরী শিক্ষাই ছেলেকে শিখিয়ে কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারে না। নানা বিষয়ে বুদ্ধিদীপ্ত আগ্রহ, এবং অবসর সময়টি পরিতৃপ্ত ও সুষ্ঠুভাবে কাটানোর উপর তার কার্য্যদক্ষতা ও নির্ভর করে। কাজেই যে শিক্ষায় মনের প্রসারতা বিধানের কোনই ব্যবস্থা নেই তা কখনও সম্পূর্ণ ও সার্থক শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে না।

আবার শিক্ষকেরাও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সময় অন্য প্রকারের এক সংকীর্ণতার পরিচয় দেন। শিক্ষা মানে, অধিকাংশ শিক্ষকের ধারণা, জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জ্জন এবং শিক্ষার প্রকৃষ্ট পরিচয় মেলে পরীক্ষা পাশে। কিন্তু শুধু

বিদ্যার্জনেই কি শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়? বিদ্যালাভের দ্বারা শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তির সুসম বিকাশই কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটে? বরঞ্চ দেখা যায় এই পুঁথিপড়া বিদ্যাই যাদের পুঁজি, তারা জীবন-যুদ্ধে দাঁড়াতে পারছে না। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় পরীক্ষা 'পাশ'কে কৃত্রিম অসামান্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যার ফল শুভ হচ্ছে না। শুধু পরীক্ষার ব্যবস্থা দিয়ে 'মানুষ' গড়ে তোলা যায় না। মস্তিষ্কের ক্ষমতা অবহেলার জিনিস নয় কিন্তু মানুষের জীবনের এই একমাত্র কাম্য নয়। শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ যাঁরা এ বিষয় নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন, তাঁরাই শিক্ষার এ জাতীয় সংজ্ঞা যে অর্ধসত্য মাত্র তা স্পষ্টই প্রকাশ করেছেন। শিক্ষার পূর্ণ সংজ্ঞা পেতে গেলে তা মানুষের সামগ্রিক জীবনের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত করেই তাকে পেতে হবে। হার্বার্ট স্পেন্সার তাই সংজ্ঞা দিলেন শিক্ষা হচ্ছে "পরিপূর্ণ জীবনের প্রস্তুতি—a preparation for complete living"। এ সংজ্ঞা সবদিক থেকে সন্তোষজনক না হলেও এ থেকে এটা বোঝা যায়, যে শিক্ষায় জীবনের কেবল একটি দিকের উপর ঝোঁক দিলে সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী হবে। কিন্তু বিপদ হচ্ছে সমগ্র জীবনের 'সুসম বিকাশ' বললে ভাবগত কোন বিরোধ হয় না বটে, কিন্তু শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালে স্পার্টার অধিবাসীরা কিশোরদের বুদ্ধিবৃত্তি ও কৌশল ও শারীরিক শক্তি বিকাশে জন্যে চৌর্যকার্যে তাদের উৎসাহিত করতেন অথবা বিলাতের পাব্লিক স্কুলগুলিতে খেলাধূলার উপর খুব বেশী জোর দেওয়া হয়। তবে কি এটাই বুঝতে হবে শিক্ষার্থীদের নানা শক্তি ও সদ্‌গুণ বিকাশের জন্যে কি বিষয়বস্তু শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীর আচরণ সে শিক্ষা দ্বারা কি ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তা বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই? জীবনের সুসম বিকাশের কি কোন মূলসূত্র নেই? এমন একটি একক লক্ষ্য কি নেই যা শিক্ষার্থীর সমস্ত আগ্রহ ও শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে তুলতে পারে? সমস্ত শিক্ষাব্রতীই প্রায় একমত যে এই একমাত্র লক্ষ্যটি ধনোপার্জন নয়, পেশীর শক্তি অর্জন নয়, এমন কি পরিপূর্ণ বুদ্ধির চর্চা বা অনুভূতির সৌকুমার্যও নয়। শিক্ষার্থী মূলতঃ হচ্ছে আচরণশীল প্রাণী—a behaving organism। এবং সে শিক্ষাই সার্থক যা শিক্ষার্থীর সমগ্র আচরণকে সতেজ ও শোভন করে তুলতে পারে। এক কথায় শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ আদর্শ হচ্ছে সরল ও পবিত্র চরিত্র গঠন। স্বাস্থ্য, বিদ্যা, সরলতা, পরোপকার, প্রবৃত্তি এ সমস্ত, আদর্শ চরিত্র গঠনের আদর্শ দ্বারা অস্বীকৃত হচ্ছে না। বরং

বলা চলে এ সমস্ত আদর্শই চরিত্র গঠন রূপ সম্পূর্ণ আদর্শের অঙ্গ। হয়তো কেউ কেউ বলবেন শিক্ষালাভ ও নৈতিক আচরণ এ দুটি তো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। কিন্তু সত্যই কি তাই? লেখাপড়া বা খেলাধূলার মধ্য দিয়েও কি একই নৈতিক উৎকর্ষের আদর্শই অনুসৃত হয় না? যেখানেই বিচারবিবেচনা-প্রসূত আচরণ, সেখানেই আছে নৈতিকতার আদর্শ। স্বাস্থ্যচর্চা বা বিজ্ঞান-চর্চা দুই-ই বিচারবিবেচনাপ্রসূত আচরণ, দুই-ই নৈতিকতার আদর্শ-উদ্ভূত। এবং সমস্ত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমস্ত আচরণের মধ্যে নীতি অনুসরণের অভ্যাস। নীতির আদর্শ অনুসরণ করে খেলাধূলা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, যাহাই শিক্ষার্থী শিখুক না কেন, তা তাকে একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে। ইতিহাস যে ফাঁকি না দিয়ে শিখেছে, দেশভ্রমণ তার কাছে অনেক বেশী মনোরম ও জীবন্ত মনে হবে। চরিত্রগঠন মানেই হচ্ছে সর্ববিষয় প্রাণের স্পর্শে জীবন্ত করে তোলা। চরিত্রগঠন কথাটি তাই নীতিবাগীশদের মত অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে না। জীবনে যাই-ই আমরা করি, তাতে যদি ফাঁকি না দিয়ে থাকি তবেই আমরা চরিত্রবান্। তাই আনন্দলাভ, খেলাধূলা ইত্যাদি ব্যাপারেও সম্পূর্ণ ফললাভ তখনই হবে, যখন তার পিছনে থাকে নিষ্ঠা, একাগ্রতা, ফাঁকি না দেবার অভ্যাস—এক কথায় সুগঠিত চরিত্র।

তা ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা, দেহচর্চা শিক্ষা—এর কোনটাই শেষ উদ্দেশ্য নয়। সমস্ত শিক্ষারই পরিণতি হচ্ছে কোন ব্যবহার বা আচরণে। যে শিক্ষা কেবল বইয়ের পাতার মধ্যে বা মস্তিষ্কের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল তার কোন মূল্য নেই। প্র্যাগম্যাটিস্টরা বলেন, তাই শুধু সত্য, যা কাজে লাগে। শিক্ষা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। বর্তমান মনোবিজ্ঞানও চেতনা ও অনুভূতির উপর ইচ্ছা বা ক্রিয়াশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করে। কাজেই শিক্ষককে তেমন শিক্ষাই দিতে হবে, যা শিক্ষার্থীর আচরণকে সতেজ ও প্রাণপূর্ণ করে তুলবে—তাকে জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে, অপরের সঙ্গে আনন্দ ও গঠনের সম্পর্কে যুক্ত করবে, তার গৃহ, পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব, কর্তব্য, প্রীতিবন্ধনে উদ্বুদ্ধ করবে।

এটা খুব ভুল ধারণা যে শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে মন না দিয়ে আমরা চরিত্রগঠনের কথাই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে প্রচার করছি। চরিত্রগঠন হাওয়ার উপর গড়ে ওঠে না, তার সুদৃঢ় ভিত্তি হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ে সুসমন্বিত জ্ঞান,

দেহচর্চা, সুকুমার অনুভূতির বিকাশে। কাজেই শিক্ষক শুধু চরিত্রগঠনের উপদেশই শিক্ষার্থীদের দেবেন, তা নয়। যে কথাটা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে এই যে নীতি-বিহীন শিক্ষার কোন মানে নেই। শিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য সুনীতির বিকাশ, তা সে কলাচর্চাই হোক, বা স্থপতিবিদ্যাই হোক।

কিন্তু Mrs Bryant তাঁর Educational deals-নামক গ্রন্থে প্রশ্ন তুলেছেন —চরিত্র বা সুনীতির কোন নির্দিষ্ট মান আছে কি? শ্রেষ্ঠ নীতি বা চরিত্র কি? ভাল ও মন্দের সীমারেখাটি কোথায় টানতে হবে? তা নিয়ে নীতিবিজ্ঞানীদের মধ্যেই প্রচুর অমিল দেখা যায়, কাজেই তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে নীতি বা চরিত্রের কথাটা বাদ দেওয়াই ভাল। 'ভাল' ও 'মন্দের' চূড়ান্ত দার্শনিক মীমাংসা যাই হোক না কেন, ভাল ও মন্দের মধ্যে প্রভেদ যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না। এ তর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা হোক্ বা না হোক্, মানুষকে বাঁচতে হবে এবং শিক্ষকের কাজই হচ্ছে 'ভাল' ভাবে বাঁচবার শিক্ষা দিয়ে ছাত্রদের গড়ে তোলা। প্রত্যেক দেশ, কাল ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সব গুণী ব্যক্তিরা আছেন, তাঁদের মধ্যেই সে দেশ, কাল ও সমাজের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সততা, পরিশ্রম, ধৈর্য, আত্মসংযম, অপরের প্রতি প্রীতি—এ আদর্শগুলি ব্যতীত কেউ কোনকালে গুণী বা প্রধান হতে পারে না। কাজেই সমস্ত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে এই গুণগুলি বিকাশে সচেষ্ট হলেই তিনি তাঁর কাজ সম্পন্ন করেছেন, বলা যায়।

প্রত্যেক ব্যক্তি তার শক্তি, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন অনুযায়ী নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে গড়ে উঠলেই শিক্ষা সার্থক ও সম্পূর্ণ। চরিত্রগঠন বললে ব্যক্তির কথাই বলা হয়। কিন্তু ব্যক্তি তো বিচ্ছিন্ন একক নয়—সমষ্টির পরিমণ্ডলেই তার সার্থকতা ও পূর্ণ বিকাশ। কাজেই যখন বলা হোল, ছাত্রের জীবনগঠনই শিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য, তখন সমাজের সঙ্গে তার সম্বন্ধের কথা চিন্তা করতেই হবে। খৃষ্টানধর্মে 'ব্যক্তি'র বিকাশের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানেও প্রীতি, দয়া, পরোপকার ইত্যাদি গুণের কথা আপনিই এসে যাচ্ছে। প্লেটো ও অ্যারিস্টটল এ বিষয়ে অনেক বেশী সচেতন। তাঁরা ব্যক্তি ও সমাজকে বিচ্ছিন্ন করে কখনও দেখেন নি। হিন্দুধর্মেও ব্যক্তি সমাজবন্ধনের অচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সমাজভিত্তিক। ব্যক্তির চরিত্রবিকাশ সমাজকল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাই যায় না। কাজে২

শিক্ষার উদ্দেশ্য সুনাগরিক সৃষ্টি (making of good citizens), বললে সেটা খুব অন্যায় হবে না।

তবে এর একটা বিপদও আছে। বর্তমানকালে বিভিন্ন দেশ বা জাতি নিজেদের বৈশিষ্ট্য উগ্রভাবে প্রচার করে একটা বিরোধের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। এই সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ (militant nationalism) শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেও নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। প্রত্যেক দেশ বা জাতিই তার নিজ দেশ বা জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের এক একটি বিশেষ মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে গড়ে তুলতেই প্রয়াসী হয়েছেন (regimentation)। কম্যুনিস্ট রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা যাতে কম্যুনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীতেই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হয়, সমস্ত শিক্ষার কাঠামো সেখানে তেমনি করেই তৈরী হয়েছে। অনুরূপ-ভাবে অনেকাংশে মার্কিণ দৃষ্টিভঙ্গী, বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করেছে। যতদিন পর্যন্ত জাতিতে জতিতে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, বিদ্বেষ ও সন্দেহ তীব্রভাবে বিদ্যমান থাকবে ততদিন শিক্ষার ক্ষেত্রেও এরূপ বিভাগ ও দ্বন্দ্ব অপরিহার্য। কারণ আজ প্রায় সবদেশই শিক্ষা জাতীয় সরকার দ্বারাই পরিচালিত। এর প্রয়োজনও আছে, বিপদও আছে। প্রয়োজন এই জন্য যে, প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী তার দেশ ও সমাজের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি ও আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবে, এটা খুবই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যদি শিশুদের মনেও 'বড়দের' হিংসা, দ্বেষ, সন্দেহ শিক্ষার মাধ্যমেই সংক্রামিত হয় তাতে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। উদার মানবিকতার খোলা হাওয়া সুশিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেড়েছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ মেনেও ছাত্ররা যাতে মানুষকে মানুষ বলে শ্রদ্ধা করতে, ভালবাসতে শেখে তাও চরিত্রগঠনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্যে। শিশুমন যদি বিমুখ, সঙ্কীর্ণ ও বিশিষ্ট হয়ে গড়ে ওঠে তবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে শান্তির আশা সুদূরপরাহত। কিন্তু আজ পৃথিবীতে শান্তির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। তার উপরই নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সমৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি।

অতিরিক্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ আর একদিক দিয়েও হানিকর। তাতে একটা প্যাটার্নকেই বড় করে দেখা হয়, কিন্তু ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য অস্বীকৃত হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তির মৌলিকতা, তার স্বাধীন সুস্থ বিপ্লবের অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। তাই এ বিপদ সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখাও একান্ত প্রয়োজন।

নরওয়ের শিক্ষা সংবাদ

নরওয়েতে বয়স্কদের শিক্ষার জন্যে যে সব সংস্থা আছে—তাদের অনেক-গুলিই বেসরকারী। এ সব প্রচেষ্টার বিশেষত্ব হচ্ছে—এগুলি স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যমের উপর নির্ভরশীল, বিচিত্র এদের কর্মপদ্ধতি। সরকারী সাহায্য কিছু থাকলেও সরকারী কর্তৃত্ব এতে নেই। বয়স্কদের শিক্ষার যে নানা রূপ ও পদ্ধতি আছে তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে:

১। **ফোক অ্যাকাডেমী**—এখানে অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের নানা বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা আছে।

২। **স্টাডী গ্রুপ্‌স্**—এখানে শিক্ষায় অধিকতর অগ্রসর ব্যক্তিরা নানা বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সরকারী সাহায্যে, নানা বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা এখানে সমবেত হন এবং আলোচনা পরিচালনা করেন। বড় বড় বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলিও এ বিষয়ে সাহায্য করেন।

৩। **লাইব্রেরী ও শ্রমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**—পরিচালিত নানা অনুষ্ঠান। শিক্ষা ও আনন্দ দানের নানা ব্যবস্থা এঁরা করে থাকেন।

৪। **ভ্রাম্যমাণ স্টেট থিয়েটার**—এঁরা শহর ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে উচ্চাঙ্গের অভিনয় দেখান।

৫। **ভ্রাম্যমাণ সিনেমা**—শিক্ষামূলক ও নানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বর্ধিত হয় এমন বহু ছবি, দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়।

৬। **সরকারী বেতন প্রতিষ্ঠান**—এর মধ্য দিয়েও নানারকম আনন্দবিতরণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৪৮ সালের পার্লামেন্টের আইনবলে ভ্রাম্যমাণ স্টেট থিয়েটারের সৃষ্টি হয়। নরওয়েতে মাত্র চারিটি বড় শহরে স্থায়ী নাট্যশালা আছে। কিন্তু এখন এই ভ্রাম্যমাণ স্টেট থিয়েটারের কল্যাণে দূর দূরান্তরের ক্ষুদ্র দরিদ্র গ্রামবাসীদের উচ্চাঙ্গের অভিনয়, গান, নাচ, আধুনিক নাটক দেখাবার ও শুনাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৫০ সালে স্টেট থিয়েটার ৩০০ স্থানে ৬০০ অভিনয় রজনীর ব্যবস্থা করেছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ সিনেমা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫০ সালে। এই প্রতিষ্ঠানের অধীন ২৫টি ভ্রাম্যমাণ সিনেমা আছে। এরা ২১টি মোটরগাড়ী করে ঘুরে ঘুরে গ্রামে

গ্রামে আর ৪টি মোটরবোটে করে খালে, বিলে, সমুদ্রের খাঁড়ির ধারে নানা জায়গায় যায়। এঁরা ১৯৫৪ সালে সমগ্র নরওয়ে দেশ পরিভ্রমণ করে ৭০০ জায়গায় ১২০০ 'শো'র' ব্যবস্থা করেছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ স্টেট আর্ট গ্যালারী—দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা ভাল ভাল ছবি নিয়ে এঁরা দেশের সর্বত্র জনসাধারণকে দেখাবার ব্যবস্থা করেন। এতে জনসাধারণের রুচি ও সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়।

খেলাধূলা ও যুব-কল্যাণ সমিতির অফিস ১৯৪৯ সালে স্থাপিত হয়। ১৯৫২ সালের শীতকালে নরওয়েতে যে অলিম্পিক গেম্‌স্ হয়—এঁরাই তার পরিচালনার ভার নিয়ে ছিলেন। দেশের যুবকেরা যাতে খেলাধূলা, নানা প্রতিযোগিতামূলক উদ্যমের মধ্য দিয়ে পৌরুষ, স্বাস্থ্য ও সাহস অর্জন করতে পারে সেজন্য দেশের সর্বত্র খেলাধূলা, ভ্রমণ ইত্যাদির ব্যবস্থা এঁরা করেন। সরকার খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম, মাঠ, ঘরবাড়ী, তাঁবু ইত্যাদির ব্যয় বহন করেন, কিন্তু এর পরিচালনার ভার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর।

১৯৫৩ সালে এঁরা দেশের বহুস্থানে ফুটবল মাঠ, টেনিস্ কোর্ট, সীইং-এর জন্যে বরফ ঢাকা' ঢালু জায়গা, সুইমিংপুল, জিমন্যাসিয়াম ইত্যাদি চালু করেছেন। অস্‌লোর স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্যে Norwegian Sccicty for the Promotion of skiing, ১৯৫২-৫৩ সালের শীতকালে ২৮টি সীইং-স্কুল স্থাপন করেছিলেন। যাতে দেশের বিভিন্ন স্থানের ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে জানতে পারে—সেজন্য তাদের একত্র মেলামেশা, নানা প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা বিতর্ক ও আলোচনার নানা ব্যবস্থা হতে থাকে। এর জন্যে নানা জায়গায় মিলনকেন্দ্র স্থায়িভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে। এর খরচের অর্ধেক দেশের সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বহন করেন।

স্কুল ওয়েলফেয়ার সার্ভিস্—নরওয়ের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুখাদ্য সম্বন্ধে ছাত্রদের উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আছে। স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময়ই প্রত্যেক শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং কিছুদিন বাদে বাদে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিশেষ করে দাঁতের যত্ন সম্পর্কে নরওয়ে অত্যন্ত সচেতন। দাঁতের সর্বপ্রকার চিকিৎসা বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এর সমস্ত ব্যয় বহন করে থাকেন। শিশুদের দন্ত চিকিৎসা বিদ্যালয় পরিচালনার অঙ্গ। ১৯১০ সালে প্রথম দন্ত

চিকিৎসার ক্লিনিক্ খোলা হয়। আজ দেশের প্রত্যেক নগর ও শহরের বিদ্যালয়ে তো বটেই, প্রায় প্রত্যেক গ্রামের বিদ্যালয়েও দাঁতের ক্লিনিক্ আছে। সাধারণ রোগের চিকিৎসার জন্যেও প্রত্যেক স্কুলে ডাক্তার নিযুক্ত আছেন। প্রত্যেক কাউন্টি বা মিউনিসিপ্যালিটি এর পরিচালনার দায়িত্ব নেন। বড় বড় শহরে গুরুতর রোগে সেবার জন্যে শিক্ষিত নার্স আছেন। সে দেশে পার্লামেন্টের বিশেষ আইন অনুসারে মদের ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে সরকারের আয়ত্তাধীন। এ ব্যবসায়ে যে বিপুল লাভ হয়, তার থেকে সমগ্র দেশের বিদ্যালয়ের হেলথ্-সার্ভিসের ব্যয় নির্বাহ হয়।

১৯২৫ সালে প্রথম অস্লোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের সকালে বিনামূল্যে ব্রেকফাস্ট্ দেবার ব্যবস্থা হয়। এখন দেশের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়েই এ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই ব্রেকফাস্টে ⅙ হইতে ⅓ লিটার তাজা দুধ এবং মার্গারিন্ বা ঘোল থেকে তৈরী পনীর (Whey cheese) মাখান একটি শক্ত বিসকিট্ (Rusk) বা এক স্লাইস্ পাঁউরুটি প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে আধখানা কমলা, ১০০ গ্রাম রুটাবাগা অথবা আপেল বা ক্যারট এবং এক চামচ করে কডলিভার অয়েল্ দেওয়া হয়। সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ভাবে এ খাদ্যগুলি অস্লোর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে তৈরী হয়ে সমস্ত বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের খাদ্য বিতরণের সময় প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষক উপস্থিত থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক অবস্থা যাই হোক্—এই খাবার বিনামূল্যে সকলকেই দেওয়া হয়।

এ সংবাদগুলো নেওয়া হয়েছে—World Survey of Education—Unesco-1955. The Organization and Administration of the Educational System of Norway by G. W. Wiley 1955. The Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs, and the Royal Norwegian Ministry of Church and Education থেকে।

ব্যতিক্রমের বিপদ

এই পৃথিবীটা হইতেছে সাধারণদের। যাহাদের আমরা বলি 'দশজন' তাহারা হইতেছে সাধারণ মানুষ। কাজেই এই পৃথিবীর আইন-কানুন, ব্যবহার,—সবই হইতেছে সাধারণ মানুষের মাপে, তাহাদের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী। সেই জন্য যাহারা অসাধারণ—অর্থাৎ যাহারা সাধারণের ব্যতিক্রম, তাহাদের এই সাধারণের সমাজে নিজেদের মানাইয়া লইতে বেগ পাইতে হয়। বর্তমান জগৎ সাধারণের জগৎ হইলেও সাধারণদের এটুকু বুদ্ধি বা ঔদার্য আছে যে 'ব্যতিক্রম'দেরও এ পৃথিবীতে স্থান আছে, প্রয়োজন আছে, অধিকার আছে—ইহা সে স্বীকার করে। তাই, বর্তমান সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন মনোবিজ্ঞানী ব্যতিক্রমদের সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন, তাহাদের অসুবিধাগুলি বুঝিতে চেষ্টা করেন এবং কি করিয়া এবং কতদূর সে অসুবিধাগুলি দূর করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করেন।

'সাধারণ' কে? তাহার লক্ষণ কি—আর ব্যতিক্রমই বা কাহাকে বলিব? যদিও এ প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ, এমন কি অবান্তর মনে হইতে পারে,—তথাপি ইহার উত্তর সোজা নয়। বাস্তবিকপক্ষে যে উত্তরই দেওয়া যাক না কেন, তাহার নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় এই: 'যে অসাধারণ নয়, সেই 'সাধারণ'; আর যে সাধারণ নয়, সেই ব্যতিক্রম'। বাস্তবিক পক্ষে 'সাধারণ'কে ইহার একটি মনগড়া সংজ্ঞাই কেবল দেওয়া যায়। জানি, আমাদের এ সংজ্ঞা বৃত্ত-সংজ্ঞা (Circular definition) দোষযুক্ত। তথাপি আলোচনা আরম্ভ করিবার মত একটা মোটামুটি ধারণা নেওয়া যাক্। 'সাধারণ' তাহাকেই বলি যাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিদ্যমান, সক্রিয় ও মোটামুটি অবিকৃত; যাহার বুদ্ধি ও অন্যান্য মানস এবং সামাজিক গুণ ও বৃত্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নয়, নিকৃষ্টও নয়,—যে তাহার দোষগুণ, শক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম লইয়া অন্য দশজনের সঙ্গে মোটামুটি ভাবে মানাইয়া চলিতে পারে, বা চলিয়া থাকে। যাহাদের কোন ইন্দ্রিয় বিকল, যাহাদের কোন অঙ্গহানি ঘটিয়াছে, যাহারা বুদ্ধিবৃত্তি বা অন্যান্য মানসিক ও সামাজিক গুণে ন্যূন অথবা বিশেষ উৎকর্ষসম্পন্ন, তাহাদেরই বলিব অসাধারণ বা ব্যতিক্রম।

বাস্তবিক পক্ষে সম্পূর্ণ 'স্বাভাবিক' বা 'সাধারণ' বলিয়া কেহ নাই। প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের রোগে কখনও বা কখনও ভোগে, কোন না কোন দোষে সে ন্যূন বা উৎকৃষ্ট। সুতরাং 'সাধারণ' মানুষ একটি কাল্পনিক আদর্শ। আগেই বলিয়াছি—ইহা একটি মন-গড়া ও কাজ-চলা গোছের ধারণা।

যাহারা ব্যতিক্রম, তাহাদের সকলের সমস্যা এক নয়। যে বিষয়ে তাহারা ব্যতিক্রম সেখানেই তাহাদের অসুবিধা ও সমস্যা। তাহাদের ব্যতিক্রমের প্রকৃতি কি, দশজনের সঙ্গে একত্র চলিতে কেন তাহারা অসুবিধা বোধ করে, ইহা না জানিলে প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করা সম্ভব হয় না। মোটামুটি ভাবে বলা যায় তাদের অক্ষমতা বা অতিরিক্ত ক্ষমতা অন্যান্যের কাছে উপহাস বা ঈর্ষার কারণ হয় এবং সমাজের এই প্রতিকূল ভাব তাহাদিগকেও বিদ্বিষ্ট করিয়া তোলে। তাহাদের ব্যতিক্রমের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহাদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। তাহাদের ত্রুটি ও অক্ষমতা সম্বন্ধে তাহারা সচেতন, এবং অনেক সময়েই তাই তাহারা অন্যদের সাথে স্বাভাবিক ভাবে মিশিতে পারে না। তাহাদের শিক্ষার প্রধান কাজই হইল তাহাদের 'সহজ' করিয়া তোলা,—তাহাদের মন যাহাতে তাহারা নিজ ব্যতিক্রম শান্তভাবে গ্রহণ করিয়া নিজশক্তি অনুযায়ী কর্ম বা জীবিকা বাছিয়া লইতে পারে এবং সমাজে নিজের স্থানটি করিয়া নিয়া সুখী ও সন্তুষ্ট হইতে পারে, সে বিষয়ে তাহাদের সাহায্য করা।

ব্যতিক্রম বহু প্রকারের হইতে পারে। সেগুলিকে দৈহিক ও মানসিক এই দুইটি প্রধান দলে ভাগ করা যায়। সমস্ত বৈকল্য বা ব্যতিক্রম আলোচনা সহজ নয়। প্রথমতঃ দৈহিক ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

দৈহিক ত্রুটিজনিত সমস্যা—Problems of the Physically handicapped—

যাহারা কোন ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ হারাইয়াছে তাহারা দুর্ভাগা। স্বভাবতঃই তাহাদের কর্ম ও উপভোগের পরিধি সঙ্কুচিত, তাহাদের জ্ঞান আহরণের পথও সুগম নহে। এ দৈহিক ত্রুটি নানা প্রকারের এবং বৈকল্যের পরিমাণ-গত প্রভেদও আছে। ইহা অত্যন্ত গুরুতর হইতে সুরু করিয়া, সামান্য মাত্রও হইতে পারে। এ ত্রুটি জন্মগত ও চিকিৎসার অযোগ্য হইতে পারে। কোন গুরুতর ব্যাধি বা ছোঁয়াচ (infection), বা দুর্ঘটনা

উহার কারণ হইতে পারে। আবার এ ত্রুটি সাময়িক ও চিকিৎসাযোগ্যও হইতে পারে।

বর্তমান কালে চিকিৎসাশাস্ত্র শুধু রোগনির্ণয় ও রোগনিরাময় করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। যাহাতে রোগ হইতে না পারে, অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়হানি না ঘটে, সে বিষয়েও বিজ্ঞান যথেষ্ট উপযুক্ত উপদেশ দিয়া আমাদিগকে সতর্ক করে। এ বিষয়ে ব্যক্তি, বিদ্যালয়, সমাজ ও রাষ্ট্র পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সচেতন হইয়াছেন। যেমন অন্ধতা সম্বন্ধে চিকিৎসকদের অভিমত,—চক্ষুর উপযুক্ত ব্যবহার, স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী কতগুলি অভ্যাস অনুসরণ (যথা সকালে বিকালে নির্মল জলে চক্ষু প্রক্ষালন, ময়লা কাপড় বা রুমাল চক্ষু মুছিবার জন্য ব্যবহার না করা, বিনা প্রয়োজনে চশমা ব্যবহার না করা) এবং কতগুলি সতর্কতা অবলম্বন দ্বারা (যথা খুব কম আলোতে বই না পড়া, অতিরিক্ত আলো বা উত্তাপ চোখে না লাগান, চোখে ব্যথা হওয়া মাত্র চোখের বিশ্রাম ইত্যাদি) কিছুটা পরিমাণে চক্ষুর ত্রুটি নিবারিত হইতে পারে। অগ্রসর রাষ্ট্রসমূহে বিদ্যালয়ের ক্লাসঘরগুলি যাহাতে উপযুক্ত আলোকিত হয় এবং ব্ল্যাকবোর্ড-এর লেখা যাহাতে সমস্ত ছেলে স্পষ্টভাবে দেখিতে পায় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন। উন্নত রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় রাস্তা, ঘাট, দোকান, স্টেশন, সু-আলোকিত হয়, ফ্যাক্টরীগুলিতে কর্মীদের চোখের উপর যাহাতে অতিরিক্ত চাপ (eye-strain) না পড়ে, যন্ত্রাদি চালনা কালে যাহাতে অন্ধকারের জন্য শ্রমিকরা আহত হইতে না পারে তেমনি আইন প্রণীত হয়।

যাহাদের অঙ্গ-বা ইন্দ্রিয়-হানির জন্য দৈহিক ত্রুটি ঘটিয়াছে তাহারা অন্য সব বিষয়ে সাধারণ সুস্থ মানুষের মতো এ কথাটি মনে রাখা দরকার। অন্ধ বা বধির কোন ছাত্রের অন্যান্য ছাত্রদের মতোই কতগুলি সাধারণ ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন ও রুচি আছে এবং তাহাদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য সুস্থ অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তাহারা যাহাতে সহজে মিশিতে, খেলাধুলা, পড়াশুনা করিতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অবশ্য তাহাদের দৈহিক ত্রুটির জন্য দৌড় ঝাঁপ বা অন্যান্য যে সব কষ্টসাধ্য কর্মে তাহাদের ক্ষতি হইতে পারে, তাহা হইতে তাহাদের বিরত করিতে হইবে। এ জন্য তাহাদের মনে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। তাই তাহাদের অভাব তাহারা অন্য কোন বিকল্প ক্রিয়াদ্বারা কিছুটা পূর্ণ করিতে পারে কিম্বা তাহা ভাবিয়া দেখিয়া, তেমন কাজের বা খেলার ব্যবস্থা তাহাদের

জন্য করা প্রয়োজন। তাহাদের দৈহিক ত্রুটির জন্য গালমন্দ করা বা উপহাস করা নির্বুদ্ধিতাই শুধু নয়, চরম নিষ্ঠুরতাও বটে। তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা প্রয়োজন এবং তাহাদের ত্রুটির জন্য যে সব বিশেষ সাহায্য দরকার তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে কিন্তু তাহাদের অতিরিক্ত আদর দিয়া পরমুখাপেক্ষী করিয়া তুলিলে ভবিষ্যতে তাহাতে দুঃখ বাড়ানোই হয়। প্রত্যেক ত্রুটি বা বিকৃতির আনুষঙ্গিক মানসিক প্রতিক্রিয়া বা আহত অনুভূতি থাকাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন ত্রুটির বেলায় এ অনুভূতি বা আবেগ বিভিন্ন হইতে পারে। যাহাই হউক যাহারা অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়হীন তাহারা অনুভূতি ও আবেগেব ক্ষেত্রে যাহাতে সঙ্গতি (adjustment) লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা পিতামাতা ও শিক্ষকের ইহাদেব সম্বন্ধে একটি প্রধান কর্তব্য। অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মসচেতন হইলে ইহারা নিজেদের ও অন্যের দুঃখ বরং বাড়াইয়াই তোলে। কিন্তু যাহারা নিজের ত্রুটি শান্তভাবে মানিয়া নিয়া নিজ শক্তি অনুযায়ী কাজ বাছিয়া নিয়া অন্যের সঙ্গে মিশিয়া চলিতে পারে, তাহারা খুব বেশী অসুখী হয় না।

বধির ও প্রায়-বধিরদের সমস্যা (Problems of the Deaf of the near deaf)—বধিবতা জন্মগত হইতে পারে। নাক ও গলার রোগ হইতে ইহা হইতে পারে; হাম, ডিপথেরিয়া, মাম্পস্ ইত্যাদি রোগ হইতেও জন্মাইতে পারে। কানে খৈল বেশী জমিয়া, কানপাকা হইতেও বধিরতা দেখা দেয়। জন্মগত কারণে সম্পূর্ণ যারা বধির, চিকিৎসা দ্বারা তাহাদের আরোগ্য সাধন সুকঠিন। কিন্তু সম্পূর্ণ বধির না হইলে এবং আকস্মিক কারণে হইলে এ ত্রুটির চিকিৎসা ও উপশম সম্ভবপর। যাহারা কানে খাটো তাহারা অনেক সময় নিজেদের ত্রুটিটা স্বীকার করিতে চাহে না। বরঞ্চ লোকে তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ নির্বোধ ভাবুক তাহাও ভাল। বাস্তবিক পক্ষে যাহারা কানে ভালো শোনে না, তাহাদের মুখে কখনো কখনো নির্বোধ অসহায়ত্বের ভাব ফুটিয়া ওঠে। কাহাকে কাহাকে বিরক্ত, বিষণ্ণও দেখায়। যখন কেহ তাহাদের সঙ্গে কথা বলে, তখন তাহারা তাহার অঙ্গভঙ্গী, বিশেষ করিয়া মুখের ভাব ও ওষ্ঠাধর সঙ্কোচন লক্ষ্য করে। এই উপায়ে, যে কথা তাহার শুনিতে পায় না, তাহাও অনেকটা আন্দাজ করিতে পারে।

পূর্বে যাহারা কানে খুবই কম শুনিত, তাহারা রবারের নলের দুই মাথায় কলিকার মত দুটি ধাতব মুখ লাগাইয়া কথাবার্তা চালাইত। বধির লোক একটি কলিকার মত মাথা নিজ কানে লাগাইয়া লইত, অন্য মাথা মুখের কাছে আনিয়া বক্তা কথা বলিত॥ ঐই যন্ত্রটি খুব সহজ হইলেও ইহা লইয়া চলাফিরা অসুবিধাজনক ছিল। বর্তমানে খুব ছোট ইলেকট্রিক ব্যাটারী সংযুক্ত কানে আটকাইবার যন্ত্র বাহির হইয়াছে। তবে ইহার খরচ যথেষ্ট। সেদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিলাম ব্যাটারীহীন, একটি গাবের বীজের মতো ক্ষুদ্র যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা কানে লাগাইয়া সব কথা স্পষ্ট শোনা যায়—যন্ত্রটি প্রায় চোখেই পড়ে না।

যাহারা একেবারেই কানে শোনে না তাহাদের বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া উপায় নাই। ইহাদিগকে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ হাতের অঙ্গুলি সংকেতে বর্ণমালা (manual alphabet) শিক্ষা দেন, এবং ঠোঁটের নড়াচড়া লক্ষ্য করিয়া কথা বুঝিতে (lip reading) শেখান। যে সব ছেলেমেয়েরা কিছু কম শোনে তাহারা অন্যান্য সুস্থ শিশুদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়েই পাঠাভ্যাস করে। ইহা এক হিসাবে তাহাদের সুস্থ মানসিক বিকাশের দিক হইতে ভাল হইলেও, ইহাতে সন্দেহ নাই যে তাহাদের ত্রুটির জন্য পাঠ গ্রহণে তাহাদের উপর বেশী চাপ (strain) পড়ে, এবং তাহারা পিছাইয়া পড়িতে পারে। পূর্বেই বলিয়াছি কখনও কখনও শিশুরা নিজেদের এই শারীরিক ত্রুটি অন্যের নিকট গোপন রাখিতে চায়। তাই শিক্ষকের সতর্ক থাকা উচিত। যে ছেলেটি কানে খাটো তাহাকে ক্লাসের সামনে বেঞ্চে,—যেখান হইতে শিক্ষকের কথা সব চেয়ে জোরে শোনা যায়, এবং শিক্ষকের মুখ দেখা যায়,—সেখানে বসিবার ব্যবস্থা করা উচিত। অন্যান্য ছাত্ররাও যাহাতে তাহাকে যথোচিত সাহায্য করে সে বিষয়ে দেখিতে হইবে। কিন্তু ছাত্রটিকে নিজ ত্রুটি সম্বন্ধে অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন করা উচিত নয়। উপহাস করা, লজ্জা দেওয়া, শাস্তি দেওয়া তো খুবই অনুচিত। তবে অতিরিক্ত দয়া করিয়া পরনির্ভর করাও মোটেই ঠিক নয়।

একেবারে বধির না হইলে জীবিকা অর্জনে এ জাতীয় ব্যক্তিদের খুব বেশী অসুবিধা হইবার কথা নয়। যাহারা বেশী কম শোনে, তাহাদের পক্ষে গবেষণা বা হিসাব পরীক্ষার কাজ উপযুক্ত। বধিরের পক্ষে কোলাহলশূন্য পরিবেশে কাজই ভাল। কখনো কখনো বধিরেরা বোবাও হয়। যাহার

জন্ম হইতে একেবারেই বধির তাহাদের মধ্যেই এ দুর্ভাগ্য দেখা যায়। যাহারা জন্ম হইতে বধির তাহারা কথা কহিতেও শেখে না, যদিও তাহাদের কণ্ঠনালী সব সময় অসুস্থ নয়। এ সমস্ত শিশুদের জন্য Deaf and Dumb School (মূক বধির বিদ্যালয়)-গুলির প্রতিষ্ঠা। ইহাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং বিশেষ প্রণালী অবলম্বনে ইহাদের অন্যের কথা বুঝিতে এবং কথার উত্তর দিতে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। তবে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মত কর্মক্ষম হওয়া ইহাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কাজেই ইহাদের সমস্যা যে কঠিনতর তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

অন্ধ বা প্রায়ান্ধদের সমস্যা • (Problems of the blind or the near blind)—অনেক ক্ষেত্রেই টাইফয়েড্, বসন্ত, হাম, স্কারলেট্ ফিভার ইত্যাদি ব্যাধি অন্ধত্বের কারণ। সিফিলিস্ হইতেও অন্ধত্ব ঘটে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পিতামাতার সিফিলিস্ রোগ হেতু সন্তান অন্ধ হইয়া জন্মায়। বৃদ্ধ-বয়সে চোখে ছানি পড়িয়া দৃষ্টিশক্তি হীনতা জন্মে। উপযুক্ত সময়ে ছানি কাটাইয়া ফেলিলে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসে। কিন্তু মস্তিষ্কে অর্বুদের (brain tumour) বা চক্ষুশিরার (eye nerves) শুষ্কতা বা রোগের জন্য অন্ধতা দুশ্চিকিৎস্য। আঘাত ও দুর্ঘটনার ফলেও চোখ নষ্ট হইতে পারে। অতিরিক্ত কড়া আলো অথবা দেখিতে কষ্ট হয় এমন অল্প আলোতে দীর্ঘকাল কাজও অন্ধতার কারণ হইতে পারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল কারণ নিবারণ-যোগ্য। যে সব কারণ অন্ধতার জন্য দায়ী সেগুলির দূরীকরণেই প্রথম চেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন। বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। পিতামাতাদের উচিত শিশুদের চোখ কিছুদিন পরপর ভাল ডাক্তার দিয়া পরীক্ষা করানো। বিদ্যালয়, ফ্যাক্টরী এবং শ্রমিকেরা যেখানে কাজ করে, বিশেষতঃ রাত্রে, সেখানে আলোর ব্যবস্থা যাহাতে উপযুক্ত হয়, যাহাতে চোখের উপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে, কর্তৃপক্ষের সে ব্যবস্থা অবশ্যই করণীয়।

যাহারা অন্ধ তাহারা নিজ অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন। যাহারা সম্পূর্ণ অন্ধ নয় তাহারা নিজের অবস্থা অন্যের নিকট হইতে গোপন করিয়া রাখিতে সচেষ্ট হন। যে সব শিশু দৃষ্টিশক্তি একেবারে হারায় নাই,

তাহারা চোখ পিট্ পিট্ করে (blinking) ভ্রূকুটি করে (frowning) ঘন ঘন চোখ মোছে, মাথা বাঁকা করিয়া অস্বাভাবিক ভাবে তাকায়। কখনো কখনো তারা হঠাৎ রাগিয়া ওঠে। কোন ছাত্রের মধ্যে এ রকম লক্ষণ দেখিলে শিক্ষকের উচিত এই ছেলেকে ভাল ডাক্তার দেখানো এবং তাহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যাহারা সম্পূর্ণ অন্ধ তাহাদের সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। চক্ষু হইতেছে ইন্দ্রিয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্রেল্-এর আবিষ্কারের ফলে অন্ধদের বই পড়া শিক্ষাসাপেক্ষ হইলেও, সম্ভব হইতেছে। কিন্তু সাধারণতঃ নীচু ক্লাসের বই-ই ব্রেলে ছাপা হয়। উচ্চ শিক্ষার জন্য যে সব বই প্রয়োজন তাহাদের মধ্যে অতি সামান্যই ব্রেলে ছাপানো পাওয়া যায়। একেবারে অন্ধদেয় জন্য বিশেষ বিদ্যালয় আছে। সম্পূর্ণ অন্ধদের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে হইলে চক্ষুষ্মান্ একজন সঙ্গী নিতান্ত দরকার। এক স্থান হইতে অন্যত্র যাতায়াত করিতে হইলে অন্ধদের অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়। সেদিন Reader's Digest পত্রিকায় দেখিলাম—অন্ধ মানুষদের যানবাহন মুখর নগরের পথঘাট প্রদর্শক বিশেষ শিক্ষিত কুকুর সঙ্গী পাওয়া যায়।

অন্ধ মানুষদের কাছে বই পড়িয়া অন্য কাহাকেও শুনাইতে হয়। অন্ধ ব্যক্তিদের স্পর্শণ, শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় কখনো কখনো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়। ইহাতে তাহারা এক ইন্দ্রিয়ের অভাব অন্যভাবে কতকটা পূর্ণ করিয়া লয়। অন্ধ ব্যক্তিদের জীবিকার পথও বধিরদের মতো একই কারণে অত্যন্ত সঙ্কুচিত। কলকারখানার কাজের পক্ষে ইহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। হাতের কাজে ইহারা অনেক সময় পটু হয় এবং ইহা দ্বারা তাহাদের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু যাহারা বুদ্ধিজীবি, সাধারণের চেয়ে যাহাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর, তাহারা শুধু হাতের কাজের মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ তৃপ্তি পাইতে পারেন না। ডিক্টাফোন যন্ত্রে কাজ ইঁহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং অন্ধদের শিক্ষার কাজে ইঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হন। অন্ধদের বিশেষ অসুবিধাগুলি কি ইহা তাঁহারা জানেন এবং চক্ষুষ্মান্‌দের অপেক্ষা ইঁহারা অন্ধ ছাত্রদের শিক্ষাবিষয়ে অধিকতর উপযোগী।

উদ্যম ও অধ্যবসায় থাকিলে অন্ধ ব্যক্তিরা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন। বহু বিখ্যাত গায়ক ও যন্ত্রশিল্পী এই শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অভাব সত্ত্বেও

নিজ সাধনায় মগ্ন আছেন। বিখ্যাত কবি মিলটন দৃষ্টিশক্তি হারাইবার পর তাঁহার শ্রেষ্ঠ কয়টি কবিতা লেখেন। আমাদের দেশে ভক্ত কবি সুরদাস দুর্বার কামপ্রবৃত্তির প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যৌবনেই নিজ দৃষ্টি শক্তি নষ্ট করেন। দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া মিলটনের মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ ছিল কিন্তু সুরদাসের মনে ছিল পরম প্রশান্তি। নিজ দুর্ভাগ্যকে যাঁহারা শান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারেন তাঁহারা নিজেরাও দুঃখ কম পান অন্যকেও দুঃখ কম দেন। কিন্তু ধৈর্য, উদ্যম এবং বৈজ্ঞানিক পরিচালনা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বৈকল্যজনিত সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হইতেছেন হেলেন কেলার। তিনি অতি শৈশব হইতেই অন্ধ, বধির ও মূক। কিন্তু কি করিয়া নিজ ধৈর্য ও চেষ্টায় এবং তাঁহার শিক্ষিকা ও সহচরী মিস্ সুলিভ্যানের সুপরিচালনায় তিনি লেখাপড়া শিখিলেন—তাহার মনোজ্ঞ কাহিনী তিনি আত্মজীবনীতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইন্দ্রিয় বৈকল্যজনিত দুঃখে যাঁহারা দুঃখী তাঁহারা এ জীবন-কাহিনী পাঠে মনে বল, পাইবেন।

খঞ্জ, বিকলাঙ্গদের সমস্যা (Problems of the lame and the physically handicapped)—যাহারা ব্যাধি বা দুর্ঘটনার ফলে কোন অঙ্গ হারাইয়াছে, অথবা যাহারা কোন বিকৃত বা বিকল অঙ্গ নিয়া জন্মিয়াছে তাহাদের শিক্ষা ও জীবিকার্জনের পথে নানা বাধা অতিক্রম করিতে হয়। অসাবধানতার ফলে এ বিকৃতি বা বিকলতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমানো যাইতে পারে। আমাদের বর্তমান সভ্যতায় যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং এ বিষয়ে সাবধানতার প্রয়োজনও পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যাহারা এমন বিকলাঙ্গ তাহাদের দৈহিক বৈকল্য সত্ত্বেও মানসিক ক্ষমতায় বা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের দিক হইতে অন্যান্য সুস্থ মানুষের তুলনায় তাহারা হীন নয়। কখনো কখনো তাহারা অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন। পড়াশুনার ব্যাপারে তাহারা অন্য দশটি সুস্থ সাধারণ ছেলের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারে। তবে দৈহিক কোন অঙ্গের বৈকল্য মানসিক বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই থাকে। আমাদের শিক্ষা ব্যাপারটা শুধু মস্তিষ্কের ব্যাপার নয়। একটি সুস্থ সাধারণ ছেলে-মেয়ে চলাফেরা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির

স্বচ্ছন্দ সঞ্চালন ইত্যাদি দেহের নানা ভাবের মধ্য দিয়া সহজে শিক্ষালাভ করে। যাহার পা খোঁড়া সে সর্বত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে না তাই তাহার পৃথিবীটা কতকটা সীমাবদ্ধ। তেমনি যাহার হাত বিকল তাহার চোখের সামনের জিনিস নাড়াচাড়া করা, লেখা, হাতের কাজ করা ইত্যাদি অনেকখানি শক্ত। বিশেষ করিয়া ডান হাতটি বিকল হইলে এ অসুবিধাগুলি অনেক বাড়ে। অবশ্য দেহের আত্মরক্ষার তাগিদেই এ সব মানুষ বাঁ হাত দিয়া এসব কাজ অনেকটা করিতে শেখে। তবে তাহাতে সুস্থ মানুষের মতো সব বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করা নিশ্চয়ই শক্ত। বিকল অঙ্গে ব্যথা যন্ত্রণা থাকিলে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধা হয়ই। সুতরাং এ জাতীয় বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় পিছাইয়া পড়িবে, ইহাই স্বাভাবিক।

যাহারা বিকলাঙ্গ তাহাদের মনের উপরও দৈহিক বৈকল্যজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পরে। তাহাদের বিকল অঙ্গ অন্য মানুষের দৃষ্টি আর্কষণ করে। তাহাদের দিকে মানুষ করুণা বা উপহাস বা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়—তাহাদের সম্বন্ধে কথা বলে। ইহাতে তাহারা নিজ বৈকল্যের প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া ওঠে এবং অস্বস্তি বোধ করে। হয়তো সহপাঠীরা তাহাদের ঠাট্টা করে, এবং যেখানে করুণা বা উপহাস না করে সেখানেও তাহারা অন্যের বিরূপতা কল্পনা করিয়া ব্যথিত হয়। তাছাড়া শারীরিক বৈকল্যের জন্য নানা প্রকার খেলাধূলা বা কাজের সহজ আনন্দ হইতে তাহারা কতকাংশে বঞ্চিত, তাই তাহাদের মনে মিথ্যা আত্মধিক্কার অথবা অপরের প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্মিতে পারে। তাহারা তাই অন্য দশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে সহজে মিশিতে পারে না।

তাহাদের পিতামাতার মনেও সন্তানের অক্ষমতার জন্য দুঃখ ও লজ্জাবোধ থাকে। তাঁহারা সন্তানের অক্ষমতার জন্য হয়তো বৃথাই নিজেদের অপরাধী মনে করেন। অথবা সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাবও তাঁহাদের হইতে পারে, তাহা অক্ষম সন্তানটির প্রতি বিদ্বিষ্ট হইতে পারেন। পিতামাতার মনে যদি অপরাধ বোধ জাগে তবে তাঁহারা হয়তো অক্ষম সন্তানটিকে অতিরিক্ত মমতা ও আদর দিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। এবং সন্তানের প্রতি তাঁহাদের অচেতন মনে বিদ্বেষ জাগিলে তাঁহারা সন্তানটিকে বোঝা বলিয়া মনে করিয়া তাহাকে অবহেলা করিতে পারেন। এই দুই প্রকার মনোভাবই বিকলাঙ্গ মানুষটির সুস্থ মানসিক বিকাশের পরিপন্থী। অতিরিক্ত

আদর ও প্রশ্রয় পাইলে সে আবদারে ও জেদী হইয়া উঠিতে পারে এবং তাহার মনে এ ধারণা জন্মিতে পারে যে, যেহেতু সে পঙ্গু বা অক্ষম, সুতরাং সকলের উপর তাহার বিশেষ দাবী ও অধিকার আছে। এই মিথ্যা ধারণা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে বহু দুঃখের কারণ হইয়া উঠিতে পারে এবং পিতামাতার অবর্তমানে তাহার সহজ জীবন ধারণ অসম্ভব হইতে পারে।

এ সব অক্ষমদের অন্যান্য সুস্থ ভাই বোনদের সঙ্গে সম্বন্ধও সুস্থ ও সহজ হয় না। তাহারা এ অক্ষমটিকে আপনাদের ভাই বা বোন বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিতে পারে। এ অক্ষমটির জন্য তাহাদের খেলাধূলা আনন্দের ব্যাঘাত হইলে তাহার বিরক্ত হইতে পারে। তাহাদের পিতামাতা এ অক্ষমটির প্রতি অতিরিক্ত মমতাশীল হইলে তাহাদের মনে ঈর্ষা জন্মানো খুবই স্বাভাবিক। এ জন্য অক্ষম ও বিকলাঙ্গ যাহারা তাহাদের সুস্থ মানসিক বিকাশ বড়ই কঠিন। প্রায়ই এরা অতিরিক্ত অভিমানী, নিষ্ঠুর বা জেদী, সন্দিগ্ধচিত্ত ও অস্থির হয়।

এদের পালন, শিক্ষা এবং জীবিকার ব্যবস্থা বিভিন্ন সমস্যাপূর্ণ। এরা যাহাতে নিজ অক্ষমতার প্রকৃতিটি বুঝিতে পারে এবং তাহা মানিয়া নিয়া সহজ ও শান্ত হইতে পারে, সে চেষ্টা করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। অন্য দশটি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যাহা পারে তাহা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়, ইহা তাহাদের বুঝিতে হইবে। অনেক সময় ইহা না বুঝিয়া অথবা মানিয়া না নিয়া যাহা তাহাদের দৈহিক সাধ্যে অতীত, অতিরিক্ত প্রয়াসের দ্বারা সে প্রকার কাজ করিতে গিয়া তাহারা বিপন্ন হইতে পারে। আবার অন্যদিকে যতটুকু তাহাদের ক্ষমতার সীমার মধ্যে তাহা সুষ্ঠুভাবে করিতে তাহাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। তাহাদের মনের মধ্যে হীনতাবোধ বা নিরাশা যাহাতে না আসে, সে চেষ্টা সকলের পক্ষেই করা উচিত। তাহারা যেন বুঝিতে পারে দৈহিক অক্ষমতা সত্ত্বেও পৃথিবীতে তাহাদের জীবনেরও মূল্য আছে, তাহাদেরও মোটামুটি সুখী হইয়া বাঁচিবার অধিকার আছে।

ইহাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন আছে। ইহাদের শারীরিক অক্ষমতার প্রকৃতি অনুযায়ী ইহাদের শিক্ষাব্যবস্থাও সর্বসাধারণের শিক্ষা হইতে কিছুটা পৃথক হওয়া প্রয়োজন। তবে যতটা সম্ভব অন্য দশটি ছেলের মতো ইহারা যাহাতে চলিতে পারে, সে চেষ্টা করা উচিত। অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গ হইতে তাহাদের সম্পূর্ণ বিচ্যুত করিয়া রাখিলে তাহারা নিজেদের

অপাংক্তেয় ও সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত ও অকর্মণ্য মনে করিতে পারে।, সহকর্মীদের উপহাস, ঘৃণা ইত্যাদি হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ রক্ষা করা সম্ভব নয়, এবং এ দুঃখময় আঘাতের দ্বারা হয়তো সে কিছুটা শক্ত, ও নিজের প্রতি নির্মম হইতে পারিবে। ইহার প্রয়োজন আছে। তবে শিক্ষক ও পিতামাতার অবশ্যই কর্তব্য হইবে তাহাকে অযথা নিষ্ঠুর আঘাত হইতে যথাসম্ভব রক্ষা করা। তাহাদের এই ছেলে বা মেয়েটির সঙ্গে সহজভাবে ব্যবহার করা উচিত। তাহার প্রতি সতর্ক সহানুভূতিশীল দৃষ্টি থাকিবে সত্য কিন্তু অতিরিক্ত করুণা দেখানো বা অন্যায় প্রশ্রয় দিলে অক্ষম শিশুটির সুস্থ মানসিক বিকাশের পথে বাধাই দেওয়া হয়। ভগবান যে আঘাত দেন, মানুষ তাহার সম্পূর্ণ প্রতিবিধান কখনই করিতে পারে না, এমনকি পিতামাতাও না। তাই তাহা যথাসম্ভব শান্তভাবে গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় নাই।

এদের জীবিকার ক্ষেত্র স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত। যেখানে দৈহিক বল ও দ্রুত অঙ্গসঞ্চালন প্রয়োজন সে সব কাজ এই পঙ্গু বা বিকলাঙ্গের দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু যে সব কাজে দৌড় ঝাঁপ করিবার প্রয়োজন নাই,—যে সব কাজ মোটামুটি ঘরে বসিয়া করা যায়, তাহাতে এসব মানুষ সাফল্য অর্জন করিতে পারে। পড়াশুনার কাজে ইহাদের বেশী অসুবিধা হইবার কথা নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় (যে সব ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিল ও বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রয়োজন হয় না) অথবা সাহিত্য চর্চায় বিকলাঙ্গ মানুষের যশঃ ও কৃতিত্ব অর্জন সম্পূর্ণ অজানিত নয়। সকলের থেকে বড় কথা, এদের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন অসাধারণ সাহস ও দৃঢ় মনোবল। বিকলাঙ্গদের জন্য বিশেষ শিক্ষা এবং জীবিকা উপার্জন ব্যাপারে নানাভাবে সহায়তা ব্যবস্থা অগ্রসর দেশ সমূহে আছে। আমাদের দেশে এ সব ব্যবস্থা খুব বেশী নাই। এখানে বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে নিজের বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের চেষ্টায়ই নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে হয়। এমন হৃদয়হীন মানুষও আমাদের দেশে আছে যাহারা হতভাগ্যদের দিয়া ভিক্ষা করাইয়া তাহার ভাগ নিয়া থাকে।

দিল্লীতে বিকল ও অবসাঙ্গদের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়া চিকিৎসার (Occupational therapy) ব্যবস্থা আছে। ইহাতে বহু পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ও অকর্মণ্য ব্যক্তি জীবনে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পাইতেছে।

বাক্য উচ্চারণ ব্যাপারে ত্রুটি (Problems of those who have speech defect)—তোৎলামী, অস্পষ্ট উচ্চারণ, স্বরভঙ্গ, শিশুর মতো আধো আধো কথা ইত্যাদি দোষগুলি খুব গুরুতর না হইলেও ব্যক্তির সাফল্য ও তাহার সুস্থ সম্পূর্ণ বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। স্বরযন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন না কোন অংশের ত্রুটিপূর্ণ গঠন, অথবা কোন রোগ এসবের জন্য দায়ী হইতে পারে। কোন কোন ত্রুটি জন্মগত ও বংশগত হইতে পারে, আকস্মিকও হইতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির জন্মাবধি উপরের ঠোঁট কাটা (harlipped) তালু বিভক্ত (Cleft palate) জিহ্বা ভারী, কণ্ঠনালী রুগ্ন হইতে পারে এবং এ সব যে কোন কারণের জন্যই তোৎলামী বা উচ্চারণে অস্পষ্টতা আসিতে পারে। সামনের দাঁতের ফাঁক বেশী হইলে অথবা দাঁতের জন্য দোষও এজন্য দায়ী হতে পারে। এর মধ্যে কোন কোন ত্রুটি শিশুকালেই অস্ত্রোপচার বা অন্য চিকিৎসার দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে। অনেক সময় মনে করা হয় জিহ্বা বেশী ভারী হইলে তাহার জন্য তোৎলামী দেখা দেয়। কিংবদন্তী আছে, গ্রীসদেশের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ডেমস্থিনিস্ বাল্যকালে অত্যন্ত তোৎলা ছিলেন। এজন্য তিনি জিহ্বার উপরে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করিয়া নদীর পারে গিয়া বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করিতেন। তোৎলা শিশুদের শতকরা নব্বুই জন বা আরো বেশী বিনা চিকিৎসায়ই আপনা হইতেই সরিয়া যায়। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে তোৎলামী বেশী দেখা যায়। বাক্য উচ্চারণের সমস্ত ত্রুটিই চিকিৎসার দ্বারা সংশোধনযোগ্য নয়। মস্তিষ্কের বাক্য উচ্চারণ কেন্দ্রে কোন আঘাত বা রোগের জন্য উচ্চারণে ত্রুটি দেখা দিলে তাহার চিকিৎসা দুঃসাধ্য।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন এসব ত্রুটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন না কোন মনস্তাত্ত্বিক কারণও বর্তমান থাকে। শিশু ভাষা শিক্ষা করে, বড়দের অনুকরণ করিয়া। যদি পিতামাতা, শিক্ষক, আত্মীয় গুরুজনদের উচ্চারণ খারাপ হয় তবে তাদের দেখাদেখি শিশুদেরও খারাপ উচ্চারণের অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায়। শিশুদের আধো আধো উচ্চারণ শুনিতে খুব আমোদ লাগে। সেজন্য শিশুদের এই অস্পষ্ট উচ্চারণকে আমরা প্রশ্রয় দিই এবং অনেক সময় তাহাতে উৎসাহও দিই। শিশুর আধো আধো উচ্চারণ অবশ্যই

তাহার বাগযন্ত্রের অপরিণত বিকাশের ফল। তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই এ অস্পষ্ট উচ্চারণের ত্রুটি সারিয়া যায়। কিন্তু শিশুদের এই অস্পষ্ট উচ্চারণে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিলে বড় হইয়াও হয়তো তাহাদের ন্যাকা ন্যাকা উচ্চারণের অভ্যাস দূর হয় না। শুনিতে পাই উঁচু ঘরের মেয়েদের মধ্যে এই আধো আধো শিশুসুলভ উচ্চারণ (Baby-talk) নাকি কখনো কখনো ফ্যাসান বলিয়াই গণ্য হয়।

শিশু আট দশ বৎসর হইলেই তাহার স্পষ্ট উচ্চারণের অভ্যাস জন্মায়। তাই তোৎলামি বা উচ্চারণের ত্রুটি অন্যের বিরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং তাহাতে তাহারা নিজেদের ত্রুটি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হইয়া ওঠে, ফলে তাহাদের তোৎলামি বা উচ্চারণের বিশেষ ত্রুটিটি বরং বাড়িয়াই যায়। শিক্ষক এ জন্য বেশী ধমকধামক করিলে সে নিজেকে বিষম অসহায় বোধ করে এবং আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। ইহাতে সে লেখা-পড়ায় পিছাইয়া যাইতে পারে এবং অন্য বিষয়েও তাহার উৎসাহ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বন্ধু বান্ধব বা সঙ্গী সাথীরা তাহাকে বেশী ক্ষ্যাপাইলে তাহার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়, তাহার ফলে সে তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া 'কুনো' হইয়া যাইতে পারে অথবা সংযম হারাইয়া মারধর করিতে (aggression) উদ্যত হইতে পারে, বদ মেজাজী ও খিটখিটে হইয়া উঠিতে পারে।

শিশুর অনুভূতির জীবন শান্ত, স্নিগ্ধ, উৎসাহ ও সহানুভূতিপূর্ণ হইলে এ ত্রুটিগুলি কমই দেখা যায়। কিন্তু যেখানে শিশু নিজেকে অসহায় ও বিপন্ন বোধ করে, সেখানে তাহার ক্ষুদ্র শক্তি তাহার অনুভূতির তীব্রতাকে বশে রাখিতে পারে না। তখন তোৎলামি বা উচ্চারণের ত্রুটির মধ্য দিয়া তাহার অস্থির মানসিক সংঘাত আত্মপ্রকাশ লাভ করে। ইহা দেখা যায়, যে ছেলেরা ভীরু, অভিমানী, আত্ম-সচেতন, তাহাদের মধ্যেই তোৎলার সংখ্যা বেশী। ভয় পাইলে, ক্ষেপিয়া গেলে, ঘাবড়াইয়া গেলে, তোৎলামি বাড়ে। ডাঃ স্পক্ (Dr. B. Spock)-এর মতে ছোট অল্প বয়স্ক শিশু যখন কিছু কিছু কথা শিখিয়াছে অথচ সব মনের ভাব প্রকাশের পক্ষে তাহার ভাষার পুঁজি যথেষ্ট নয়, তখন তাহা যে আকুলি বিকুলি তা অনেক সময় তাহার তোৎলামির কারণ। তাহার প্রাপ্য ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এমন অশান্তি বা ঈর্ষাও শিশুর তোৎলামি রূপে দেখা দিতে পারে। যেদিন তার মা হাসপাতাল হইতে আর একটি ছোট নূতন বোনকে নিয়া বাড়ী আসিলেন, সেদিনই একটি

শিশুর তোৎলামি সুরু হইল। আর একটি শিশুর বেলায় দেখা গেল, বাবা বাড়ীতে ভয়ানক রাগিয়া খুব ধমক-ধামক করিতেছেন, তাহাতে ভীষণ ভয় পাইয়া সে তোৎলাইতে আরম্ভ করিল। মা হয়তো খুকুর বাহাদুরী দেখাইবার জন্য একদল অতিথির সামনে সদ্য শেখা কবিতা আবৃত্তির জন্য দাঁড় করাইয়া দিলেন, তাহার পরই সুরু হইল খুকুর তোৎলামি। অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে বেঁয়ে বা ন্যাটা ছেলেমেয়েদের জোর করিয়া ডান হাতে কাজ করাইতে চেষ্টা করাইলে তোৎলামি দেখা যায়। অনেকে মনে করেন ন্যাটা হওয়ারই একটা কারণ, শিশুর জীবনে মানসিক অশান্তি বা স্নেহের অভাব।

যদিও এটা খুব মারাত্মক দোষ নয়, তথাপি শিশুর তোৎলামির লক্ষণ দেখা দিলে পিতামাতা ও শিক্ষকের সতর্ক হওয়া উচিত। শারীরিক ও চিকিৎসা-যোগ্য কারণে এ সব ত্রুটি হইয়া থাকিলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার। সর্বক্ষেত্রেই শিশুর অনুভূতির জীবনে অশান্তি, উদ্বেগ ও উত্তেজনার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করা প্রয়োজন। পিতামাতা, শিক্ষক, ভাইবোন, বন্ধুদের কাছে স্বাভাবিক স্নেহ-ভালবাসা পাইলে এসব ত্রুটি সহজেই সারিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাপ-মা ইহার জন্য অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা করিলে তাহারও প্রতিক্রিয়া শিশুর মনের উপর ভাল হয় না। শিশুর সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার করাই দরকার। তাহার ত্রুটির জন্য অতিরিক্ত দয়া দেখাইলেও শিশু মনে মনে বিরক্ত হয় বা ভয় পাইয়া যায়। শিশু দেহ মনের সমস্ত বৈকল্যের চিকিৎসার বেলায়ই পিতা-মাতা ও শিক্ষকের একথা স্মরণ রাখা ভাল, যে স্বচ্ছ-বুদ্ধি মার্জিত ও সহজ স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসাই শিশুর শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাদান।

ব্যতিক্রমের বিপদ—মানসিক

মানসিক শক্তির উৎকর্ষ, ন্যূনতা বা বিকৃতিজনিত সমস্যা

ইতিপূর্বে আমরা ইন্দ্রিয়াদির স্বাভাবিক ক্ষমতার দিক দিয়া যারা ব্যতিক্রম—শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে তাহাদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি এবার আমরা আলোচনা করিব—মানসিক ক্ষমতার দিক হইতে যাহারা ব্যতিক্রম, তাহাদের সম্পর্কে।

সমস্ত প্রকার মানসিক ক্ষমতা বৈজ্ঞানিকভাবে পরিমাপ করিবার উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ ও জ্ঞান আহরণ—এ দুইয়ের জন্য প্রয়োজন যে মানসিক ক্ষমতা,—যাহাকে আমরা বলি বুদ্ধি,—তাহার তারতম্য বিচারের বৈজ্ঞানিক উপায় নির্ণীত হইয়াছে। বুদ্ধি যাহাদের অতিরিক্ত বা বুদ্ধি খুব কম, অথবা যাহাদের মানসিক শক্তির বৈকল্য ঘটিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়। মনস্তত্ত্ববিদরা এ বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন।

বুদ্ধি অতিরিক্ত বা ন্যূন বা বিকৃত—তাহা কি করিয়া বুঝা যায়? এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বা গভীর আলোচনার মধ্যে না গিয়া মোটামুটিভাবে বলা যায়, যে ছেলে বা মেয়ের মানসিক পরিণতি তাহার বয়সের তুলনায় সমমাত্রায় অগ্রসর হইয়াছে তাহাকে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ধরা হয়। যে ছেলের মানসিক বিকাশ বা মানসিক বয়স (Mental Age) ৭ বৎসর, তাহার বাস্তবিক বয়সও (Chronological Age) যদি ৭ হয়, তবে তাহার বুদ্ধির মাপ (Intelligence Quotient) হইল $\frac{\text{৭ বৎসর C.A}}{\text{৭ বৎসর A.M}}$ = ১০০ অথবা দশমিক চিহ্ন বাদ দিলে ১০০। যে ছেলের মানসিক পরিণতি ৯ বৎসরের ছেলের সমান, অথচ বাস্তবিক বয়স আট, তাহার বুদ্ধির মাপ হইত $\frac{৯}{৮}$ = ১'১২ অথবা দশমিক বাদ দিয়া ১১২। অর্থাৎ মানসিক বয়সকে বাস্তবিক বয়স দিয়া ভাগ করিয়া দশমিক চিহ্ন বাদ দিলে কোন ব্যক্তির বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক মাপ (I.Q) পাওয়া যায়। প্রথমে বিনেঁ (Binet) ১৯০৫ সালে মানসিক বয়স মাপিবার বৈজ্ঞানিক রীতি আবিষ্কার করেন। তাহার পরে টারম্যান্ মানসিক বয়সের সঙ্গে বাস্তবিক বয়স সংযুক্ত করিয়া বর্তমানে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মাপক (Intelligence Test)-এর প্রচলন করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইবে—যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ বা তাহার কাছাকাছি তাহাদিগকে সাধারণ বা মাঝারি (Average) বুদ্ধি বলিয়া ধরা হয়। মাঝারি বুদ্ধিমান লোকের সংখ্যা অর্ধেকের বেশী। এবং ক্রমে ক্রমে বুদ্ধির পরিমাণ বাড়িয়া আমরা পৌছাই প্রতিভাসম্পন্নদের কোঠায়,—যাহাদের বুদ্ধি ১৪০ বা তাহারও বেশী। আবার অনুরূপভাবে বুদ্ধির পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া কমিয়া আমরা ক্ষীণবুদ্ধি (যাহাদের I.O. ৫০ বা আরো কম) অথবা জড়বুদ্ধি বা একেবারে হাবাদের দলে পৌছাই (যাহাদের I.Q. ২৫-এর কম)।

বুদ্ধির ন্যূনতা জনিত সমস্যা—বুদ্ধিতে যাহারা খাটো, লেখাপড়া বিষয়ে বা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাহারা খুব সফল হইবে—এমন আশা কম। বর্তমান জগতে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবল এবং যাহারা বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী, তাহারাই সাধারণতঃ সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু এই পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই সাধারণের দলে (Average) এবং তাহারা মোটামুটি ভাবে স্বচ্ছন্দ জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে এবং সমাজে অন্য দশজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সুখেই জীবন যাপন করে। তাই যাহাদের বুদ্ধি সাধারণ হইতে খুব নীচু স্তরের নয় (I Q. ৮০ হইতে ৭০ র মধ্যে) তাহারা খুব উঁচুদরের সাফল্য অর্জন করিতে না পারিলেও জীবিকা উপার্জনে অক্ষম হয় না। যে সব যন্ত্রের কাজ খুব বেশী জটিল বা সূক্ষ্ম নয়, এমন কাজ (unskilled workmen), ছোটখাটো ব্যবসা (small traders), নীচু স্তরের কেরানীর কাজ ইত্যাদিতে ইহারা অসফল হয় না। লেখাপড়ার ব্যাপারে অবশ্যই ইহারা খুব সাফল্য অর্জন করিতে পারে না। যাহাদের I.Q. ৬০-এর কোঠায় তাহারা আরও ক্ষীণবুদ্ধি যদিও একেবারেই নির্বোধ নয় ইহারা মাঝে মাঝে ফেল করিয়া স্কুলের গণ্ডী সব সময় পার হইতে পারে না। এ সমস্ত ছাত্রদের পক্ষে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষালাভের প্রয়াস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পণ্ডশ্রম মাত্র। অবশ্য, এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই নয় যে যাহারা স্কুলে বারে বারে ফেল করে, তাহারা সকলেই বুদ্ধির দিক দিয়া খাটো। অনেক সময় এ পিছাইয়া পড়ার কারণ অ-স্বাস্থ্য, কোন ইন্দ্রিয় বা অঙ্গের বিশেষ রুগ্নতা, প্রতিকূল সাংসারিক পরিবেশ, শিক্ষক ও সতীর্থদের প্রীতি ও সহানুভূতির অভাব ইত্যাদি।

যাহারা বুদ্ধির দিক দিয়া কিছু খাটো, তাহারা অন্যদের তুলনায় নিজেদের হীন বিবেচনা করিয়া কিছুটা লজ্জা বোধ করিতে (a feeling of inferiority) পারে এবং এজন্য সকলের সঙ্গে ইহারা স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করিতে পারে না এবং কিছুটা অসামাজিক প্রকৃতির (unsocial) হয়। কিন্তু এই হীনতাবোধ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবেও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। নিজেদের হীনতা ঢাকিবার জন্য এরা অনেক সময় অতিমাত্রায় বাহাদুরী দেখাইতে যায়; নানা বিষয়ে মিথ্যা বড়াই করিয়া তাহারা

যে কাহারও চেয়ে ছোট নহে—ইহা সর্বদা প্রমাণ করিতে চাহে। ইহাদের বোকামি সহজেই মানুষের কাছে ধরা পড়ে এবং বেশী বাহাদুরি করিতে গিয়া এরা কখনো কখনো বিপদেও পড়ে। বুদ্ধির উপযুক্ত শাসন ও পরিচালনার অভাব থাকাতে ইহাদের অনুভূতির জীবন সুসম নহে। বুদ্ধি বিবেচনার অভাবে ইহারা সহজেই প্রবল ও বিচ্ছিন্ন ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হয়—কাজেই ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদি উত্তেজক ও ধ্বংসাত্মক কার্যে ইহারা সহজেই আকৃষ্ট হয়। এই সকল ধ্বংসাত্মক কার্যের মধ্য দিয়া ইহারা নিজেদের 'শক্তি' জাহির করিবার সুযোগ পায়, ইহাতে তাহাদের মনেও বেশ একটা তৃপ্তি ও ধারণা জন্মে যে 'আমরা সামান্য নই।' এবং অনেক সময় রাজনৈতিক বা বৈপ্লবিক নেতারা ইহাদের দ্বারা কার্য উদ্ধারের জন্য সাময়িকভাবে ইহাদের পিঠ চাপড়াইয়া উৎসাহিত করেন। এই মিথ্যা বাহাদুরীর পথেই এরা অনেক সময় অসামাজিক অপরাধে (যেমন, ট্রাম পোড়ানো, ঢিল ছোঁড়া, জুয়া খেলা, গুণ্ডামী, চুরি করা, মেয়েদের ইতর ইঙ্গিত করা, রকে বা চায়ের দোকানে বসিয়া অসংযত ভাষায় দেশের নেতাদের গালাগালি করা ইত্যাদি) গভীরভাবে লিপ্ত হয় (delinquency)। বিপদের কথা এই যে—বুদ্ধির অল্পতার জন্য ইহারা নিজেদের ব্যবহার বা কার্য যে অন্যায়, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে পারে না, কাজেই এ সব অন্যায় কার্য্যের জন্য তাহাদের নিজের মনের মধ্যেও কোন অপরাধ-বোধ নাই, কোন অনুশোচনাও নাই। বুদ্ধির অভাবেই ইহাদের ভাবাবেগ অসংযত; তাই ঝোঁকের মাথায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া ইহারা কাজ করিয়া বসে—এবং এজন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (যেমন—পুলিশ বা বিচারক বা হেডমাস্টার) তাহাদের শাস্তি দিলে তাহারা কিছুতেই তাহা শান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, বরং ভবিষ্যতে ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্যই মনকে আরো বিদ্বিষ্ট করিয়া রাখে। সেই জন্য এ জাতীয় অল্পবুদ্ধি মানুষেরা সমাজের পথে বিপদ। কিন্তু, মূলতঃ এ মানুষগুলি হিংস্র অপরাধী নয়। এদের অনেকের মধ্যেই একটা শিশুসুলভ সরলতা, দৃঢ় মহত্ত্ব, বন্ধুপ্রীতি, আদর্শনিষ্ঠা ইত্যাদি মহৎগুণের বীজ লুকায়িত আছে। এদের মনের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে, কর্মের মধ্যে খুব জটিলতা নাই। তাই যাহাকে তাহারা নেতা বলিয়া মানে তাহার কথায় ইহারা প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এরা

যুদ্ধের সময় দেশরক্ষার জন্য সর্বপ্রথম আগাইয়া যায়, এরা সর্বত্র মুক্তি আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক হইয়া পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর লাঠি ও গুলি মাথা পাতিয়া, বুক পাতিয়া নেয়, এরা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াইয়া জীবনের জয়গান গাহিয়া হাসিমুখে পৃথিবীর বুক হইতে বিদায় হয়। এদের মধ্যে খুঁজিলে পাওয়া যায় দস্যু রত্নাকর, পাপিষ্ঠ জগাই মাধাই, ভিন্দমোরেণার দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল। আবার বিনোবা ভাবেজীর মতো উপযুক্ত নেতৃত্ব পাইলে ইহারাই ঋষি, ভক্ত ও সমাজরক্ষকে পরিণত হইতে পারে। অবশ্য ইহার অর্থ এ নয় যে, সমস্ত বৈপ্লবিক কর্মী, দেশপ্রেমিক নির্ভীক মানুষ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি।

কাজেই বুদ্ধির দিক দিয়া যাহারা কিছু খাটো তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন আছে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাদের জন্য আলাদা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা থাকে না। তাহার ফলে অন্য ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে ইহারা অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাতে তাহাদের লেখাপড়ার বিষয়গুলি অনুরাগের বিষয় হইয়া ওঠে না। ক্রমেই তাহারা আরো পিছাইয়া পড়ে। ইহার উপর শিক্ষক বা সহকর্মীরা তাহাদের বুদ্ধির স্বল্পতার জন্য তাহাদের উপর বিরক্ত হইলে অথবা তাহাদের অবহেলা করিলে তাহারা লেখাপড়া ও ইস্কুল সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়ে। ফলে হয়তো ইহারা ইস্কুল পলাইয়া 'দলে' মেশে এবং সস্তা উত্তেজনার পথে অন্তরের অশান্তি দূর করিতে প্রয়াসী হয়। ইহাতে তাহাদের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হয়। কোন ক্লাশে এ রকম স্বল্পবুদ্ধি ছেলের সংখ্যা বেশী হইলে, সম্পূর্ণ ক্লাশটিরই লেখাপড়ার অগ্রগতি শ্লথ হয়। এ সব ছেলেরা ক্লাশের কাজে রস পায় না বলিয়াই অমনোযোগী হয়, ক্লাশে গোলমাল করে এবং এ অমনোযোগ ও বিশৃঙ্খলা অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। কাজেই এ সব ছেলেদের বুদ্ধির স্বল্পতা তাহাদের নিজেদেরও ক্ষতির কারণ, অন্যের পক্ষেও তাই। ইহাতে শিক্ষকের উদ্যম ও বিদ্যাবত্তারও বৃথা অপচয় ঘটে।

এ সব কথা বিবেচনা করিলে, যাহারা বুদ্ধির দিক দিয়া কিছু খাটো তাহাদের নিয়া আলাদা ইস্কুল বা ক্লাসের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। তাহাদের পাঠ্যতালিকাও সাধারণ ছাত্রদের তুলনায় সহজ করা দরকার। এবং ইহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার

যাহাতে তাহারা উচ্চতর শিক্ষার পথে না গিয়াও জীবিকা উপার্জন করিতে পারে। কাজেই এ জাতীয় ছেলেদের কারিগরী শিক্ষার উপর ঝোঁক দেওয়াই উচিত। ইহাদের জন্য দেশে যথেষ্ট Technical ও Industrial School স্থাপন করা প্রয়োজন। ইহারা মগজে খাটো হইলেও হাতের কাজের নিপুণতায় অনেক সময়ই ন্যূন নয়। বরং এ রকম কাজ যদি সফলভাবে তাহারা করিতে পারে তবে তাহাতে তাহারা আনন্দই পায় এবং নিজেদের সম্বন্ধে গর্ববোধ সার্থকভাবেই পোষকতা লাভ করে।

সমস্ত ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রেই বুদ্ধিমান, স্নেহশীল, মহচ্চরিত্র শিক্ষকের প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া স্বল্পবুদ্ধি ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহা আরো বেশী সত্য। পূর্বেই বলিয়াছি এ সমস্ত ছাত্রদের মনটা অনেকটা নির্বোধ শিশুর মতো সরল। ইহারা অক্ষম বলিয়াই স্নেহের কাঙ্গাল। যে শিক্ষক মায়ের মতো ক্ষমাশীল এবং ধরিত্রীর মতো ধৈর্যশীল তিনি তাঁহার মহৎ হৃদয়ের স্পর্শ দিয়া কল্যাণের পথে ইহাদের অসংযত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া ইহাদের নূতন মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন। **কঠোর ও নির্মম শাস্তি বা অবজ্ঞা ইহাদের অবজ্ঞেয় করিয়া তুলিবার পথই প্রশস্ত করে।** বলা বাহুল্য, এ সব সন্তানদের সম্বন্ধে পিতামাতার দায়িত্বও বুদ্ধিমান সন্তানদের তুলনায় গুরুতর।

ক্ষীণবুদ্ধি ও জড়বুদ্ধিদের সম্বন্ধে সমস্যা

যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬০ হইতে ৫০-এর মধ্যে তাহারা নিশ্চিতই ক্ষীণবুদ্ধি। ইহাদের চেহারায় ও কথাবার্তায় বুদ্ধিহীনতার ছাপ সুস্পষ্ট। ইহাদের হাঁটা চলাও পরিচ্ছন্ন নয় (Clumsy gait)। ইহাদের ইংরাজীতে morons বলা হয়। ইহারা কাজকর্ম গুছাইয়া করিতে পারে না। নিজে বুদ্ধি খরচ করিয়া কোন সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। এই ক্ষীণবুদ্ধির কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মগত, ইহাদের মস্তিষ্ক সুগঠিত নয়—স্নায়ুকেন্দ্র এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ উপযুক্ত পরিণতি লাভ করে নাই। অনেক সময়ই রসক্ষরা গ্রন্থি বা হর্মোণের ত্রুটিপূর্ণ কার্য এদের মধ্যে দেখা যায়। ইহা স্বীকৃত যে মানুষের বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের পরিণতির উপর থাইরয়েড (thyroid) গ্রন্থির প্রভাব অসামান্য। স্যাণ্ডিফোর্ড বলেন—"সমস্ত দেহের উপর এর নিয়ামক ক্রিয়া (regulator) বর্তমান। এই থাইরয়েড-এর

স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর সমস্ত দেহের ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে, কাজেই মানব ব্যবহারের উপর এর প্রভাব সহজেই অনুমেয়।" উড্‌ওয়ার্থের মতে এই হর্মোণের ক্ষরণে ন্যূনতা ঘটিলে ব্যক্তির দেহের চামড়া শিথিল, চক্ষু নিষ্প্রভ ও আকার ক্ষুদ্র হইয়া যায়। এ সব ব্যক্তি উৎসাহহীন, অলস ও নির্বোধ হয়। এই ন্যূনতার জন্য যে সব রোগ হয় তার মধ্যে প্রধান হইতেছে মাইক্‌সেডিমা (myxoedima) ও ক্রেটিনিজম্ (cretinism)। আবার এর ক্ষরণ অতিরিক্ত হইলে শারীরিক বৃদ্ধি হয় অস্বাভাবিক, এবং দেহের বৃদ্ধিটাও হয় অতি দ্রুত। এরকম ব্যক্তি চঞ্চল, অসন্তুষ্ট, অস্থিরচিত্ত হইয়া থাকে। তাহার বুদ্ধিটা কিন্তু বাড়ে না। সাম্প্রতিক কালে পল্ ডি ক্রুইফ্ (Paul de Cruif) এই হর্মোণদের সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাব্রতী শিক্ষক সকলের নিকটই এ সব তথ্য অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। পূর্বে এ সব শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি চিকিৎসার অযোগ্য মনে করা হইত। কিন্তু এখন জানা গিয়াছে হর্মোণের অভাবের ক্ষেত্রে মেষের থাইরয়েড খাইতে দিলে কিছুটা উপকার হয়। এই হর্মোণ এখন কৃত্রিম উপায়ে তৈরী হইতেছে। এবং থাইরয়েড ঘটিত নানা ইন্‌জেক্‌সন এবং খাওয়ার ঔষধও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইহাদের জন্য আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া উপায় নাই। ইহাদের ধৃতিশক্তি (power of comprehension) যেমন দুর্বল, স্মৃতিশক্তিও তেমনি অপ্রখর। জটিল ও বিমূর্ত চিন্তা (abstract thinking) ইহাদের সাধ্যের বাহিরে। ইহাদের বুদ্ধি কখনও ৬।৭ বৎসরের ছেলেদের চেয়ে বেশী পরিণতি লাভ করে না। বিশেষ (particular) ও মূর্ত (concrete) বিষয় ইহারা বুঝিতে পারে, বারে বারে মুখস্থ দ্বারা ইহারা সহজ পাঠ মনে রাখিতে পারে। হাতের কাজ ও সহজ যান্ত্রিক কাজ (Simple mechanical and repetitive)-গুলি ইহারা মোটামুটি আয়ত্ত করিতে পারে। সহজ হাতের কাজের মধ্য দিয়াই ইহাদের কিছুটা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। কাজেই বাঁশের বা বেতের কাজ, সহজ সহজ চামড়ার কাজ, বিড়ি পাকানো, শিশিতে লেবেল লাগানো—এ সমস্ত কাজে ইহাদের লাগানো যাইতে পারে। মণ্টেসরী প্রথমে এই জাতীয় অল্পবুদ্ধি ও ক্ষীণবুদ্ধি বালকবালিকাদের শিক্ষার ভার নিয়া নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়া দেখিলেন শিশুদের শিক্ষা দিবার সহজ উপায় হইতেছে লেখাধূলা ও হাতের কাজ। ইহারা বুদ্ধি করিয়া অনভ্যস্ত

নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারে না। তবে গাড়ীঘোড়া সামলাইয়া রাস্তাঘাট চলিতে পারে, কাপড় চোপড় নিজেরা পরিতে পারে, জীবনের মৌল স্থূল কাজগুলি মোটামুটি চালাইতে পারে, কাজেই সর্বদা ইহাদের নিজেদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া চলে না এবং কাহারও তত্ত্বাবধানেই ইহারা কাজ করিতে পারে।

ইহাদের ইন্দ্রিয় ও পেশী অপরিণত এবং ইহাদের জ্ঞান ও কর্মের পরিধি সীমাবদ্ধ। ইহারা অব্যবস্থিতচিত্ত এবং ইহাদের মনোযোগ বেশীক্ষণ এক বিষয়ে থাকে না। ইহাদের অনুভূতির জীবনও বিশৃঙ্খল ও অনিয়ন্ত্রিত। আদিম বন্যসংস্কার (instincts) দ্বারা ইহারা চালিত। শুভাশুভ বুদ্ধি, বা কার্যের ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিতে ইহারা অক্ষম। সদুপদেশ দ্বারা ইহাদের সংশোধন হওয়া কঠিন। অনেক সময় শাসনের দ্বারা ইহাদের সংযমে রাখিতে হয়। তবে ইহারাও সহজে স্নেহ ও মমতার দ্বারা বশীভূত হয়। ইহাদের মনের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব। ইহারা সন্দিগ্ধচিত্ত ও নিষ্ঠুর হইতে পারে। তবে যাঁহারা ধৈর্য ও ভালবাসা দিয়া ইহাদের হৃদয় জয় করিতে পারেন, তাঁহাদের ইহারা সম্পূর্ণ বশ হয়। সাধারণ মানুষকে যে মান দিয়া বিচার করা হয়, ইহাদের ক্ষেত্রে সে মান ব্যবহার করিলে ভুল হইবে। ইহারা ভাবিয়া অন্যায় করে না, অন্যায়বোধই ইহাদের অপরিণত। সমাজের জটিল সম্বন্ধ ও নীতিবুদ্ধি ইহাদের আয়ত্তের বাহিরে এবং পরের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে ইহারা শিশুর মতোই অক্ষম।

অনেক সময়ই ইহারা নিজেরা নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম নয়। দায়িত্বশীল কাহারও তত্ত্বাবধানে ইহাদের দিয়া বাগানের কাজ, কুটির শিল্পের নানাপ্রকার কাজ করানো যাইতে পারে। কলকারখানার কাজ বা যেখানে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে এ রকম যন্ত্রাদির কাজে ইহাদের কদাচ দেওয়া উচিত নয়।

জড়বুদ্ধি ও একেবারে নির্বোধদের সমস্যা

যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০-এর নীচে ২৫ পর্যন্ত, তারা জড়বুদ্ধি (imbecile)। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২৫-এরও নীচে তাহারা একেবারে নির্বোধ (Idiots)। এ দুর্ভাগ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মগত, পিতামাতার অতিরিক্ত মদ্যাসক্তি বা ধাতুরোগ সন্তানের দুরবস্থার জন্য দায়ী: হইতে পারে। পলিও (polio),

মেনিঞ্জাইটিস্ (meningitis) ইত্যাদি রোগের ফলেও মস্তিষ্কের বোধ ও কর্মকেন্দ্র বা তাহাদের সংযোগ রোগগ্রস্ত হইয়া বুদ্ধির এই বিষম হ্রাস জন্মিতে পারে। রসক্ষরাগ্রন্থির ক্ষরণের ব্যতিক্রমের সহিত বুদ্ধির বিপর্যয়ের সম্বন্ধ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পলিও ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা চলিতেছে। একেবারে প্রথম অবস্থায় ভিন্ন চিকিৎসার দ্বারা খুব সন্তোষজনক ফল এখনও পাওয়া যায় নাই। এমন সন্তান পিতামাতার সমস্ত জন্ম দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণ। তবে ইহারা প্রায়ই স্বল্পায়ু হইয়া থাকে।

জড় বুদ্ধি বা নির্বোধেরা বাস্তবিক পক্ষে মনুষ্যেতর জন্তু বা ছোট শিশুর মতো অপরিণত। ইহাদের জিব দিয়া লালা গড়াইয়া পড়ে, চোখের কোণে পিচুটি লাগিয়া থাকে। দেহের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলিও ইহারা নিজ চেষ্টায় মিটাইতে পারে না। অনেক সময় অবশেই মাথা নাড়ে, চক্ষু ঘুরায়। হা হা করিয়া অর্থহীন ভাবে হাসে, সঙ্গত কারণ ব্যতীতই কাঁদে। ইহারা সহজ স্বচ্ছন্দভাবে হাঁটা চলাও করিতে পারে না। ইহাদের কাহারও মস্তিষ্কের আকার অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ। ইহারা একান্তই পরনির্ভয় এবং বিপদ সম্পর্কে ইহারা সচেতন নয়। তাই পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনদের ইহাদের সম্বন্ধে সর্বদা শঙ্কিত থাকিতে হয়। জল, আগুন, গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদি বিপদ হইতে ইহাদিগকে সতর্কে রক্ষা করিতে হয়। ইহাদের লেখাপড়া শেখানো বা জীবিকার জন্য কাজ শেখানো প্রায় অসম্ভব। মৃত্যু পর্যন্ত এই হতভাগ্য ব্যতিক্রমদের দায় পিতামাতা বা সমাজকে বহন করিতে হয়। উপযুক্ত যত্ন, চিকিৎসা ও অসীম ধৈর্যের সঙ্গে স্নেহশীল ব্যবহার দ্বারা ইহাদের কিছু পরিমাণে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারাই যথেষ্ট। ইহারা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবন যাপনে সক্ষম হইবে এমন আশা করা যায় না।

তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভাবানদের সমস্যা

মানুষ প্রকৃতির সন্তান—কিন্তু সে অশান্ত অবাধ্য সন্তান। মনুষ্যেতর প্রাণীদের জীবন প্রকৃতি দ্বারাই পরিচালিত। ইন্দ্রিয়ের বোধ, পেশীর কর্মক্ষমতা প্রকৃতিদত্ত অন্ধ আবেগ ও সংস্কার (instincts) দ্বারা ব্যবহার করিয়া তাহারা তাহাদের জীবনযাত্রা অনেকটা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন করে। তাহারা প্রকৃতির উদ্দেশ্য কি, প্রাকৃতিক শক্তিগুলির স্বরূপ কি, তাহা জানে না এবং সেই শক্তিগুলিকে নিজস্ব উদ্দেশ্যে সচেতন ভাবে ব্যবহার

করিয়া নিজ জীবনের গতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পশুদের নাই। মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে উন্নততর জীব, কারণ সে প্রকৃতির দাস নয়। শক্তির স্বরূপ কি তাহা জানিয়া নিজের উদ্দেশ্যে তাহাদের ব্যবহার করিতে মানুষ সর্বদাই চেষ্টিত। মানুষের এই সদাজাগ্রত ঔৎসুক্য, উদ্যম ও কর্মপ্রচেষ্টার মূলে আছে মানুষের বুদ্ধি। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস বুদ্ধির জয়যাত্রার ইতিহাস।

কাজেই মানুষ বুদ্ধিকে দাম দেয়। যাহার বুদ্ধি আছে সে জটিল সমস্যার সমাধান করিতে পারে, সে নূতন অবস্থায় সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে, নূতন আবিষ্কার করিতে পারে,—উন্নতির নূতন পথ সূচনা করিতে পারে। তাই মানুষের সমাজে যাহাদের বুদ্ধি আছে তাহাদের সম্মান আছে। আমরা বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে চাই, বুদ্ধিমান দেশনেতা-চাই, বুদ্ধিমান জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ইন্‌জীনিয়ার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও কারিগর চাই (চাই না শুধু অতিবুদ্ধিমতী স্ত্রী বা অতিবুদ্ধিমান চাকর!) একথা আমরা বিশ্বাস করি, এই তীব্র প্রতি-যোগিতাপূর্ণ জগতে বুদ্ধিই সাফল্যের মূল। মোটামুটিভাবে এ কথা সত্য।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি একেবারে ঠিক ঠিক সাধারণের বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q) হইতেছে ১০০। বুদ্ধ্যঙ্ক যাহাদের ১১০ হইতে ৯০ পর্যন্ত তাহাদেরই সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া ধরা হয়। যাঁহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০-এর কোঠায়, তাঁহারা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং যাঁহাদের ১৪০ বা তাহার বেশী বুদ্ধ্যঙ্ক, তাঁহারা প্রতিভাবান বলিয়া বিবেচিত হন। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সেনাপতি, শিল্পী যাঁহারা পৃথিবীর নেতৃত্বস্থান অধিকার করিয়াছেন, যাঁহারা মানুষের জ্ঞান ও কর্মের পরিধি বিস্তৃততর করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই বুদ্ধ্যঙ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে তাহা সাধারণের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০র অনেকটা উপরে। সমস্ত সভ্য-দেশেই এই অসাধারণদের আবিষ্কার করিবার ও পুরস্কৃত করিবার চেষ্টা হয়। সেজন্যই নোবেল প্রাইজ, পুলিজার প্রাইজ, স্টালিন প্রাইজ, 'পদ্মশ্রী ইত্যাদি ভূষণের ব্যবস্থা। এ রকম অসাধারণ ব্যক্তি যে সমাজে যত বেশী জন্মগ্রহণ করেন ততই কল্যাণ। ইঁহারা দেশ ও সমাজের অমূল্য সম্পদ।

যাঁহারা প্রতিভাবান্ তাঁহাদের পিতামাতাও প্রতিভাবান্ না হইতে পারেন। তবে প্রতিভার মূল বহুলাংশে জন্মগত এমন বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। সাধারণতঃ প্রতিভাবানদের পারিবারিক পরিবেশ অনুকূল। মনীষী জনসনের সংজ্ঞা মতে প্রতিভা পরিশ্রম করিবার অসীম ক্ষমতা—Genius

is the capacity for taking infinite pains। ইহা সত্য যে প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরা সাধারণের তুলনায় অনেক বেশী পরিশ্রম করিতে পারেন। ইহার কারণ কিছুটা পরিমাণ শারীরিক হইতে পারে। কোন কোন মনো-বিজ্ঞানীর মতে ইঁহাদের স্বাস্থ্য ও ইন্দ্রিয়াদির তীক্ষ্ণতা সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেকটা বেশী। তাঁহাদের মানসিক শক্তির পুঁজি অন্য মানুষের চেয়ে অনেক ভারী। কিন্তু সাধারণের চেয়ে তাঁহাদের প্রভেদ শুধু মাত্র শক্তির প্রাচুর্যে নয়,—ইহা শুধুমাত্র পরিমাণগত প্রভেদ নয়, ইহা মূলতঃ গুণগত। যাঁহারা প্রতিভাবান্ তাঁহারা বাহিরের কোলাহল ও প্রতিকূলতাকে অনেক সহজে উপেক্ষা ও অতিক্রম করিতে পারেন। তাঁহারা অনেক বেশী আত্মস্থ চিন্তা ও কর্মের বস্তুতে তাঁহারা সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হইয়া তদ্গতচিত্ত হইতে পারেন। তাঁহাদের মানসিক ক্ষমতার উৎকর্ষের জন্যই সাধারণে যাহা দেখিতে পায়, তাহার চেয়ে তাঁহারা অনেক বেশী এবং অনেক বেশী দূর দেখিতে পারেন। ইহাকেই প্রাচীন ভারতে ঋষিদৃষ্টি বলা হইত। প্রতিভাবানদের আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি অনেক বেশী সুসংযত, তাই দুঃখের দিনে ইহারা অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হন না, সুখেও ইঁহারা প্রমত্ত হন না। দৃঢ় মনোবলের জন্য ইঁহারা চতুর্দিকের বিপদ, বাধা প্রতিকূলতার মধ্যে একাগ্র হইয়া নিজ সাধনায় স্থির থাকিতে পারেন। কিন্তু প্রতিভার উৎকর্ষের জন্য কঠিন মূল্য দিতে হয়। প্রতিভাবানদের জীবন সহজ আরামের জীবন নয়। তাঁহাদের সম্পর্কেও তাই 'সমস্যা'র কথা আসে।

এই সাধারণের পৃথিবীতে প্রতিভাবানেরা নিতান্তই সংখ্যালঘু, এবং সংখ্যা-গরিষ্ঠতা দিয়াই যেখানে সমস্ত বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়, সেখানে মুষ্টিমেয় প্রতিভাবান্দের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, মতামতের উপযুক্ত মূল্য নাও দেওয়া হইতে পারে। তাই প্রতিভাবান্রা সব সময় এ পৃথিবীতে খুব সুখী হন না। অনেক সময় তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণের 'জনতা'র সঙ্গে সুর মিলাইয়া চলিতে পারেন না। যাঁহাদের বুদ্ধি কম, তাঁহারা অতি-বুদ্ধিমানদের সব সময় খুব সুনজরে দেখেন না। তাঁহারা অনেকের ঈর্ষার পাত্র। তাঁহাদের নিজের মনেও কমবুদ্ধি সাধারণ মানুষের সম্পর্কে কিছুটা অবজ্ঞা ও অবহেলা থাকিতে পারে এবং সে জন্য মানুষের সঙ্গে সহজভাবে তাঁহারা মিশিতে পারেন না। সাধারণ মানু-ষেরাও তাঁহাদের সন্দেহের চোখে দেখে। গ্রীস দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সক্রে-টিসকে তাই জনতার বিচারে ধর্মদ্রোহী ও সমাজের শত্রু বলিয়া চরম শাস্তি

গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সাধারণ মানুষের মত সাংসারিক বুদ্ধি থাকিলে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারিতেন অথবা কারাগাররক্ষীদের ঘুষ দিয়া পলাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ও আদর্শনিষ্ঠাই তাঁহার কাল হইল। স্বেচ্ছায় হেমলক্ বিষপানে তিনি নিজ জীবন বলি দিলেন।

যে সব শিশু বাল্যকালেই প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় তাহাদের পিতামাতাদের তাহাদের সম্পর্কে গর্ব থাকা স্বাভাবিক। সকলের কাছে নিজ সন্তানের বুদ্ধি প্রমাণ করিবার জন্য পিতামাতা অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইতে পারেন। ইহাতে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতির ধারা ব্যাহত হইতে পারে। ইহার ফল একেবারেই শুভ নয়। শিশু তাহাতে অল্প বয়সেই গর্বিত এবং নিজ বুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিতে পারে এবং তাহার মনে এই বিপজ্জনক ধারণা জন্মিতে পারে যে তাহার পরিশ্রম করিয়া লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই। বর্তমান সময়ে যাহারা সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে অথবা যে সমস্ত ছোট ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সেই নাচে, গানে, আবৃত্তিতে প্রতিভার লক্ষণ দেখায়, খবরের কাগজে তাহাদের ছবি ও পরিচয় সাড়ম্বরে প্রচারিত হয় এবং প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে ইহাদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। সাফল্যের জন্য কিছুটা প্রশংসা ও পুরস্কার ভালই কিন্তু অপরিণত মনের পক্ষে এত প্রশংসার ফল অনেক সময়ই শুভ হয় না। ইহাতে পুরস্কারপ্রাপ্তরা নিজেদের 'কেউ কেটা' বলিয়া ভাবিতে শেখে এবং কম বুদ্ধিমানদের সম্বন্ধে অবজ্ঞাশীল হয়। যে ছেলেটি সংসারের মধ্যে প্রখর বুদ্ধিমান পিতামাতা তাহাকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দিলে সংসারেও অশান্তির সৃষ্টি হয়। সে 'ভালো ছেলে' বলিয়াই হয়তো পরিবারের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের যে সব প্রয়োজনীয় ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ করিতে হয় তাহা হইতে তাহাকে রেহাই দেওয়া হয়। তাহাতে এ ছেলের অন্যান্য ভাইবোনেরা ভাবিতে শেখে, "ওর তো সাতখুন মাপ—ও তো বাবা বা মার আদুরে ছেলে।" ইহাতে তাহারা এই অতিরিক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন ভাইটির প্রতি বিদ্বিষ্ট না হইয়াই পারে না। তাহার উপর যদি বাবা মা অন্যান্য সন্তানদের এই ভালো ছেলেটির সঙ্গে তুলনা করিয়া পদে পদে খোঁটা দেন, তবে তাহাদের বিদ্বেষ তীব্র ঘৃণায় পরিণত হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়।

অথবা বিপরীতও হইতে পারে। পিতামাতা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ছেলেকে 'বেশী পাকা', 'সবজান্তা' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করিয়া তাহার সুস্থ

কৌতূহলের মূলোচ্ছেদ করিয়া তাহার বুদ্ধির বিকাশ রুদ্ধ করিতে পারেন। তাহার বুদ্ধি আছে বলিয়া যদি গুরুজন, ভাইবোন সকলে তাহাকে বারেবারেই উপহাস বা তিরস্কার করেন তবে সে নিজের মধ্যেই লুকাইয়া থাকিতে চাহিবে—তাহার স্বাভাবিক শক্তির চর্চায় নিরত হইবে। সে অন্যের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিতে চাহিবে না এবং সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিবে। ইহাতে শিশুর জীবনের সুস্থ বিকাশের প্রধান প্রয়োজন যে নিরাপত্তা বোধ (sense of security) তাহা বিঘ্নিত হইবে, এবং এরকম শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে ভীতু, আত্ম-অবিশ্বাসী ও অসুখী হইবে। Crow & Crow বলিয়াছেন "If the family resents his superiority, he will try not to show it, to withdraw within himself and stifle his self-expression and natural development. He may attempt to compensate for the feeling of insecurity and frustration by directing his energies in merely intellectual channels. If again, he is over-indulged, he may become self-opinionated, aggressive and emotionally uncontrolled."

বিশেষ করিয়া বয়ঃসন্ধিকালে এ সব ছেলেদের সংসারের সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া চলা কঠিন হয়। সাধারণতঃ দেহের দিক দিয়াও ইহাদের বিকাশ সাধারণ ছেলেদের চেয়ে বেশী এবং অনেক সময়ই তাহারা তাহাদের চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের সঙ্গে মিশিতেই ভালবাসে। তাহার বয়সের ছেলেদের পক্ষে পরিবারের যে শাসন স্বাভাবিক, তাহাকে সে নিজ স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া মনে করিয়া বিরক্ত হয়। বেশী বাধা দিলে বা গালমন্দ করিলে সে বিদ্রোহ করিতে পারে। তাহার ব্যবহারে বেয়াদপ প্রকাশ পায়। সে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া অন্যান্য ভাইবোন বা ছোটদের মারধর (aggression) করিয়া তাহার অবরুদ্ধ অনুভূতির মুক্তি দিতে চেষ্টা করিতে পারে। দেহ ও বুদ্ধির দিক দিয়া পরিণত হইলেও তাহার অনুভূতি ও সামাজিক শিক্ষা অপরিণত ; কাজেই তাহার চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের অনুরূপ ব্যবহার ও স্বাধীনতার দাবী করিয়া সে নিজের স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে অতি দ্রুত করিতে গিয়া নিজের বিপদ ও সংসারে অশান্তি ডাকিয়া আনিতে পারে। বড়দের বেলায় যে অভিজ্ঞতা স্বাভাবিক ও শোভন, তাহার পক্ষে তাহা অশোভন ও বিপজ্জনক

হইতে পরে। কাজেই প্রতিভাবান্ ছেলেদের সম্বন্ধে পিতামাতার দায়িত্ব সমধিক। একদিকে দেখা দরকার ইহাদের শক্তির প্রাচুর্য, উচ্ছল প্রাণশক্তি যেন পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়। তাই এ সব ছেলেকে অন্যদের তুলনায় বেশী স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন, কিন্তু অন্য দিকে তাহার প্রাণপ্রাচুর্য যাহাতে অবাঞ্ছিত ধারায় বহমান হইয়া অপচয়িত না হয়, তাহার জীবনের সুস্থ বিকাশের ধারা যাহাতে সুসঙ্গত পরিণতিতে পৌছিতে পারে সেজন্য উপযুক্ত শাসন ও পরিচালনও প্রয়োজন। তাহার শক্তি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন ও মদমত্ত হইলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। যাহাতে সে অন্য দশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে সহজ ভাবে ও আনন্দের সঙ্গে মিশিয়া, বাড়িয়া উঠিতে পারে—অনুভূতি ও আবেগের প্রবল ঝড়ঝাপ্টা হইতে যাহাতে সে রক্ষিত হইতে পারে, সেদিকে পিতামাতারই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

এ সমস্ত ছেলেদের সম্বন্ধে সমস্যা শুধু পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেও নানা সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণতঃ এ সব ছেলেদের জন্য আলাদা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা থাকে না। ক্লাসের আর দশটি সাধারণ ছেলের সঙ্গেই ইহারা একই পড়াশুনা করে। কিন্তু ইহাদের বোধশক্তি তীক্ষ্ণতর এবং স্মৃতিও প্রখরতর, সুতরাং যে পড়া অন্যান্য ছেলেরা তিন ঘণ্টায় শেখে, তাহা আয়ত্ত করিতে তাহার আধঘণ্টার বেশী লাগে না। কাজেই ক্লাসের পড়া তাহার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ (challenge) করে না। তাহাতে বুদ্ধির ধার মরিয়া যায়। ক্লাসের পড়াশুনার গতি সাধারণ ছেলেদের বুদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলে। প্রতিভাসম্পন্ন ছেলে তাই ক্লাসের পড়ায় যথেষ্ট রস পায় না। তাহার বুদ্ধি 'কঠিন' সমস্যার সমাধান করিতে উদগ্রীব, কিন্তু তাহার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে তেমন 'শক্ত' বস্তু না থাকাতে সে অলস ও অমনোযোগী হইয়া পড়ে। তাহার 'বাড়তি শক্তি' (surplus energy) উপযুক্ত মুক্তির পথ খোঁজে। তাহা স্বাভাবিক ভাবে না পাইলেই বিরক্তি আসে। ক্লাসের কাজে তাহার প্রচুর প্রাণ শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার হয় না বলিয়াই হয়তো তাহার মন অন্যদিকে ধাবিত হয়; হয়তো নানা দুষ্টামীর ফন্দি (যেমন পণ্ডিতমশাইয় টিকিটা কাটা, পাশের ছেলের পকেটে একটা জ্যান্ত ব্যাং পুরিয়া দেওয়া) মনের মধ্যে খেলিতে থাকে। ক্লাসের কাজে যথেষ্ট রস পায় না বলিয়াই সে পাশের ছেলের সঙ্গে গল্প করে অথবা আপন মনে ছবি আঁকে। ইহাতে তাহারও বুদ্ধির উপযুক্ত উন্নতি হয় না—কখনো

কখনো ক্লাসের কাজেরও ব্যাঘাত হয়। তাহার কুদৃষ্টান্ত অন্য ছেলেদেরও নষ্ট করে।

শিক্ষক সাধারণতঃ বুদ্ধিমান ছেলেদের পছন্দ করেন। তাহারা আলোচিত বিষয় সহজে বোঝে, তাহাতে রস পায়। যেখানে ছাত্রের মন উন্মুখ ও গ্রহণেচ্ছু সেখানে শিক্ষকও কাজ করিয়া আনন্দ পান। তাঁহার বিদ্যাবত্তা হইতে ছাত্র উপকৃত হইলে তিনি নিজ সার্থকতা খুঁজিয়া পান। সুশিক্ষকের সকলের চেয়ে গৌরব যে তিনি তরুণ আগ্রহী মনগুলিকে নূতন আলোর পথে, নূতন জিজ্ঞাসার পথে উৎসুক করিয়া তুলিতে পারেন। কিন্তু অনেক সময় বুদ্ধিমান ছেলেদের সম্বন্ধে শিক্ষকের স্নেহের পক্ষপাতিত্ব থাকে। অন্যে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, তাহা বুদ্ধিমান ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করেন এবং সে যদি মোটামুটি সদুত্তর দিতে পারে, তখন তিনি তাঁহার এই প্রিয় ছাত্রটিকে ক্লাসের অন্যান্য ছেলের কাছে তুলিয়া ধরেন। তাহার সাফল্যে তাঁহার নিজের কৃতিত্বই যেন অনুভব করেন। তিনি অবশ্য এ প্রকার প্রশংসা দ্বারা বুদ্ধিমান ছেলেটিকে উৎসাহই দিতে চান। কিন্তু যাহাকে উৎসাহ দেওয়া হইল, সে সম্ভবতঃ ইহাতে বিব্রত বোধ করে। অথবা হয়তো এ অতি-প্রশংসা দ্বারা তাহার মাথাটি খাওয়া হয়, সে নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে আরম্ভ করে এবং মনে করে তাহার আর পরিশ্রম করিবার প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র প্রতিভার জোরেই সমস্ত বিষয় সে অধিগত করিতে পারিবে। প্রতিভার সঙ্গে যেখানে কঠিন পরিশ্রম নাই, সেখানে প্রতিভার বিকাশ রুদ্ধ হয়। প্রতিভা সম্ভাবনা মাত্র (potentiality), তাহার বাস্তবরূপায়ণ সাধনা সাপেক্ষ। যেমন গৃহে, তেমনি বিদ্যালয়েও বুদ্ধিমান ছেলের সহিত অন্যান্য সতীর্থদের সম্বন্ধ অনেক সময়ই সহজ ও আনন্দময় হয় না। অন্যান্য ছেলেরা তাহাকে 'ভালো ছেলে' বলিয়া এড়াইয়া চলে। তাহাকে ঈর্ষা করে। বিশেষতঃ, এ ছেলেটির নিজের মনেও যদি 'হামবড়া' ভাব থাকে, তবে সে অন্যান্যদের বিদ্বেষ ও উপহাসের পাত্র হয় এবং হয়তো তাহাকে গোপনে তাহারা 'বিদ্যাসাগর', 'দিগ্‌গজ' ইত্যাদি নামে ঠাট্টা করিয়া থাকে। সমস্ত শিশু,—শুধু শিশু কেন, সমস্ত মানুষই,—আপন দলের কাছে প্রীতি ও বন্ধুত্ব চায়—সকলেই অন্যের কাছে, অন্ততঃ অল্প কয়েকজন অন্তরঙ্গের কাছে, 'গ্রহণীয়' acceptance by the group) হইতে আকাঙ্ক্ষা করে। সুস্থ ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক। কিন্তু প্রতিভাবান্ ছাত্রদের ক্ষেত্রে অনেক সময় ইহার অভাব

ঘটে, এবং কখনো কখনো দেখা যায় সতীর্থদের প্রীতির আশায় এ রকম বুদ্ধিমান্ ছেলে নিজের 'ভালো ছেলে' নাম ঘুচাইবার আগ্রহে, নিজেকে অন্যদের সমান প্রমাণ করিবার আশায়, সিগারেট খাওয়া, ক্লাসে গোলমাল করা, অশ্লীল কথা বলা ইত্যাদি অবাঞ্ছিত ব্যবহারে উৎসাহ প্রকাশ করে। ইহা অভ্যাসে দাঁড়াইলে অবশ্যই গুরুতর ক্ষতির কারণ।

সব সময়ই শিক্ষক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ ছেলেদের পছন্দ করেন, তাহা নাও হইতে পারে। শিক্ষককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী শেষ করিতে হয়। তাঁহার দৃষ্টি থাকে যাহাতে সব চেয়ে বেশী পরিমাণ সাধারণ ছাত্র সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় পাশ করিয়া যাইতে পারে। কাজেই মোটা মোটা দরকারী (important) প্রশ্নগুলিই তিনি ক্লাসে আলোচনা করেন। কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করিবার উৎসাহ তাঁহার বড় একটা হয় না। কিন্তু তীক্ষ্ণধী ছাত্রের মন এই 'ফাঁকি' পড়ায় ভরে না। সে প্রশ্ন করিতে চায়, তর্ক করিতে চায়, বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করিয়া আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিতে চায়। সাধারণ ছেলেরা বইয়ের ছাপার অক্ষরে লেখা কথা বা শিক্ষক মহাশয়ের কথা সহজেই মানিয়া নেয়। তাহাতে মনের পরিশ্রম করিবার কষ্ট বাঁচে। কিন্তু যাহাদের বুদ্ধি শাণিত এবং বিশ্লেষণশক্তি প্রবল, তাহাদের সন্দেহ ও বিচার করিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। কিন্তু তাহাতে শিক্ষক মহাশয়ের কাজে ব্যাঘাত হয়, অন্যান্য ছাত্রও হয়তো বিরক্ত হয়। তাছাড়া ছাত্র তর্ক করিলে, বা সন্দেহ করিলে, শিক্ষকের মনে হইতে পারে ছাত্র তাঁহার বিদ্যাবত্তার প্রতি কটাক্ষ করিতেছে। তাই তীক্ষ্ণধী ছাত্রের স্বাভাবিক ঔৎসুক্যকে তিনি 'জ্যাঠামি', 'পাকামি', ইত্যাদি বলিয়া তিরস্কৃত করিতে পারেন। ইহার ফলে বুদ্ধিমান ছাত্র নিরুৎসাহ হয়। উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে ছেলেটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির স্ফুরণ ও বিকাশ ব্যাহত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাবানেরা এইসব প্রতিকূলতার জন্যই সাধারণ বিদ্যালয় সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হন। তাঁহাদের সমৃদ্ধ ও সদাকৌতূহলী মনের উপযুক্ত খোরাক বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা যোগাইতে পারে না।

কোন কোন বিদ্যালয়ে তাই খুব সেরা ছাত্রদের 'ডবল প্রমোশন' দিয়া দুই ক্লাস উপরে উঠিবার সুযোগ দেওয়া হয়। মনে করা হয়, দুই ক্লাস উপরের কঠিন পড়া তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপযুক্ত স্ফুরণে সহায়ক হইবে। ইহা কতকটা

সত্য হইলেও বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা এই রীতি সমর্থন করেন না, এবং এখন এই প্রথা অধিকাংশ স্থানেই রহিত হইয়াছে। অল্প বয়সের ছেলে হঠাৎ দুই ক্লাস উপরে উঠিয়া অথৈ জলে পড়িতে পারে। হয়তো নীচের ক্লাসে সে সবেমাত্র যোগ-বিয়োগ-পূরণ-ভাগ শিখিয়াছে। দুই ক্লাস উপরে গিয়া সে দেখিল সেখানে ভগ্নাংশের অঙ্ক করানো হইতেছে। খুব ভাল শিক্ষকের সহায়তা না পাইলে তাহার পক্ষে এই ফাঁকটা নির্বিঘ্নে অতিক্রম করা শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায় সহজ নয়। ইহাতে তাহার মনের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, যাহার ফল সব সময় শুভ হয় না। তা ছাড়া দুই ক্লাস উপরের সঙ্গীসাথীরা বয়সে সকলেই তাহার চেয়ে বড়, খেলাধূলায় তাহাদের সঙ্গে সে হয়তো আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে। বড ছেলেরা অনুভূমি ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়াও তাহার উপযুক্ত সঙ্গী নয়। কাঁচা কাঁঠালকে কিলাইয়া দ্রুত পাকাইলে তাহা সুস্বাদু হয় না। মনেরও নিজস্ব পরিণতির একটা স্বাভাবিক ধারা ও ছন্দ আছে, তাহা ভুলিয়া দ্রুত ফল পাইবার আশায় অতিরিক্ত তাড়া দিলে, উল্টা বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই থাকে।

এ সমস্ত ছাত্রদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা খুব সহজ নয়। কোন কোন দেশে এবং আমাদের দেশের ভাল স্কুলে বাছাই করিয়া ভাল ছেলেই নেওয়া হয়। এ ব্যবস্থা ভাল, কারণ এখানে সুস্থ প্রতিযোগিতা দ্বারা ভাল ছেলেরা নিজেদের উন্নতি করিবার সুযোগ ও উৎসাহ পায়, এবং এ সব ছেলেদের বয়সও সকলের প্রায় সমান। এরকমের ভালো ছেলেদের বুদ্ধি অনুযায়ী উচ্চতর মানের লেখাপড়া ও কাজের ব্যবস্থা করা সহজ। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সমস্ত ভালো ছেলের বুদ্ধির উৎকর্ষ একই বিষয়ে নয়। প্রতিভার মধ্যে একাকীত্ব আছে। দল বাঁধিয়া প্রতিভার চর্চা হয় না। তাই এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার যাহাতে এ সব ছেলেরা নিজ নিজ প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ ও স্বাধীনতা পায়। তীক্ষ্ণধী ছাত্রদের বুদ্ধিই শুধু বেশী এমন নয়, ইহাদের প্রাণশক্তিও সাধারণতঃ অন্তদের তুলনায় প্রচুরতর। সুতরাং ইহারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রস পায়, এবং বিভিন্ন প্রকারের আলোচনা, কর্ম, খেলাধূলা, সামাজিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়া ইহারা জীবনের পরিপূর্ণ ও সুসম আত্মবিকাশের পথ খোঁজে। যাহাতে এই প্রচুর ও সমৃদ্ধ প্রাণশক্তির অপচয় না ঘটে, সে জন্য শিক্ষক, পিতামাতা, সমাজ-কল্যাণকামী প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব রহিয়াছে। উপযুক্ত সুযোগ পাইলে এবং শিক্ষক ও সতীর্থদের প্রীতিপূর্ণ

সহযোগিতা পাইলে ইহাদের মধ্য হইতেই দেশের অগ্রগতির সর্বক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতার আবির্ভাব হয়।

তীক্ষ্ণধী ছাত্রদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ইত্যাদি নানা গুণ, তাহাদের অসুবিধা, তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে পরিণতি সম্পর্কে অন্ততঃ তিনটি মূল্যবান্ অনুসন্ধান হইয়াছে--

(১) Terman—Genetic studies of Genius: Mental and Physical traits of a thousand Gifted Children.

(২) Hollingworth – Children above 180 I. Q.

(৩) Garrison—The Psychology of Exceptional Children

টারম্যান্ এক হাজার তীক্ষ্ণধী ছাত্রদের স্কুলের বয়স থেকে সুরু করিয়া তাহাদের যৌবন পর্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী (১৯২১—'৪৬ খৃঃ অঃ) অনুসন্ধান করিয়া কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছান। (১) এ সমস্ত তীক্ষ্ণধী ছাত্ররা গড়ে সাধারণ ছেলেদের তুলনায় দৈহিক দিক দিয়াও উৎকৃষ্ট। তাহাদের বুদ্ধির বিকাশের হারও দ্রুততর। (২) স্কুলের পাঠ্য বিষয়ে তাহারা অন্যান্য ছাত্রদের সহজেই পিছনে ফেলিয়া যায়। ইহাদের অধিকাংশ উচ্চতর শিক্ষার জন্য কলেজে বা য়্যুনিভার্সিটিতে যোগ দেয় এবং সেখানেও তাহাদের মানসিক উৎকর্ষ সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। (৩) সামাজিক গুণের বিকাশও ইহাদের মধ্যে অধিকতর। জীবনের নানা ক্ষেত্রে ইহারা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এসব ছেলেরা সাধারণতঃ তাহাদের চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের সঙ্গেই মিশে। (৪) চরিত্রের দিক দিয়াও তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়। সততা, বিশ্বস্ততা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদি নৈতিক গুণও ইহাদের মধ্যে বেশী। (৫) এ সব ছেলেদের পারিবারিক পটভূমিকা সাধারণতঃ অনুকূল। তাহাদের পিতামাতা তীক্ষ্ণধী না হইলেও তাঁহাদের দুজনেরই, না হয় অন্ততঃ একজনের মধ্যে, স্নেহ, বুদ্ধি, সংকল্প, স্থৈর্য, ঈশ্বরানুরাগ ইত্যাদি নৈতিক ও সামাজিক গুণ সাধারণ অপেক্ষা বেশী দেখা যায়। বহু মনীষী ব্যক্তিই তাঁহাদের মহত্বের জন্য মাতা বা পিতার কাছে ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। (৬) উত্তর জীবনে তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিরা সব সময়ই সফল হন এমন নহে, তবে মোটামুটি তাঁহারা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তবে মানসিক বিকৃতি ইহাদের মধ্যে সাধারণের তুলনায় কম নয়।

হলিংওয়ার্থ বুদ্ধ্যঙ্ক ১৮০ বা তাহারও বেশী এরকম ৩১টি ছেলের জীবন

সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে এরা শিশুকালে অনেক আগে কথা বলিতে শেখে, শব্দ ও বাক্যের উপর দখল ইহাদের বেশী হয়। ইহারা সাধারণের চেয়ে অনেক আগে এবং অনেক বেশী বিমূর্ত চিন্তা (abstract thinking) ও শুদ্ধ প্রতীক (abstract symbols) ব্যবহারে পারদর্শী হয়। কিন্তু ইহারা খুব ভাল মিশুক হয় না। হলিংওয়ার্থের মতে ইহারা অনেক সময়ই তাহাদের সমাজের সঙ্গে নিজেকে ভাল করিয়া মানাইয়া চলিতে পারে না, এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী হয় না। তাঁহার মতে আমাদের পৃথিবীর বর্তমান সামাজিক অবস্থায় যাহাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২৫ থেকে ১৫৫, তাহাদেরই সুস্থ ও সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্ভাবনা আছে। এর চেয়ে যাঁহারা বেশী বুদ্ধিমান্ সংসারে ও সমাজে তাহাদের সুখী হওয়ার সম্ভাবনা কম।

যাঁহারা তীক্ষ্ণধী তাঁহাদের জীবনে বুদ্ধিই প্রবল। ইহার ভাল ও মন্দ দুই-ই আছে। ইঁহারা বুদ্ধিমান্ বলিয়াই সহজে হুজুগে মাতেন না। যে কোন আন্দোলন বা মতবাদকে ইঁহারা স্বচ্ছ বুদ্ধির আলোতে বিশ্লেষণ করিয়া, বিচার করিয়া দেখেন। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফাঁকিটা ইঁহাদের চোখে সহজে ধরা পড়ে। কিন্তু বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় না। শুধু মাত্র মস্তিষ্কের দ্বারা জীবনকে সুপরিচালিত করা যায় না। জীবনে হৃদয়াবেগের মস্ত বড স্থান আছে এবং হৃদয়াবেগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিঞ্চিৎ মোহাচ্ছন্ন। এই মোহের অঞ্জন কিছুটা চোখে না মাখিলে বুঝি জীবনে সুখ বা আনন্দ পরিপূর্ণ হয় না। তাই যাহারা বেশী বোঝে, তাহাদের পক্ষে সুখী হওয়া কঠিন। ইংরেজী প্রবাদ বলে—Where ignorance is bliss, it is folly to be wise. যে হতভাগ্য প্রতিভাধর প্রেয়সীর চোখের প্রেমের আলোটিকে, অধিগোলক, শ্বেতমণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডল, অচ্ছোদপটল, অধিপট, স্নায়ুশিরা, পেশী ইত্যাদির সমবায় মাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহার জীবনে সুখ কোথায়? বাস্তবিক পক্ষে অনেক প্রতিভাবান্ শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের দাম্পত্যজীবন সুখের নয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন জ্ঞান, অনুভূতি, ইচ্ছা এই ত্রিধারার সম্মিলনে আমাদের মন। এই মনের শক্তির একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। ইহার মধ্যে কোন একটি ধারা প্রবল হইলে অন্য দুইটি ধারা ক্ষীণ হইতে বাধ্য। তাই যেখানে বুদ্ধির প্রাধান্য, সেখানে অনুভূতি ও ইচ্ছা দুর্বল। তাই মনীষী ব্যক্তিরা অনেক সময় 'নির্মম' হন। তাঁহারা নিজের চিন্তার জগতে নিমগ্ন হইয়া

থাকেন। হয়তো কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। প্রতিভা নিঃসঙ্গ, একাকী, আত্মকেন্দ্রিক। সাধারণের কাছে মনীষীর চিন্তার জগতের দ্বার নিরুদ্ধ। কবি বলিয়াছেন প্রত্যেক মানুষ অশ্রুর লবণাম্বুবেষ্টিত দ্বীপ। মনীষীদের পক্ষে একথা আরো অনেক বেশী সত্য। তাই মানুষ ইঁহাদের সহজেই ভুল বুঝে, নিন্দা করে। অন্তরঙ্গ বন্ধু ইঁহারা কমই লাভ করিয়া থাকেন।

কিন্তু এই সমস্ত নিঃসঙ্গ মনীষীরা নিজের চিন্তা ও কাজের মধ্যে নিশ্চয়ই নিবিড় আনন্দ পান, যাহার ফলে নিঃসঙ্গতা তাঁহাদের তেমন দুঃখ দেয় না। সৃষ্টির আনন্দে, অজানাকে জানার আনন্দে, প্রকৃতির বহু বিচিত্রতার মধ্যে একটি একতার সূত্র আবিষ্কারের আনন্দে তাঁহারা তন্ময় হইয়া থাকেন। সামাজিক জীবনের আনন্দ বুঝিবা এ অপার্থিব আনন্দের তুলনায় তুচ্ছ। তাঁহাদের নিস্পৃহতার ফলে হয়তো স্বজন, পরিবার দুঃখ পায়, কিন্তু পৃথিবীকে মহৎ কিছু দান করিতে হইলে হয়তো এ বলিদান অনিবার্য। অবশ্য পৃথিবীর সমস্ত মনীষী ব্যক্তিই পরিবার ও প্রিয়জনের দুঃখের কারণ হন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ব্যক্তিগত উচ্চকাঙ্ক্ষা ও পরিবারের দাবী এ দুয়েরই সামঞ্জস্য করিতে পারেন—true to the kindred points of heaven and home. তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রেই স্নেহময়ী স্ত্রীর ক্ষমা ও ধৈর্য ও অনুরক্ত সন্তানদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি থাকে বলিয়াই তাহা সম্ভব হয়।

শুধু মাত্র বুদ্ধির প্রাচুর্যই জীবনকে আকাঙ্ক্ষিত শোভন পরিণতির পথে নিয়া যাইতে পারে না। বুদ্ধির শক্তিকে কল্যাণের পথে চালিত করিতে হইবে। তীক্ষ্নবুদ্ধি-সম্পন্ন নরঘাতক দস্যু, অর্থলুণ্ঠনকারী তস্কর, কোটিপতি অসৎ ব্যবসায়ীর পৃথিবীতে অভাব নাই। তাহাদের প্রতিভা ও শক্তি অসৎপথে নিয়োজিত হইয়া সমাজের ও রাষ্ট্রের অকল্যাণ ডাকিয়া আনে, ব্যক্তিগত সুখও এ পথে মিলে না। তা ছাড়া জীবনের সকল পরিপূর্ণতার মূল হইল, সমস্ত শক্তির সুসম সমন্বয়। গীতার মতে তিনিই প্রাজ্ঞ, যিনি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় করিতে পারিয়াছেন। আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভাষায় আমরা বলিব তিনিই বাস্তবিক প্রতিভাধর, যাঁহার মধ্যে বুদ্ধি, অনুভূতি ও ইচ্ছার সুসমন্বয় ঘটিয়াছে। যাঁহার দৃষ্টি স্বচ্ছ, বুদ্ধি অনাচ্ছন্ন, যাঁহার অনুভূতি নিবিড় ও বহুব্যাপী, যিনি তাঁহার কর্মশক্তি, মার্জিতবুদ্ধি, এবং অনাত্মকেন্দ্রিক সহানুভূতিকে বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায় কল্যাণ আদর্শসাধনে ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই বাস্তবিক সুখী, তাঁহার জীবনই ধন্য।

মনের স্বাস্থ্য

মানুষের কত রকমের বাতিক আছে তার ইয়ত্তা নেই! এক ভদ্রলোক আছেন যিনি পশ্চিমমুখো হয়ে কখনো বসেন না; আর একজনের ধারণা তাঁর হার্টটায় একটা ফুটো আছে, আর একজন সারাদিনই চেঁচাচ্ছেন 'সব যাক'। কোন উচ্চতম শিক্ষিতা এক মহিলা, তাঁর বাতিক কানের নীচে চুণের ফোঁটা দেওয়া,—ওতে নাকি সব ব্যথা বেদনা সারে, হজম ভাল হয়। আবার আর এক মহিলার কোন জিনিস ছোঁয়ার পরই হাত ধোওয়া চাই। কারু আছে সন্দেহ-বাই—বৌ যদি অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা বলেছেন তো সর্বনাশ, কারো কারো আছে বিনা প্রয়োজনে চুরি করা।

'মানুষের' এসব বাতিকের কথা শুনে আমরা হাসি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই আমাদের প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর কোন না কোন 'বাই' আছে। এর মধ্যে কতগুলো আছে নির্দোষ, অথচ অন্যের কাছে কিছুটা কৌতুকপ্রদ বা বিরক্তিকর। যেমন ধরুন, একজন সহৃদয় সুপরিচিত চিকিৎসক আছেন, যিনি কোন একটা বিষয়ে চিন্তা করতে গেলেই চট্‌চট্‌ করে নিজের ডান কানটা মোচড়াতে থাকেন। আবার কতক বাতিক আছে যা গভীর মানসিক বিকৃতি বা রোগের পরিচায়ক,—যেমন পাগল গারদের এক রোগীর ধারণা তার সম্পত্তি লোভে ডাক্তার নার্স সবাই ওর খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দেয়। কতগুলি বাতিকের মূল সম্ভবতঃ জন্মগত,—কতকগুলো অভ্যাসগত।

বাতিক ছাড়াও আরো হাজারো রকম মানসিক বিকার আছে। সবই মনের 'অস্বাভাবিক' অবস্থা বা পরিণতি। সম্পূর্ণ 'স্বভাবিক' কোন মানুষ আছে কিনা সন্দেহ, তবুও মানসিক বিকারের আলোচনার সুরুতেই 'স্বাভাবিক' বা 'মানসিক' সুস্থ' অবস্থা কাকে বলে তার একটা সংজ্ঞা অবশ্যই দরকার।

দেহের স্বাস্থ্যের সঙ্গে তুলনা করে মনের স্বাস্থ্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা যেতে পারে। দেহের কতগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। সেগুলি সবলভাবে, সম্মিলিত ভাবে সমগ্র জীবটির কল্যাণের উদ্দেশে যদি কাজ করে তবেই আমরা বলি প্রাণীটি সুস্থ। যার কোন অঙ্গ অপুষ্ট রয়ে গেল সে তো বিকল। চোখ দিয়ে ভাল যদি দেখতে না পাই, যদি রসক্ষরা গ্রন্থি থেকে ক্ষরণ যথেষ্ট না হয় তা হলে সে দেহ নিশ্চয়ই সুস্থ নয়। কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রত্যেকটি পুষ্ট হয়েও, যদি তারা পরস্পর সহযোগী না হয়, কোন একটা অঙ্গ অন্যের তুলনায় যদি বেশী পুষ্ট বা

সক্রিয় হয়, তা হলে তাও স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। সেখানে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণীর জীবনীশক্তির সুষ্ঠু ও সমন্বিত বিকাশ হতে পারে না। এও অস্বাস্থ্যকর অবস্থা।

শিশুর মনও তেমনি কতগুলি আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, সংস্কার বোধ, ইচ্ছা ইত্যাদির সমষ্টি। শিশু ভালবাসা চায়, সে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করতে চায়, ভাঙতে চায়, গড়তে চায়, বুঝতে চায়। এই বৃত্তি ও সংস্কারগুলির সম্যক বিকাশ ও পুষ্টি প্রয়োজন। যার বুদ্ধি উপযুক্ত বিকশিত হোল না, সে নির্বোধ বলে উপহসিত হবে। আবার বৃত্তি, ইচ্ছা, আবেগ, বুদ্ধির সমন্বয়ও হওয়া চাই। যদি বিভিন্ন আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কঠিন সংঘর্ষ থাকে তবে সে শিশু অস্থিরমতি, বিষণ্ন, অসামাজিক, কলহপরায়ণ, অসন্তুষ্টচিত্ত হতে পারে। সমগ্র ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস বিকাশের কাজে যেখানে শিশুর বৃত্তি, আবেগ বুদ্ধি সহজ সহযোগিতায় মিলিত হয়, সেখানেই বলি সে মানসিক সুস্থ।

অধিকাংশ মানুষই মানসিক অসুস্থ। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এর কারণ অধিকাংশ মানুষের শৈশবে বোধ, বৃত্তি, আবেগ, আকাঙ্ক্ষার সহজ সুসমন্বিত বিকাশ ঘটেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের শৈশব থেকেই তারা সংঘাত ও সংঘর্ষের বীজ অন্তরে বহন করে গড়ে উঠেছে। এর ফলে ব্যক্তিত্ব বিভক্ত, দ্বিধাগ্রস্ত এমন কি বিপর্যস্তও হতে পারে।

তা ছাড়া মানুষ সামাজিক জীব। তার দেহ ও মনের সুষ্ঠু বিকাশ সামাজিক প্রভাবের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। কাজেই সামাজিক আদর্শ, রুচি ও প্রচলিত আচারের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পারলে, সমাজের সঙ্গে তার সংঘাত ঘটতে পারে এবং তার দ্বারাও তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ আহত বা বিকৃত হতে পারে। সুতরাং ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা নিজস্ব প্রবৃত্তি, সংস্কার ইত্যাদির সমন্বয়ের উপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি তা সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যের উপরও নির্ভর করে।

কাজেই হ্যাড্‌ফিল্ড মানসিক স্বাস্থ্যের পূর্ণতর সংজ্ঞা দিয়েছেন "the full and free expression of all our native and acquired potentialities in harmony with one another by being directed towards a common end or aim of the personality as a whole"।[1]

মানুষ শুধুমাত্র অন্ধ সংস্কার বা আবেগচালিত জীব নয়। তার বুদ্ধি, বিবেচনা,

---

1. J. A. Hadfield—Psychology and Mental Health. P. 14

বিচার আছে। কাজেই তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ কতকগুলি আদর্শ ও উদ্দেশ্য-অনুসারী হয়। কিন্তু সব উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের সমগ্র ও সুগম বিকাশের পক্ষে সমান কার্যকরী নয়। যেমন ধরা যাক্, অর্থের আকাঙ্ক্ষা। মানুষের কার্যোদ্যমকে উদ্দীপ্ত করে তুলবার পক্ষে এ উদ্দেশ্য যথেষ্ট কার্যকরী। কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা যদি তার সেবাপরায়ণতা, মানবপ্রীতি ইত্যাদি আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে দেয়,—যদি তা মানুষের মানসিক স্থৈর্য ও শান্তি বিনষ্ট করে তবে এ আদর্শকে মানসিক সুস্থতার সহায়ক বলা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলা যায়, আমাদের বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের বিশৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষাগুলি আমাদের সমগ্র ও সুগম ব্যক্তিত্বকে খণ্ডিত করে, বিকৃত করে। তাই অধিকাংশ মানুষই কমবেশী মানসিক অসুস্থ। মানুষের জন্মগত সবগুলি সংস্কারেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপাদান হিসাবে স্থান আছে। কোন আশঙ্কা বা আবেগই হীন বা নিন্দনীয় নয়। প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে। যখন কোন আকাঙ্ক্ষা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হয়,—যখন তা নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন না করে, যখন তা জীবনের অন্যান্য আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি না করে, সুসম স ব্যক্তিত্ব গঠনের পথে নিয়ে যায় তখনই তার উপযুক্ত মূল্য আছে। বাইবেলের এই উপদেশ" Render unto Caesar what is due to Caesar, শুধু রাজনৈতিক উপদেশ নয়, সমাজ বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের উপদেশও বটে। যে মানুষ আত্মদ্বন্দ্বে লিপ্ত, যে আত্মসর্বস্ব মানুষ বহুজনহিতায় বহুজন সুখায় নিজ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না, তার পক্ষে মানসিক শান্তি আশা করা বৃথা। Tennyson-এর Ulysses জাগ্রত যৌবনের আদর্শ— সে চায় অনলস আগ্রহে নূতনকে জানতে, দুর্গমকে জয় করতে—to strive, to seek, to find and not to yield"। এ আদর্শের মধ্যে একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আছে। কিন্তু তথাপি এ আদর্শ সুসম সুস্থ জীবনের আদর্শ নয়—এ আদর্শ সাময়িক, সামগ্রিক নয়। ভারতবর্ষও যুবশক্তিকে আহ্বান করে বলেছে উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত —কিন্তু সেখানেই শেষ নয়,—তারপর তাই বলা হয়েছে 'প্রাপ্য বারন্ নিবোধত'। মানসিক সুস্থতার এই সত্য আদর্শ। সমগ্র ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু কল্যাণকর বিকাশ।

মানসিক স্বাস্থ্যের এই আদর্শ নঙার্থক নয়। একথা ঠিক নয় যে, যার বাতিক নেই, অস্বস্তি নেই, সেই মানসিক সুস্থ! এই সুস্থতা একটি সদর্থক আদর্শ— সম্পূর্ণ ও সুসমবিকাশের আদর্শ। এ আদর্শ স্থিতিশীল নয়,—গতিশীল ও

জীবন্ত। এ আদর্শ একটা স্থির অবস্থা নয়,—ক্রমপরিপূর্ণতা ও পরিণতি।— "it is not stagnation, but a harmony of movement, living and active."

মানসিক স্বাস্থ্যের বিশুদ্ধ আদর্শ সকলের জন্যে এক হলেও—ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতা আছে বলে এর উপাদান ও পরিণতির প্রক্রিয়া এক নয়। কোন মানুষ অনুভূতিপ্রবণ, স্নেহশীল, কোমল ও সেবাপরায়ণ, আর একজন যুক্তিবাদী, কঠোর কর্তব্যপরায়ণ, কখনো বা উদাসীন। এ দুই জনের জন্যে একই ছাঁচে গড়ে ওঠা মানসিক স্বাস্থ্যের আদর্শ সম্ভব নয়। বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়ে গড়ে উঠলেই তার মানসিক স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকবে। তাকে গরুর মতো ঠাণ্ডা শান্ত করে গড়তে গেলেই যত গোল বাধবে। এই কথাটা শিক্ষক ও পিতামাতা অনেক সময় ভুলে যান। তাঁরা চান তাঁদের সন্তান বা ছাত্রদের নিজস্ব একটি কাল্পনিক আদর্শে গড়ে তুলতে। সব মানুষকে একই ছাঁচে গড়ে তোলা মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।

মানসিক স্বাস্থ্য যেমন মানুষের পক্ষে একটা আদর্শ, তেমনি আরো অন্য আদর্শও মানুষের আছে। সে সব আদর্শ মানসিক স্বাস্থ্যের আদর্শের বিরোধী নয়, কিন্তু তারা সমার্থকও নয়।

যেমন, ধরা যাক্ জৈবিক সুস্থতার আদর্শ। ডাক্তার বলবেন, সৈন্য বিভাগের প্রধান বলবেন, শিল্পপতি বলবেন মানুষের আদর্শ হবে তার দৈহিক ও অন্যান্য জৈবশক্তির সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু বিকাশ। তার পেশী, রক্তচলাচল, স্নায়ু সবল ও স্বচ্ছন্দ ক্রিয়াশীল হলেই মানুষ সুস্থ। সবল, সতেজ, দৈহিক কর্মে নিপুণ মানুষই সুস্থ মানুষের আদর্শ। এ আদর্শ মানসিক সুস্থতার আদর্শের পরিপন্থী নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ একও নয়। ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ ও সুসম বিকাশের জন্যে জৈবিক শক্তিসমূহের সবলতা ও সামঞ্জস্য অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু জৈবিক অর্থে সুস্থ ও নিপুণ যে মানুষ, সে অসুখী, পাপবোধ দ্বারা জর্জরিত, পরপীড়ক অথবা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে পারে,—অনেক সময়ে হয়েও থাকে। কাজেই মানসিক সুস্থতার জন্যে জৈবিক সুস্থতা প্রয়োজন কিন্তু জৈবিক সুস্থতাই মানসিক সুস্থতা নয়।

আবার আর এক আদর্শ হচ্ছে, সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি। মানুষ সমাজের মধ্যেই জন্মে,—সমাজেই বর্ধিত হয়। তার ভাষা, তার আচরণ, তার ন্যায় অন্যায়ের আদর্শ সমাজ থেকে সে গ্রহণ করে। কাজেই বুদ্ধিমান্ মানুষ সমাজের

মতামতকে উপেক্ষা করতে পারে না। আমাদের সুখের একটি শ্রেষ্ঠ উৎস সমাজের প্রশংসা, আমাদের দুঃখের একটি প্রধান হেতু সমাজের নিন্দা। যেখানে সমাজের সঙ্গে পদে পদে বিরোধ ঘটে, সেখানে ব্যক্তির শান্তি নষ্ট হয়, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত অনেক সময় পরিবর্তনীয়। কে না জানে কোনো ফ্যাসানের আয়ু দুমাসের বেশী নয়? কিন্তু মানসিক সুস্থতার আদর্শ পরিবর্তনীয় নয়,—তা সমাজের অস্থিরতাকে অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করে না। মানুষ সমাজের ক্রীতদাস নয়। তাই মানসিক সুস্থ মানুষ তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশকল্পে সমাজকে বাধা দেয়, তাকে আঘাতও করে। একথা অবশ্যই সত্য যে, যারা মানসিক অসুস্থ যেমন নিউর‍্যাটিক্ বা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বা উন্মাদ ও অপরাধপ্রবণদের মধ্যে অনেকেই সমাজের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, তারা অসামাজিক, কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজের শত্রু। কিন্তু যারা সমাজকে মেনে চলে, যারা বেশ মিশুক ও সমাজের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে তারা সবাই সুখী নয়—মানসিক সুস্থ নয়, তাদের স্থির ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। আবার এটাও অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতো যে সমাজের ভয়ে তীব্র ব্যক্তিগত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ও মতামতের স্বাধীন ও স্বাভাবিক প্রকাশকে বাধা দেওয়ার ফলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিউরোসিস্, হিস্টিরিয়া ইত্যাদি মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়। কাজেই মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক সঙ্গতি ঠিক এক জিনিস নয়।

আর একটি আদর্শ, মানুষের প্রাচীন আদর্শ—নৈতিকতার আদর্শ, ভালো-মন্দর বিচার। এ আদর্শ বলে, সৎ মানুষ, সাধু মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষের এর চেয়ে বড় আদর্শ নেই। মানসিক সুস্থতার জন্যে মহান্ আদর্শ ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাস অপরিহার্য। যাঁরা মানসিক সুস্থ, তাঁরা নীতিবান্‌ও বটেন। কিন্তু নৈতিকতার আদর্শ বলতে অনেক সময় বাইরের আচরণের শুদ্ধতার কথাই ভাবা হয়। অর্থাৎ যাঁর আচরণ নিন্দনীয় নয়, তিনিই নীতিবান্। তাহ'লে বাইরের আচরণে নীতিবান্ হয়েও, কোন মানুষ মানসিক সুস্থ না হতে পারেন। এমনও হতে পারে অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, কামনা এই বাইরের নীতি পালনের কাছে নিজেকে বলি দিয়ে, অবদমিত ইচ্ছার একটি জট্ মনের মধ্যে পাকিয়ে তুলেছে। তাই নৈতিক আচরণই সব সময় মানসিক সুস্থতার মাপকাঠি নয়।

মানসিক অসুস্থতার মূল কারণ অনেক সময় জন্মগত। সে সব ক্ষেত্রে এর নিবারণ বা নিরাময়ের উপায় সহজ নয়।

কিন্তু যেখানে এর মূল জন্মগত নয়, সেখানে এর নিবারণ বা চিকিৎসা অসাধ্য নয়। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের (Mental Hygiene) এ দায়িত্ব। এ বিজ্ঞান খুব প্রাচীন নয়, কিন্তু ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক ধারা অনুসরণ করে নিবারণ ও চিকিৎসা এই দুই ক্ষেত্রেই এ বিজ্ঞান যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে।

বিজ্ঞানীদের মতে মানসিক রোগ বা বিকৃতি শিশুকালের কোন দুঃখকর, অপ্রীতিকর, ভীতিকর বা বীভৎস অভিজ্ঞতা থেকেই সুরু হয়। এ অভিজ্ঞতা আকস্মিক, অত্যন্ত তীব্র অথবা দীর্ঘদিন স্থায়ী হলে শিশুর মনের সহজ স্বাভাবিক বিকাশ ব্যহত বা বিকৃত হয়। এতেই ভবিষ্যৎ জীবনের নিউরোসিস্, হিষ্টিরিয়া, অপরাধ-প্রবণতার বীজ সৃষ্টি হয়। বড় হয়ে কোন একটা উত্তেজক ঘটনা এই সুপ্ত বিকৃতির বীজকে ফুটিয়ে তোলে। তাই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীর পক্ষে শিশুর জীবনের বিকাশের ধারাটা জানা একান্ত দরকার। কোন্ কোন্ অভিজ্ঞতা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে হানিকর তা জানলেই নিবারণ বা চিকিৎসা হতে পারে। তাই বর্তমানে মনোবিজ্ঞান এবং শিশুর বিকাশের ধারা নির্ণয় ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বলাভ করছে। অবশ্য মানুষের নিজের মধ্যেই প্রতিকূল অভিজ্ঞতা সহ্য করবার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু এ ক্ষমতার একটা সীমা আছে, আর প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই এ সীমাটা বিভিন্ন। তা ছাড়া একজন শিশুর পক্ষে যে অভিজ্ঞতা বিষম হানিকর, অন্যের কাছে তা নয়। এ বিষয়ে শিশুতে শিশুতে জন্মগত পার্থক্য আছে। সে কথা বিজ্ঞানীকে মনে রাখতে হবে। তবে একথা সাধারণভাবে বলা যায়, যে কতগুলি অভিজ্ঞতা সব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষেই বিঘ্নকর। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। সাধারণভাবে কিছু আলোচনা কচ্ছি।

প্রত্যেক শিশুরই মানসিক সুস্থতার জন্যে প্রথম প্রয়োজন অকৃত্রিম ভালোবাসা ও নিরাপত্তা বোধ। সাধারণতঃ শিশুরা মাতা ও পিতার নিকট হইতে জীবনের এই মৌলিক প্রয়োজন সুস্থ ও সহজভাবেই মেটাতে পারে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন যেখানে পিতা ও মাতার মধ্যে স্বাভাবিক প্রীতির সম্বন্ধ বর্তমান নেই, যেখানে শিশুকালেই পিতা বা মাতা মারা যান, অথবা শিশুর বাল্যকালে পিতামাতার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে অথবা যেখানে মাতার কাছে শিশুর জন্ম অবাঞ্ছিত ইত্যাদি) শিশু নিজেকে স্নেহবঞ্চিত বোধ করে এবং তার নিরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত হয়। শিশুর মনের এ বিক্ষোভ দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'লে. অথবা এ বিক্ষোভের পরিপোষক কোন তীব্র অপ্রীতিকর

অভিজ্ঞতা ঘটলে এবং এর সুস্থ স্বাভাবিক প্রকাশের পথ রুদ্ধ হলে শিশুর অচেতন মনে জটিলতার (complex) সৃষ্টি হয়। অচেতন মনের এই জটিল গ্রন্থি তার সুস্থ সমগ্র মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন (dissociation) হয়ে নিজস্ব একটি জগৎ সৃষ্টি করে এবং তাতে তার ব্যক্তিত্বের সুস্থ ও সম্পূর্ণ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। একবার এ রকম জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি হয়ে বিচ্ছিন্নতা ঘটে গেলে তার প্রতিকার সহজ নয়। তখন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেও শৈশবের ক্ষতির পূরণ করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়। এ জটিলতাগুলি অচেতন মনের অবস্থা। তাই যার মনে এই জটিলতার সৃষ্টি হোল সেও তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকে না, বাইরের সাধারণ পর্যবেক্ষণেও তাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। কাজেই তাদের চিকিৎসা খুবই কঠিন। এই অবচেতন গ্রন্থি শিশু বড় হলে তার সামাজিক ব্যবহারকে কখনো কখনো অদ্ভুতভাবে বিকৃত করে। এ অন্যায় আচরণ যে করে সে নিজেও জানে না, কেন সে এ আচরণ করলো। তার অচেতন মনের বিচ্ছিন্ন গ্রন্থি আপন কুটিল নিয়মানুযায়ী ব্যক্তিকে অসামাজিক আচরণে যেন বাধ্য করে। তাই দেখা যায় এমন কাজ করে ব্যক্তি বিব্রত ও অনুতপ্ত হচ্ছে, অথচ নিজেকে কিছুতেই সংশোধন করতে পাচ্ছে না। একটি উদাহরণ দিলে কথাটা হয়তো স্পষ্ট হবে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ছেলে বোর্ডিং-এ থাকে। পড়াশুনায় সে ভাল, মেধাবী, বুদ্ধিমান। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তার বেশ সদ্ভাবও আছে। কিন্তু প্রায়ই বোর্ডিং-এর ছেলেদের নানা ছোটখাটো সামান্য মূল্যের জিনিস চুরি যেতে লাগলো। একদিন দৈবাৎ এ ছেলেটির বাক্স খুলে সব জিনিস পাওয়া গেল—সস্তা রঙীন পেন্সিল, খাতা, লাট্টু ঘুড়ির সুতা, লাল ফিতে ইত্যাদি। এগুলির চেয়ে ভালো জিনিস, তার নিজেরও অনেক ছিল। কেন যে চুরি করেছে তা সেজেও জানে না। নিজের অপরাধ ঢাকবার সে কোন চেষ্টা করল না। ধরা পড়ে সে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হোল। এর পর তার বাবা তাকে অন্য এক বোর্ডিং-এ ভর্তি করে দিলেন। সেখানে সে আদর্শ ছাত্র হিসাবে সকলের স্নেহ ও প্রীতি আকর্ষণ করল। কিন্তু কিছুদিন বাদে এখানেও সে চুরি করে ধরা পড়ল। এবার তার বাবা তার চিকিৎসার জন্যে মনঃসমীক্ষণে পারদর্শী ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন। তিনি ধৈর্যসহকারে ছেলেটির শিশুকাল সম্পর্কে বহু প্রশ্ন করে জানলেন শিশুর যখন দুই বৎসর বয়স তখন ওর মা অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পালিয়ে যান। তার পিতা আবার বিবাহ করেন। তার সৎমা তার প্রতি অযত্ন না করলেও তাঁর কাছে সে

তৃপ্তিকর সম্পূর্ণ ভালবাসা পায়নি। বিশেষ করে, তার নতুন মায়ের একটি ছেলে হওয়ার পরে তার দিকেই মা বেশী দৃষ্টি দিতেন এবং নতুন শিশুর জন্যে কত খেলনা ইত্যাদি দেওয়া হত, যা ওকে দেওয়া হোত না। এতে ওর মনে হিংসা হোত। যদিও এ হিংসা বা রাগ দেখাবার উপায় ছিল না। ডাক্তার সিদ্ধান্ত করলেন এই অবদমিত হিংসা ও পিতামাতার উপর নিরুদ্ধ আক্রোশই পরবর্তী জীবনে তাকে অহেতুক চুরি (Kleptomania) করতে প্রবৃত্ত করছে। সহানুভূতিশীল বিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী চিকিৎসায় শিশুটির এ রোগ সেরে গিয়েছিল।[২]

বাড়ন্ত শিশুর জীবনের আর একটি প্রধান প্রয়োজন কিছুটা পরিমাণ স্বাধীনতা। ইহা দ্বারা তাহার ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশ ঘটে। যেখানে শিশুকে সর্বদা আড়াল করে রাখা হয় সেখানে সে পরনির্ভর ও দুর্বলচিত্ত হয়ে গড়ে ওঠে। আর তার স্বাধীন ইচ্ছাকে পদে পদে বাধা দিলে সে বিদ্রোহী, অবাধ্য ও তিক্তস্বভাব হয় এবং নিজ স্বাধীনতা প্রমাণ করার জন্যে এবং পিতা মাতার অতি স্নেহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে অন্যায় অসামাজিক আচরণে প্রবৃত্ত হয়।

দেহের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে আজকাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করা হয়। তেমনি মনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

মনের স্বাস্থ্যরক্ষা যে দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয় একথা ক্রমশঃই পাশ্চাত্য সভ্য দেশগুলি বুঝতে পাচ্ছে। আর এ ব্যাপারেও যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করলেই উপযুক্ত সুফল পাওয়া যাবে এ কথাও স্বীকৃত। তাই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Mental Hygiene) ক্রমশঃই অধিকতর গুরুত্ব লাভ কচ্ছে। এ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ববিকাশের ধারা সম্বন্ধে পূর্ণতর জ্ঞানলাভ, মানসিক বিকৃতির কারণ অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করে মনের এ বিকার নিবারণ এবং তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা। পূর্বেই বলা হয়েছে শিশুকালেই এই বিকৃতি নিবারণ বা তার চিকিৎসা সহজ। এ বিকৃতি অবচেতন মনে গভীর মূল বিস্তার করলে রোগ তখন দুশ্চিকিৎস্য হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে এ বিজ্ঞানের চর্চা সামান্যই হয়েছে। কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যে এ বিষয়ে অবহিত হওয়া আশু কর্তব্য।

২ M. Merill—Problems of Child Delinquency.

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান

পৃথক একটি শাস্ত্র হিসাবে মনঃস্বাস্থ্যবিজ্ঞানের স্বীকৃতি খুব বেশী দিনের কথা নয়।

বহুপূর্বে মানুষ উন্মাদ রোগকে রহস্যময় বলিয়াই মনে করিত। গুরু অপরাধের ইহা দৈবী শাস্তি, অথবা ইহা কঠিন অভিশাপ বা অভিচার ক্রিয়ার অ-প্রাকৃতিক ফল, মানুষের এইরূপ ধারণা ছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে চিকিৎসকেরা ইহাকে মস্তিষ্কের কঠিন ব্যাধি বলিয়াই চিকিৎসা করিতেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক হইতে চিকিৎসকরা ইহা বুঝিতে পারেন যে এ জাতীয় ব্যাধির পিছনে মানসিক কারণ বর্তমান থাকে। ফ্রয়েড এর পর হইতে মানসিকব্যাধি সম্বন্ধে চিকিৎসক ও জনসাধারণের আগ্রহ বাড়িতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এই আগ্রহ বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। কিছু দিন পূর্ব হইতে আমেরিকায় মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে হাসপাতালে মানসিক রোগের চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছিল। এ সময় হইতে ইহা বুঝা যায় যে সুস্থ মানুষের ও সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া (human adjustments) চলিবার প্রয়োজনে এবং চেষ্টায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা সুরু হয়।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ক্লিফোর্ড বীয়ার্স নামে ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের চব্বিশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক তাহার বাড়ীর পাঁচতলার জানালা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যার নিষ্ফল চেষ্টা করে। তাহার বিচারকালে তাহার মানসিক বিকারের স্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে বিচারক মানসিক রোগের হাসপাতালে পাঠান। উন্মাদদের জন্য এই জাতীয় বিভিন্ন চিকিৎসালয়ে সে তিন বৎসর ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে নিরাময় হইয়া ওঠে। সমাজের মধ্যে এবং হাসপাতাল-গুলিতে মানসিকরোগগ্রস্তদের প্রতি যে বিরূপতা ও নির্মমতা সে লক্ষ্য করিয়াছিল, কেন সে নিজেকে সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছিল না, —তাহার সমস্যা কি ছিল, কি মানসিক ক্লেশ তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল, কি করিয়া নিজের চেষ্টায় সে মানসিক সমতা ফিরিয়া পাইয়াছিল, এ সমস্ত বর্ণনা করিয়া বীয়ার্স একখানা বই লেখেন—"A Mind that found Itself." ১৯০৮ সালে বইখানি প্রকাশিত হয়।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বইখানি বেশ জনপ্রিয় হয়। চিকিৎসক ও সমাজ-সেবীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সমস্ত আমেরিকাব্যাপী মানসিক রোগীদের সুচিকিৎসা ও এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দাবীতে একটি আন্দোলন আরম্ভ হয়। বীয়ার্স নিজে এবং একজন প্রসিদ্ধ মনোবিকার চিকিৎসক (Psychiatrist) এ্যাডলফ্ মেয়ার এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মেয়ারই এই নূতন বিজ্ঞানের নাম দেন মেণ্টাল্ হাইজীন্। ১৯০৮ সালেই ইয়েলে প্রথম 'ষ্টেট কমিটি ফর মেণ্টাল্ হাইজীন' এবং পরের বৎসর ১৯০৯ সালে সমস্ত আমেরিকার জন্য কেন্দ্রীয় 'ন্যাশন্যাল্ কমিটি ফর মেণ্টাল্ হাইজীন' স্থাপিত হয়। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ আন্দোলন দেশের অন্যত্রও ছড়াইয়া পড়ে এবং শীঘ্রই আরো অনেক ষ্টেট কমিটি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্বেচ্ছামূলক বেসরকারী চেষ্টায় গঠিত। মানসিক রোগের চিকিৎসক এবং এ বিষয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা ইহার সভ্য। এ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল সাধারণ শিক্ষিত মানুষও ইহার সভ্য হইতে পারেন। আমেরিকার বাহিরে অন্যান্য দেশেও পৃথক একটি বিজ্ঞান হিসাবে মেণ্টাল্ হাইজীনের চর্চা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

স্বভাবতঃই প্রথম দিকে মানসিক রোগের হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য করাই এ কমিটিগুলির প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু ক্রমশঃই এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও গবেষণা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে এবং বিগত অর্ধশতাব্দীব্যাপী এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ফলে যে সব তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি, চিকিৎসা, শিক্ষা, সমাজসেবা ইত্যাদি জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছে। আজ এই বিজ্ঞান অন্যান্য বহু সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান হইতে সমর্থক নানা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সমাজের পক্ষে এই বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে; এবং আমেরিকার বহু উচ্চবিদ্যালয়ে দৈহিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান যেমন অবশ্যপাঠ্য বিষয়, মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানও তেমনি অবশ্যপাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। মেণ্টাল্ হাইজীন আন্দোলনের আর একটি প্রত্যক্ষ ফল ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের নানা সমস্যা সম্বন্ধে যাহাতে তাহারা সদুপদেশ পাইতে পারে সে জন্য 'চাইল্ড্ গাইডেন্স ক্লিনিক্' স্থাপন। শিক্ষকেরা ইহা বুঝিতেছেন যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান ব্যাপারে বুদ্ধি, উৎকৃষ্ট পুস্তক, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, সুষ্ঠু শিক্ষাপদ্ধতিই সব নয়—আর একটি বিষয়ও বিবেচ্য; তাহা হইতেছে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক সুস্থ ও শান্ত অবস্থা। ছাত্রের মনটি বিরুদ্ধ ও বিপরীত

শক্তিদ্বারা আন্দোলিত ও অস্থির হইলে, সহজ বিষয়ও তাহার বোধগম্য হয় না। আবার তাহার মনটি শান্ত ও কৌতূহলী হইলে, অত্যন্ত কঠিন বিষয়ও তাহাকে বুঝান সহজ হয়—"Bugbears of arithmetic fundamentals which have for many years remained formidable against the assaults of every weapon in the essentialist arsenal shrink to insignificance when the pupil is relaxed, instead of tense, adjusted rather than in a state of conflict"।[১] অর্থাৎ পাটীগণিতের একেবারে গোড়ার কথাগুলিও কোন কোন ছাত্রের মনে ভূতের মত আতঙ্ক সৃষ্টি করে। দেখা গিয়াছে এইরূপ আতঙ্ক যাহা মনোবিজ্ঞানীদের দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টাতেও দূর হয় নাই তাহাও ছাত্রদের মন প্রক্ষোভ ও উত্তেজনা মুক্ত হইয়া ধীর ও শান্ত হইবামাত্র অন্তর্ধান করে। শিক্ষক ক্রমশঃ একথা বুঝিতেছেন যে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সমাজজীবনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনের সামঞ্জস্য বিধান। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কর্তব্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি দ্বারা শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের সাহায্য করা।

চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এই বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি অধিকতর নিপুণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও নূতন নূতন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারে সহায়ক হইয়াছে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য

ব্যক্তিগত মনের সমতাবিধান ও সমাজ জীবনের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা মানব কল্যাণই এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই বিজ্ঞান তিনটি প্রধান লক্ষ্য অনুসরণ করে:—

(১) দেহ মনের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের সহিত জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয়, এবং সে জ্ঞানের সাহায্যে মানসিক বিকৃতি নিরোধ।

(২) ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য ও সমতা রক্ষা।

(৩) মানসিক রোগ নিরাময়কল্পে উৎকৃষ্টতর ঔষধ বা প্রক্রিয়া আবিষ্কার ও মানসিক রোগ ও অস্বাস্থ্য চিকিৎসায় তাহাদের ব্যবহার।

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের সূত্রানুযায়ী বহু ক্ষেত্রে ইহা দেখা যাইতেছে যে মানসিক বিকারের মূল কারণ অস্থির মানসিক সংঘাত ও আবেগ, এবং অনুভূতির

---

১ Harold Benjamin—Editor's Introduction to Mental Hygiene (1st ed.) by Crow and Crow.

ক্ষেত্রে বিশৃংখলা। সুতরাং এই বিজ্ঞান এই দিকে বিশেষ মনোযোগী এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা নূতন পথের সন্ধানে রত আছে। ইহা মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের রোগ চিকিৎসার দিক (Mental Hygiene, as cure)। এই বিজ্ঞানের আর একটি দিক হইল প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ (Mental Hygiene as Prevention and Preservation)। এ বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা আমরা জানিতে পারি, কি করিয়া ব্যক্তির মনে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাসসৃষ্টি করিতে হয়, কি করিয়া জীবনের বিভিন্ন প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হইতে ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে হয়, কি করিয়া অনাবশ্যক অবাঞ্ছনীয় সংঘাত দূর করিতে হয়, প্রতিকূল অবস্থায় মনের সমতা রক্ষা করিতে হয় এবং সর্বোপরি আত্মবিরোধ ও সমাজের সহিত অসামঞ্জস্য দূর করিয়া মানসিক শান্তি ও সুখ অর্জন করিতে হয়। আত্মসংযম, উগ্র বাসনা-কামনা-আবেগ নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন মানুষের জীবনে সুখশান্তি অসম্ভব,—এই সুপ্রাচীন কথাটিই আধুনিক মনঃস্বাস্থ্য-বিজ্ঞান নূতন করিয়া স্বীকার করিতেছে ও প্রচার করিতেছে।[২]

মনঃস্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কয়েকটি সংজ্ঞা

ডি বি ক্লীন্ এর মতে মনঃস্বাস্থ্য-বিজ্ঞান জীবনের নানা অপ্রিয় অবস্থা বা দুঃখ (trouble) কি ভাবে দূরে রাখিতে হয়, অথবা বুদ্ধিমানের মত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের জয় করিতে হয়, তাহা মানুষকে শিক্ষা দিয়া তাহাদের সাহায্য করে। দুঃখ বলিতে মানুষ প্রচলিত অর্থে যাহাকে দুঃখ বলে তাহাই ধরা হয়, এবং তাহাদের একটি মোটামুটি তালিকা হইতেছে,—রোগ, ধর্ম বিষয়ে অবিশ্বাস, আর্থিক ক্ষতি, বিবাহিত জীবনে অতৃপ্তি, সামাজিক সমস্যা, জীবিকার অনিশ্চয়তা, দুর্ঘটনা, বার্ধক্য, অগ্নিভয, উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব ইত্যাদি।[৩]

রোজানফ্ বলিতেছেন—"মানসস্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলিতে মনের সজীবতা, স্বাস্থ্য ও সক্রিয়তা রক্ষার সহায়ক বিদ্যা ও প্রক্রিয়া যে বিজ্ঞানে আলোচিত হয় তাহা বোঝায়। ইহার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য :—(১) সুপ্রজনন এবং অন্যান্য উপায়ে সমস্ত ব্যক্তি যাহাতে উপযুক্ত বুদ্ধি, অনুভূত ও অন্যান্য স্বভাবসিদ্ধ সদ্‌গুণের অধিকারী হইতে পারে সে বিষয়ে চেষ্টিত হওয়া, (২) মানুষের স্বভাব ও জন্মগত বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ইত্যাদির উপযুক্ত, আনন্দপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক ব্যবহার

২ Crow and Crow—Mental Hygiene (2nd ed.) P. 4.

৩ Klein D. B.—Mental Hygiene, P. 4.

দ্বারা যাহাতে দেহে, মনে, শিক্ষায়, সমাজজীবনে, বিবাহিত জীবনে সে সুসামঞ্জস্য ও আনন্দলাভ করে, এবং (৩) তাহার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি যাহাতে বিকাশলাভ করতে পারে সে বিষয়ে পথনির্দেশ, এবং সর্বশেষ মানসিক বিকৃতি ও ব্যাধির নিবারণ।"[৪]

ওয়লিন্ বলিতেছেন—"মনঃস্বাস্থ্যবিজ্ঞান—মনোবিজ্ঞান, শিশুবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে মনের স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে সূত্র ও প্রক্রিয়া আহরণ করে। এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইতেছে,—(১) ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ও তাহার উন্নতি, (২) শিক্ষা, সমাজ অথবা ব্যক্তির মানস ক্ষেত্রের ত্রুটি হইতে উদ্ভূত নানা বিরোধ দূর করিবার উপায় নির্দেশ এবং সামান্য বা গুরুতর মানসিক ব্যাধির প্রতিকার বা চিকিৎসা।"[৫]

ফ্রয়েড প্রসঙ্গ—ব্যক্তি মানসের কলকব্জা

আমরা আলোচনা করেছি ব্যক্তিমানসের তিনটি স্তরের কথা—ঈদ্, ঈগো ও সুপার-ঈগোর কথা। এবার আলোচনা করা দরকার এদের পরস্পরের সম্বন্ধ, এরা কি ভাবে কাজ করে, কিভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং পরিবেশের সঙ্গেই বা এদের সম্বন্ধ কি। একথা বুঝতে গেলে মানস বা চিদ্‌শক্তি (Psychic Energy), জন্মগত সংস্কার (Instinct) এবং ঈদ্, ঈগো ও সুপার ঈগোর মধ্যে শক্তির বণ্টন একটু বোঝা দরকার।

১। চিদ্‌শক্তি (Psychic Energy) :—ফ্রয়েড খাটি বৈজ্ঞানিক। প্রাণ বা মনকে তিনি কোন রহস্যময় বস্তু বা শক্তি বলে মনে করেন না। তিনি বস্তুবাদীদের শক্তির অবিনাশিত্ব তত্ত্বে (Doctrine of conservation of energy) বিশ্বাসী। তিনি এ কথা মানেন, যে শক্তির স্থান বা রূপ পরিবর্তন

---

৪ Rosanoff A. J.—Manual of Psychiatry and Mental Hygiene P. 749.

৫ Wallin J. E. Wallace—Personality, Maladjustments and Mental Hygiene P. 32.

হতে পারে। কিন্তু শক্তি অবিনশ্বর, এক ও অখণ্ড। শক্তি সতত‍ই স্থান পরিবর্তন কচ্ছে, বা রূপপরিবর্তন কচ্ছে। এক শক্তি অন্য শক্তিতে পরিবর্তিত হচ্ছে; এরই নাম কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ। এক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় কোন নূতন শক্তি সৃষ্টি হয় না, কোন শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্তও হয় না। কিন্তু জড়বাদীরা বলেন, এ তত্ত্ব শুধু জড় জগতেই ক্রিয়া করে, যথা উত্তাপ-শক্তি বৈদ্যুৎশক্তিতে পরিবর্তিত হয়, আবার বৈদ্যুৎশক্তি আলোতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ফ্রয়েড বলেন এ তত্ত্বের ক্রিয়া ব্যাকপতর। জড়শক্তি মানস শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, মানসশক্তিও জড়বস্তুর পরিবর্তন ঘটায়। আমার ইচ্ছা, মানসশক্তি,—তা সঞ্চালন করে বাহুর পেশীসমূহকে, যা হচ্ছে অ-চিৎশক্তির সমষ্টি। আবার ইথর তরঙ্গের উত্থান পতন সৃষ্টি করে আমাদের বর্ণবোধ। ডেকার্টের মত দার্শনিক বলবেন, বস্তু ও মন, জড় ও চেতন, সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাদের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যুক্তিবিরুদ্ধ, কিন্তু ভগবান এ অসম্ভবকে সম্ভব করেন। ফ্রয়েড জড় ও চেতনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যা প্রত্যক্ষ সত্য, তাকে মেনে নিচ্ছেন, কিন্তু তার দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্যে তিনি ভগবান, আত্মা ইত্যাদি টেনে আনেন নি।

২। আদিম সংস্কার বা ইন্‌ষ্টিংকট—ব্যক্তির সমস্ত ক্রিয়ার মূল শক্তি হচ্ছে ইন্‌ষ্টিংকট (Instinct)। এ শক্তি জন্মগত ও আদিম। ব্যক্তির সমস্ত চেতন মানসক্রিয়ার গতি নির্ধারিত হয়, এই সংস্কার দ্বারা। যেমন, ক্ষুধা প্রাণীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, স্মৃতি চিন্তা ইত্যাদি সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকে খাদ্যপ্রাপ্তির পথাভিমুখী করে; নদী যেমন জলস্রোতকে একটা বিশেষ পথে নিয়ে যায়, তেমনি ইন্‌ষ্টিংকটও মানুষের প্রাণ শক্তিকে একটি বিশেষ গতি দান করে।

প্রত্যেক ইন্‌ষ্টিংকটেরই একটি মূল আছে, উদ্দেশ্য আছে, বস্তু আছে এবং আবেগ (impetus) আছে। ইন্‌ষ্টিংকট রূপ আদিম শক্তির মূলে আছে, দেহের কতকগুলি আবেগ বা আকাঙ্ক্ষা। এ আবেগ বা আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে দেহের কোন অঙ্গ বা টিসুর ভেতরে সঞ্চিত একটি উত্তেজক শক্তির ক্ষরণ বা বহিঃপ্রকাশের পথ। যথা, ক্ষুধা হচ্ছে দেহের অভ্যন্তরে একটা অস্বস্তি,—যা খাদ্যান্বেষণ কার্য্যে শক্তি সঞ্চার করে এবং যা পরিতৃপ্তির দ্বারা শান্ত হয়। এই অস্বস্তি বা আবেগই প্রাণীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, স্মৃতি ও চিন্তাকে খাদ্যরূপ বস্তুর অভিমুখী করে। ক্ষুধিত হলে প্রাণী খাদ্যের অন্বেষণ করে, অতীতে কোথায় খাদ্য মিলেছিল তা স্মরণ করে, খাদ্যের কল্পনা করে, খাদ্য কি করে পাওয়া যাবে, তা চিন্তা করে, তা আহরণের উপায় মনে মনে বিচার করে। কাজেই ম্যাক্‌ডুগ্যালের মত ফ্রয়েডের

মতেও সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াই উদ্ভূত হয়েছে আদিম শক্তি ইন্‌ষ্টিংকট থেকে। এবং ম্যাক্‌ডুগ্যালের মতই তিনি মনে করেন ইন্‌ষ্টিংকট ও আবেগ একটি অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে যুক্ত।

সমস্ত ইন্‌ষ্টিংকটএরই উদ্দেশ্য হচ্ছে দৈহিক কোন প্রয়োজনের তৃপ্তি। ক্ষুধার পরিসমাপ্তি হচ্ছে খাদ্যগ্রহণে। খাদ্যপ্রাপ্তি হয়ে গেলে ক্ষুধারূপ ইন্‌ষ্টিংকট শান্ত হয়, তার তাড়না বিলুপ্ত হয়। কাজেই এক হিসাবে বলা যেতে পারে ইন্‌ষ্টিংকটের শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্‌ষ্টিংকটএর মূল আবেগ বা অস্বস্তির অপসারণ। সে হিসাবে বলা যায় ইন্‌ষ্টিংকটই ইন্‌ষ্টিংকট এর শত্রু।

ইন্‌ষ্টিংকটের প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে কতগুলো গৌণ উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়। যথা ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে গেলে খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়, খাদ্য মুখে পুরতে হয়। ইন্‌ষ্টিংকটের প্রধান উদ্দেশ্যকে তাই আন্তরিক (internal), ও গৌণ উদ্দেশ্যকে বাহ্য (external), বলা যায়।

ঈদ্, ঈগো ও সুপার ঈগোর শক্তি বিনিময় ও পরস্পর সক্রিয় সম্বন্ধেই ব্যক্তির পরিচয়। সমগ্র ব্যক্তিত্ব হচ্ছে একটি জটিল শক্তিসমন্বয়। বহু শক্তি এখানে সহযোগিতা ও বিরোধিতার সূত্রে একটি কেন্দ্রে বিধৃত। ব্যক্তিত্ব যে শক্তির দ্বারা ক্রিয়া করে, তাকে বলা হয় চিদ্‌শক্তি। কিন্তু এই শক্তির মূল কোথায়? দেহের প্রাণ শক্তিই এর মূল,-এরই ক্রিয়া নানা সংস্কারের মধ্যে। কি করে প্রাণশক্তি চেতন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তা আমরা জানি না। ঈদ হচ্ছে চিদ্‌শক্তির আধার। ঈদের এই শক্তিই জীবন ও মৃত্যু সংস্কারের (life and death instinct) চাহিদা মেটায়। আবার তাদাত্ম্য (identification) ক্রিয়া দ্বারা ঈদের মূলাধার থেকে এ শক্তি আহৃত হয়, ঈগো ও সুপার ঈগোকে সক্রিয় করে তুলবার কাজে। ঈদের চিদ্‌শক্তির আধার থেকে ঈগো ও সুপার ঈগো যে শক্তি আহরণ করে, তা দুটি প্রধান কাজে ব্যবহৃত হয়ঃ—শক্তির উন্মোচন দ্বারা অস্বস্তির নিরসন (cathexis) অথবা এর বিপরীত শক্তির ক্রিয়া নিবারণ (anticathexis)।

ইন্‌ষ্টিংকটএর উদ্দেশ্য (aim) হচ্ছে উত্তেজনার পূর্ববর্তী শান্ত অবস্থায় ফিরে যাওয়া। তাই বলা হয় ইন্‌ষ্টিংকট সংরক্ষণকামী (conservative)। ইন্‌ষ্টিংকটের গতি হচ্ছে বৃত্তাকারে আবর্ত্তন—প্রথম আকাঙ্ক্ষা, উত্তেজনা ও অস্বস্তি ; তারপর তার ক্রমশঃ বৃদ্ধি, সর্বশেষে শক্তির দ্বারোন্মোচন দ্বারা (release of energy) পূর্ববর্তী শান্ত অবস্থায় পরিবর্ত্তন। উত্তেজনা ও অস্বস্তির বৃদ্ধিতেই পরবর্তী

উপশম ও তৃপ্তির স্তরটি নিবিড়ভাবে উপভোগ্য হয়। ইন্‌ষ্টিংকটের গতির এই আবর্ত্তন পুনঃ পুনঃই ঘটে। এর একটা নির্দ্দিষ্ট ছন্দ আছে। যেমন, একটা নির্দ্দিষ্ট সময় পরে পরেই ক্ষুধা পায়, ঘুম পায় ইত্যাদি।

ইন্‌ষ্টিংকটের বস্তু (object) হচ্ছে, যে উপায় বা বস্তুর সাহায্যে সেই নির্দ্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা বা অস্বস্তির উপশম ঘটে, তা। ক্ষুধার বস্তু খাদ্যগ্রহণ, কামাকাঙ্ক্ষার বস্তু হচ্ছে,—বিপরীত-লিঙ্গ ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গম। ইন্‌ষ্টিংকটের বস্তু সর্বদা এক না হতেও পারে। বহু বিভিন্ন বস্তুই একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটাতে পারে। এখানে পরিবর্ত্ত (Substitute) দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে কাজ চালানো যায়: শিশু মায়ের স্তনের অভাবে নিজের বুড়ো আঙ্গুল চুষে তৃপ্তি পায়, স্বপ্ন ও কল্পনায় কামবস্তুর অভাব পূরণ করা হয়। কি ভাবে একটি ইন্‌ষ্টিংকট বিভিন্ন বস্তুর মধ্য দিয়ে অস্বস্তি উপশম (tension reduction) খোঁজে তার দ্বারা ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিভিন্ন পথের সন্ধান মিলে।

কোন ইন্‌ষ্টিংকটের বেগ (impetus) নির্ভর করে এর পেছনে কতটা শক্তি ক্রিয়া করছে, তার উপর। অল্প অল্প ক্ষুধার চেয়ে প্রচণ্ড ক্ষুধা ব্যক্তির মানসিক প্রক্রিয়ার উপর অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করে। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্যের কথা ভাবে, খাদ্যের স্মৃতির রোমন্থন করে,—তখন তার মনে অন্য কোন বস্তুর চিন্তা স্থান পায় না। যে মানুষ প্রেমে পাগল, সে অন্য বিষয়ে মন দিতে পারে না।

ইন্‌ষ্টিংকটের আধার হচ্ছে ঈদ্‌। ইন্‌ষ্টিংকটই হচ্ছে মানসশক্তির সমগ্র পরিমাণ (total amount of psychic energy)। কাজেই ঈদ্‌ হচ্ছে সমস্ত ব্যক্তিত্বের মূলশক্তির আধার। এই মূলাধার থেকে শক্তি আহরণ করেই ঈগো ও সুপার-ঈগোর সৃষ্টি। কি করে এই মূল শক্তির আধার থেকে শক্তি আহৃত ও বন্টিত হয়, তা এবার আলোচনা করা দরকার।

মানসশক্তির বণ্টন—ঈদই হচ্ছে সমগ্র মানসশক্তির আধার। ঈদের এ শক্তি ব্যয়িত হয় আদিম আকাঙ্ক্ষাগুলির পরিতৃপ্তিতে, আবর্তক্রিয়া (reflex action) ও ইচ্ছাপূরণে (wish fulfilment)। বস্তিতে (bladder) মূত্র-সঞ্চয়ের অস্বস্তি দূর হয়, মূত্রত্যাগ দ্বারা। এটি একটি আবর্তক্রিয়া। আবার কামবস্তুর কল্পনা, বা স্বপ্নের দ্বারা কামাঙ্ক্ষার বিকল্প পরিতৃপ্তি। দুই এর মধ্যেই আদিম আকাঙ্ক্ষার (instinct) শক্তি সহজ প্রকাশের পথ পেয়ে ব্যক্তির দৈহিক অস্বস্তি দূর করে বা উপশম করে,—তার জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটায়।

আদিম আকাঙ্ক্ষা বা ইনষ্টিংকটের শক্তি যখন কোন বস্তুর কল্পনায় বা বস্তুর প্রাপ্তিতে নিযুক্ত হয়, তখন তাকে object choice বা object cathexis বলা হয়। ঈদের সমস্ত শক্তিই ব্যয়িত হয় object cathexis-এ, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তি বা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কল্পনায়। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঈদের স্তরে বস্তুর প্রাপ্তি ও বস্তুর কল্পনা সমার্থবাচক।

ঈদের এই শক্তি বহুমুখী ও অতিসহজেই এর গতি পরিবর্ত্তন করা যায়। তাই দেখা যায় আকাঙ্ক্ষার নির্দিষ্ট বস্তুটি না পাওয়া গেলে তার বিকল্পের দিকেই কামশক্তি ধাবিত হয়। ক্ষুধার্ত্ত শিশু খাদ্য কাছে না পেয়ে হয়তো কাঠের খেলনাই মুখে পুরবে। দুইএর মধ্যে কিছুটা মিল থাকলেই হোল। দুধের বোতল ও খেলনা, নিতান্ত শিশুর কাছে, দুইই এক বস্তু, কারণ দুটিকেই হাতে মুঠ করে ধরে মুখে পোরা যায়। ঈদের এই নির্বোধ ক্রিয়াকে বলা হয় displacement। ঈদ্ বাস্তব জগতের নিয়ম জানে না। কাজেই এই বিকল্প দিয়ে তাকে ভোলানো যায়। স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাখ্যার কালে ফ্রয়েড ঈদের এই displacement এর অভ্যাসকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি বলেছেন স্বপ্ন মাত্রই ইচ্ছাপূরণ। এবং কামবস্তু এই displacement এর ফলে প্রতীকের আকার ধারণ করে,—যেমন ঘোড়ায় চড়ার, হল চালনার বা চাবি দিয়ে তালা খোলার স্বপ্ন হচ্ছে রতিক্রিয়ার বিকল্প,—প্রতীক সাহায্যে কামাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি।

ঈদ্ যেমন বস্তু এবং তার কল্পনাকে একই মনে করে, তেমন যে দ্রব্যগুলি বাস্তবিক বিভিন্ন, কিন্তু কোন একটি বিশেষ গুণে যাদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে, ঈদ্ তাদেরও এক বলে মনে করে। এতে করে অনেক সময় চিন্তার ক্ষেত্রে ভ্রমের সৃষ্টি হয়। স্বপ্নে প্রতীকের ব্যবহার এই predicate thinking এর উদাহরণ। জাগ্রত জীবনে এই predicate thinking জনিত ভ্রমের উদাহরণ দেওয়া যাক। যা ময়লা, কালো, তা—ঘৃণ্য, পাপ। তাই অনেক সময় কালো মানুষের প্রতি আমাদের বিরাগ। বিড়ালের পিঙ্গল চোখ,—বেড়াল হিংস্র। তাই পিঙ্গলচোখ মানুষও বদমেজাজী ব'লে মনে করি।

জীবন ও সমগ্র ব্যক্তিত্বের মূল শক্তি একটিই। ঈদ্ এই শক্তির মূলাধার। কিন্তু এই শক্তিই ঈদের আধার থেকে বণ্টিত হয় ঈগো ও সুপার ঈগোতে। ঈগো আর সুপার-ঈগোর আলাদা কোন শক্তি নেই। ঈগোর বুদ্ধি বিবেচনা বা সুপার-ঈগোর বিবেক ও নৈতিকতা মৌলিক কামেরই ভিন্নতর প্রকাশ।

এদের জাত আলাদা, এদের উৎস আলাদা, এটা মনে করা ভুল। ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন শক্তির সমন্বয় নয়,—ব্যক্তি-মানস আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত নয়। এক মৌলিক শক্তিরই বিচিত্র প্রকাশ, ব্যক্তিচরিত্রে।

ইন্‌ষ্টিংক্‌ট এর কামশক্তির ধারা যখন ঈগো বা সুপার ঈগো দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়—তখন এ বাধা ঈদ্ অতিক্রম করতে চেষ্টা করে কল্পনা বা আবর্ত ক্রিয়ার দ্বারা। যেখানে ঈদ্ এ চেষ্টায় সফল হয়, সেখানেই ঈগোর বুদ্ধি ও বিচারের শক্তিতে ভাঁটা পড়ে—সেখানেই যুক্তি ও বিচারে বিভ্রম ঘটে। এ সব ক্ষেত্রে প্রবল কামশক্তির তাড়না ব্যক্তির যুক্তি ও বিচারের ক্ষেত্রে বিভ্রম জন্মায়, ব্যক্তির বাক্যে, লেখায়, স্মৃতিতে বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নানা ভুল হয় তার সাংসারিক বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানে নানা ত্রুটি ঘটে। তাই রাগের সময় বা কোন গভীর আবেগ দ্বারা যখন আমরা তীব্রভাবে আলোড়িত হই, তখন কোন কাজ সুস্থির ভাবে, সুষ্ঠুভাবে আমরা করতে অক্ষম হই। তখন সমস্ত জৈবশক্তি ঈদের প্রয়োজনে ব্যয়িত হচ্ছে, ঈগো ও সুপার ঈগো তখন পঙ্গু ও অক্ষম। কিন্তু ঈদ্ যেখানে এমন অবিসংবাদী প্রাধান্য লাভ করতে পারে না, সেখানে জৈবশক্তি ঈগো ও সুপার ঈগোর খাতে বাহিত হয়। সুস্থ বয়স্ক মানুষের জীবনে এটাই স্বাভাবিক অবস্থা। তাই মানুষ পশুর অন্ধতাকে অতিক্রম করে, বিচার বুদ্ধি ও নীতিসম্পন্ন জীবে পরিণত হয়েছে।

মূল জৈবশক্তি ঈগোকে কিভাবে বিকশিত করে? ঈগোর নিজস্ব আলাদা শক্তি নেই, বাস্তবিক পক্ষে আদিম জৈবশক্তি ঈদের দাবী উল্লঙ্ঘন করে ঊর্ধ্ব ও বহির্মুখী হয় বলেই ঈগো অস্তিত্ব লাভ করে। সুস্থভাবে বিচার, বিশ্লেষণ, প্রভেদকরণ, স্মৃতি, যুক্তি—ঈদের আদিম-শক্তির মধ্যেই সম্ভাবনা রূপে থাকে। কিন্তু ঈদের আধার থেকে মৌলশক্তি ছাড়া পেয়ে যখন নিজস্ব আর একটি অস্তিত্ব লাভ করে, অর্থাৎ সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি যখন প্রকট হয়ে ওঠে তখনই ঈগোর কাজ সুরু হয়। ঈগোর এই বিকাশের ধারা দীর্ঘ ও অতীব জটিল।

ঈদের শক্তি যেখান থেকে ঈগোতে রূপান্তরিত হচ্ছে সে প্রক্রিয়াটিকে ফ্রয়েড বলেছেন তাদাত্মীকরণ বা identification। ঈদের স্তরে মানসিক ও বাহ্যিক, মনোজগৎ ও বর্হিজগতের মধ্যে কোন ভেদ নেই। বাস্তবিক পক্ষে ঈদের স্তরে বাহ্য বলে কিছুর অস্তিত্বই নেই। কাম্যবস্তু ও তার কল্পনা দুইই ঈদের কাছে সমতুল্য।

কিন্তু এ অন্ধতা দ্বারা পৃথিবীতে পদে পদে ঠকতে হয়। খাদ্য বস্তুর কল্পনা

খাদ্য বস্তুর অভাব মেটাতে পারে না। তাই জীবন যাত্রার পথে ঠেকে ঠেকে, এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ করতে ব্যক্তি বাধ্য হয়। এবং জীব ক্রমে বুঝতে পারে খাদ্যের কল্পনার সঙ্গে খাদ্য প্রাপ্তির যোগাযোগ না ঘটাতে পারলে জীবন যাত্রা অচল। তাই এই দুই অর্থাৎ অন্তর জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে কি করে মিল ঘটাতে হবে এ সমস্যার সমাধানেই ঈগোর জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি। এমনি করে ভিতর ও বাইরের মিলের চেষ্টাতেই মানুষের বস্তু-জগতের জ্ঞান ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করে, পূর্বের ভুল ধারণার পরিবর্তন ঘটে। যেমন, আগে মানুষ ভাবতো পৃথিবী সমতল, কিন্তু ক্রমেই এ ধারণার সঙ্গে মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার অমিল হতে থাকলো। তাই মানুষ পুরোণো মত পরিবর্তন করে, এ বিশ্বাস করলো, যে পৃথিবী গোলাকার। সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আমাদের ধারণাকে বাস্তব জগতের সত্যের অনুগামী করা। পূর্বে 'সেকেণ্ডারী প্রসেস্' এর কথা বলা হয়েছে। তার বিকাশের মূলে আছে মন ও বাহ্য জগতের প্রভেদ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং এ দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা। ঈদের স্তরে অন্তরজগৎই সব; বহির্জগত আর অন্তর-জগৎ অভিন্ন। কিন্তু যুক্তি, বিচার, বুদ্ধি, বিভেদবোধ অর্থাৎ ঈগোর কাজ তখনই শুরু হবে যখন বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের বিভেদ বোধ জাগবে এবং তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও মিলের চেষ্টা হবে। ঈদ তো অন্ধ। কিন্তু যুক্তিগত চিন্তা এ অন্ধতা অতিক্রম করেই সম্ভবপর। এ হিসাবে ঈগো ঈদের শত্রু। ঈদের রাজ্য হল প্রাইমেরী প্রসেস্ বা কল্পনা ও ইচ্ছাপূরণের রাজ্য। ঈদের হাত থেকে শক্তিকে কেড়ে নিয়েই ঈগোর বাস্তব চিন্তা বা সেকেণ্ডারী প্রসেস্ সুরু হয়। ব্যক্তিত্ব বিকাশের ইতিহাসে এই ক্ষমতা বা শক্তির পুনর্বণ্টন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ—"This redistribution of energy from the id to ego is a major dynamical event in the development of personlity."

[এ প্রবন্ধটি ৮৬ পৃষ্ঠার প্রবন্ধটির পূর্বে পঠনীয়]

জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২)

উইলিয়াম্ জেমস্ আমেরিকার দর্শনের ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। তাঁর পরেই নাম করতে হয় জন ডিউইর। জর্জ স্যাণ্টায়ানা (১৮৬৩-১৯৫২) ডিউইর সমসাময়িক। দু'জনেই দীর্ঘ আয়ু পেয়েছিলেন। দু'জনেই ১৯৫২ সালে মারা যান। স্যাণ্টায়ানাও দার্শনিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে গেছেন। কিন্তু তাঁর তুলনায় ডিউইর প্রভাব বিস্তৃততর ও গভীরতর। বিশেষতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে ডিউইর দান অপরিসীম। তাঁর চিন্তা আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রেই মস্ত আলোড়ন আনেনি, সুদূর তুরস্ক ও রাশিয়ায়ও তাঁর নূতন শিক্ষাদর্শ আদৃত হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে শিক্ষায় অগ্রসর কোন দেশই তাঁর শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাকে উপেক্ষা করতে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে ফ্রোএবেল ও মন্তেসরীর মত পথিকৃতের সম্মান তাঁর প্রাপ্য।

তাঁকে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ প্রতিভার নিদর্শন বলা চলে। আমেরিকার জীবনের কর্মোদ্যম, অদম্য কৌতূহল, নূতনকে জয় করার স্পৃহা, প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রত্যেক জিনিষের মূল্যায়ণ, মানুষের মহত্ত্বে বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অটুট শ্রদ্ধা, সুস্থ সমাজ জীবনের আদর্শ,—এ সব কয়টি লক্ষণই তাঁর চিন্তায় পরিস্ফুট। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও এ সমস্ত মহৎ গুণ প্রতিফলিত হয়েছিল। তাই তাঁর মতের বিরোধীরাও তাঁকে সম্মান করতেন। যা অন্যায় বলে মনে করেছেন, তার বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যে সংগ্রাম করেছেন। যা সত্য ও শ্রেয়ঃ বলে মনে করেছেন তার প্রতিষ্ঠার জন্যে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তও অদম্য উৎসাহে কর্ম করে গেছেন। তাই তিনি সর্ব দেশে প্রণম্য।

বাল্যকালে তাঁর প্রতিভার কোন স্ফুরণ কিন্তু দেখা যায়নি। ইস্কুলে তিনি নিতান্ত সাধারণ ছাত্র ছিলেন। কৈশোরে ভারমণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের সময়ও কেউ ভাবতে পারেনি যে এই নিতান্ত শান্ত ও বৈশিষ্ট্যহীন ছাত্রটি চিন্তার জগতে বিরাট আলোড়ন আনবেন। বি, এ পড়তে যখন জনস্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে যান, তখন 'পড়ুয়া' ছাত্র হিসাবেই শিক্ষকরা তাঁকে চিনতেন, কিন্তু প্রতিভার কোন ঔজ্জ্বল্য তাঁরা এ ছাত্রটির মধ্যে লক্ষ্য করেন নি। এ পড়ুয়া ছাত্রটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট (আমাদের দেশে ভাইস্ চ্যান্সলার) গিলম্যান উপদেশ দিয়েছিলেন "গ্রন্থকীট হয়ো না,

বাইরের পৃথিবীতে বেরিয়ে এসে সত্যিকারের মানুষকে জানতে চেষ্টা কর।" এ উপদেশ (১৮৮৪ সাল) বৃথা হয়নি। ভবিষ্যতে তাঁর দর্শন ও চিন্তা বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধান করতেই চেষ্টা করেছে। তাঁর চিন্তা আকাশ বিহারী মিথ্যা কল্পনা বা দুর্বোধ্য এ্যাবষ্ট্রাক্ট লজিকের মারপ্যাঁচে ভর্তি নয়। নিতান্তই তা মাটির মানুষের কাছাকাছি।

গিলম্যান্ তাঁকে দর্শন ছেড়ে অন্য কোন বিষয়ে মন দিতে বলেছিলেন। তিনি কিন্তু দর্শনকেই জীবনের ব্রত হিসাবে বেছে নিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি খুব সফল ছিলেন না। তাঁর বক্তৃতা বা লেখা নীরস গদ্য, তাতে রসিকতার বিন্দুমাত্র আভাসও নেই। কিন্তু তাঁর সরল, সহজ বক্তব্য সত্যের দ্যুতিতে উজ্জ্বল। এটা সহজেই বোঝা যায়, তিনি যা বলছেন তা তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়কেই প্রতিফলিত কচ্ছে। তাই তাঁর লেখায় বা কথায় ঔজ্জ্বল্য না থাকলেও তা শ্রোতা বা পাঠককে বশ করতো। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন। তাঁর একজন ছাত্র বলেছেন, তিনি ক্লাশে বক্তৃতা দিতে উঠে ছাত্রদের দিকে না তাকিয়ে ঘরের ছাদ বা দেয়ালের দিকে অনির্দ্দেশ্য ভাবে তাকাতেন, যেন দেয়াল ও ছাদের ফাঁক থেকেই তাঁর বক্তব্যের মূলভাব তিনি হঠাৎ পেয়ে যাবেন। আর তা তিনি পেতেনও।

তিনি প্রমাণ করে দিলেন দর্শন শুধু গজদন্তমিনারের উচ্চ চূড়ায় বসে অলীক স্বপ্ন দেখা নয়। তাঁর দর্শন মাটির মানুষের চিন্তার নাগালের মধ্যে তিনি এনেছিলেন। তিনি বললেন, যা আমাদের বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানে সহায়ক হবে না তেমন দর্শনের কোন মূল্য নেই। এ বিষয়ে তিনি তাঁর পূর্বগামী উইলিয়াম জেমস্ ও চার্লস পিয়ার্স-এর 'প্র্যাগম্যাটিক' মতবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত। এঁদের পরস্পরের দর্শনের মধ্যে পার্থক্য ও বিরোধ আছে। কিন্তু একটি মৌলিক কেন্দ্র থেকে তাঁদের সকলেরই চিন্তার সূত্রপাত। তা হচ্ছে এই বিশ্বাস যে যা কার্যকরী, তাই সত্য—Truth is that works। ভারতীয় ঋষি বা মিষ্টিক্দের মত এঁরা বিশ্বাস করেন না যে "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্", সত্য অটল, অচল, ধ্রুব—বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অতীত অলৌকিক পদার্থ। তাঁদের মতে মানুষই নিজের চেষ্টা ও উদ্যম দ্বারা সত্যকে আবিষ্কার করে, তাকে প্রাণবন্ত করে। দার্শনিক যে শুধু সত্যের স্বরূপকে জানতে চেষ্টা করবেন নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসাবে, তা নয়। সত্য হচ্ছে খরধার তরবার, তাকে আবিষ্কার করবেন দার্শনিক,—জীবনের বাধা দ্বন্দ্ব, সমস্যার জটিল জাল

ছিন্নভিন্ন করবার জন্যে। মানুষের চিন্তা ও দর্শন মিউজিয়ামে সযত্নে সাজিয়ে রাখবার মরা কঙ্কাল মাত্র নয়। তা মানুষের কাজে লাগাবার জন্যে। চিন্তা হচ্ছে কর্মের হাতিয়ার। এ জন্যে ডিউইর দর্শনকে Instrumentalism বলা হয়। সত্য চিন্তা ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি নয়, তার মূল্য তার ব্যবহারে। মানুষই সত্যকে সৃষ্টি করে,—ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের জন্য নয়, সমাজের হিত সাধন উদ্দেশ্যে, বহুজন সুখায় চ বহুজন হিতায় চ। ডিউই তাঁর চিন্তাকে ব্যবহার করেছেন সমাজের অসাম্য, অবিচার দূরীকরণের কাজে। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর মনকে মুক্ত করবার সাধনায় যে অর্থে রুশো বা ফ্রোএবল জগতের সমস্ত শিশুর মুক্তিদাতা সে অর্থে জন ডিউইও মানব শিশুর মুক্তিদাতা।

তাঁর শৈশবে আমেরিকার শিশুবিদ্যালয়গুলি শিশুপাল বধের আগার ছিল,—তাতে আনন্দ কোলাহলের স্থানমাত্র ছিল না। সেখানে শিক্ষকের তর্জন গর্জন ও বেত্রাস্ফালন শিশুকণ্ঠের কলভাষণকে নীরব করে দিত। সারি সারি বেঞ্চে সিধা হয়ে বসে, মূঢ় ম্লানমুখে তারা শিক্ষকের অমধুর বচন থেকে বিদ্যামৃত আহরণ করতো। কেবল ছিল পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা দুর্বোধ্য বিষয় কণ্ঠস্থ করণ। শিক্ষাব্যাপারে কৌতূহল-উদ্রেক, জিজ্ঞাসা, ছাত্রদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশের উন্মেষ, -এ সমস্তই ছিল সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত। ডিউই বলেছেন, তখন শিক্ষার মূল কথা ছিল ডিসিপ্লিন্,—এবং কড়াহাতে বেত ও চাবুকের সাহায্যেই এ ডিসিপ্লিন রাখা হোত। রুশোর মত ডিউইও এ হৃদয়হীন, নির্বোধ, আত্মাবমাননাকর শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন,—"শিশুদের শিক্ষা হবে তাদের খেলার মতই সহজ, আনন্দময়; কারণ বাইরের তাড়না থেকে যে শিক্ষা তা কখনও স্থায়ী সুফল দিতে পারে না"

তার মতে ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু ও সম্যক বিকাশই সমস্ত শিক্ষার ও সভ্যতার উদ্দেশ্য এবং তা সম্ভব হয় যেখানে শিশুর দেহ ও মন স্বাধীন ভাবে ক্রিয়া করতে পারে। শিশুর জিজ্ঞাসু চঞ্চল মন প্রশ্ন করবে, পরীক্ষা করবে, সন্দেহ করবে এবং নিজের হাতে নাড়বে, চাড়বে, গড়বে এবং তার বিদ্যালয়ে সে সুযোগ তাকে দিতে হবে। বইপত্র তিনি বাদ দিচ্ছেন না, কিন্তু শিক্ষকের তাড়নায় আড়ষ্ট হয়ে, একই ছাঁচে শিশুরা গড়ে উঠবে,—একে তিনি শিক্ষা বলতে রাজী নন। তিনি মনে প্রাণে ব্যক্তিগত উদ্যমের, স্বাধীন প্রয়াস ও পরীক্ষার পক্ষপাতী। শিক্ষক শিশুর কৌতূহলকে উদ্দেশ্যমুখী করে তুলবেন, তার মনকে জিজ্ঞাসু করে তুলবেন, তার উদ্যমকে সফল করে তুলতে সাহায্য

করবেন, এবং শিশুকে নিজ খুসী মত সৃষ্টির, গঠনের স্বাধীনতা দেবেন এবং তিনি লক্ষ্য রাখবেন সে যেন দলের সঙ্গে মিলে মিশে, পরামর্শ করে, কিছু গড়ে তুলতে আনন্দ পায়। সে ভুল করবে, নষ্ট করবে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে নূতন কিছু গড়বার চেষ্টা করছে, ততক্ষণ শিক্ষক তাকে উৎসাহিত করবেন। শিশু যে উপাদান নিয়ে কাজ কচ্ছে তার ব্যবহারের কৌশল, জিজ্ঞাসু শিশুকে শিক্ষক শেখাবেন। কিন্তু যা সে গড়বে, তাতে তার স্বাধীনতা থাকবে। প্রত্যক্ষভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটাতে হবে। যেমন গাছ, ফুল, চন্দ্র, সূর্য, পাখী, পশু-প্রাণী সব সে লক্ষ্য করবে। তার এই প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মধ্য দিয়েই তার শিক্ষা প্রাণবন্ত ও সার্থক হবে। বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে মুখস্থ করে সে পরীক্ষায় পাশ করবে না। তার প্রাণশক্তি, তার উপস্থিত বুদ্ধি, তার ইন্দ্রিয় চালনার উৎকর্ষ দিয়েই তার বিচার হবে। তাঁর 'প্রজেক্ট মেথডে' তিনি শিশুদের স্বাভাবিক আগ্রহ, গঠনস্পৃহা, দশে মিলে কাজ করার আনন্দকে কাজে লাগিয়ে সার্থক শিক্ষার বাহন হিসাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন একদল শিশু ভার নিল,—তারা তাদের পুতুলের জন্যে কাঠের টুকরো, পেষ্টবোর্ড, রঙীন কাগজ ইত্যাদি দিয়ে বাড়ী, ঘর, মায় আসবাবপত্র তৈরী করবে। এর জন্য হাতুড়ী, বাটালি, করাত, ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, শিক্ষক তাদের খেলার সাথী হয়ে, তাদের শেখাবেন। বাড়ীর নক্সা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তারা নিজেরা ঠিক করবে। এ সম্বন্ধে নানা ছবি, বই ইত্যাদির সঙ্গে শিক্ষক তাদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। কোন্ রকম বাড়ীর কি রকম সুবিধা অসুবিধা, শিক্ষক তাদের বুঝিয়ে দেবেন। তার দৃষ্টি থাকবে শিশুদের উদ্যম ও উৎসাহকে একটি সার্থক পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার দিকে। শিশুরা চড়ুইভাতি করবে। সেখানেও তাদের ইচ্ছা, তাদের আগ্রহ, তাদের প্ল্যানই মুখ্য, শিক্ষক তাদের সাথী, উপদেষ্টা, তাদের একজন,—হুকুমওয়ালা নন। জীবনের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য অ্যাবষ্ট্রাক্ট কতকগুলি বিষয় বা কৌশল শেখা তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে মনে করেন না। তাঁর মতে শিক্ষা শিশুর বর্তমান জীবনের আগ্রহ ও প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত না হলে প্রাণহীন ও নিরর্থক হয়। কাজেই তিনি বললেন "education is a process of living, and not a preparation for future living". যদিও তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের একনিষ্ঠ সমর্থক, তথাপি তিনি

জানেন যে ব্যক্তি একটি নিরবচ্ছিন্ন পৃথক সত্তা নয়,—সমষ্টির মধ্যেই ব্যক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। এখানে তাঁর মত রুশোর বিপরীত। তিনি শিশুকাল থেকেই শিক্ষাকে একটি জীবন্ত সমাজজীবনের ক্রিয়া বলে মনে করেছেন। দলের মধ্য দিয়ে, সংঘাত ও সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যক্তির উদ্যম স্ফুরিত হয়, তার স্বাধীন সত্তা পুষ্ট হয়। তাই তাঁর শিক্ষানীতি একই সঙ্গে আমেরিকা এবং রাশিয়ায় আদৃত হয়েছে। কিন্তু তিনি সমস্ত ক্ষেত্রেই একনায়কত্বের (totalitarianism) বিষম বিরোধী। একনায়ক দেশে হয়তো ভয়ের তাড়নায় অনেক কাজ অল্প সময়ে সম্পন্ন করা যেতে পারে, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন না, যে এর ফল স্থায়ী হয়। ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বাধীন উদ্যম, অনায়ত্তকে আয়ত্ত করবার দুর্বার পণ,—যে কোন দেশ ও জাতির সর্বপ্রধান সম্পদ এবং আমেরিকার বিপুল প্রাণ-প্রাচুর্য্যের উৎস-মূল।

১৮৯৭ সালে ডিউই প্রথম তাঁর শিক্ষাদর্শ (pedagogic creed) প্রচার করেন। ১৯০২ সালে তাঁর শিক্ষাদর্শ অনুযায়ী তিনি প্রথম পরীক্ষাগার স্থাপন করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। তাঁর শিশু বিদ্যালয়ে ডেস্কের লম্বা সিধা সারির পরিবর্তে তিনি ব্যবস্থা করলেন কাজ করবার জিনিষপত্র, যন্ত্রপাতি ও উপাদান রাখবার জন্য চওড়া ওয়াকবেঞ্চ ও ছোট ছোট চেয়ারের। তাঁর আদর্শ-বিদ্যালয়ে ডিসিপ্লিনের বেত্রতাড়না-ভীতিজনিত নিস্তব্ধতা নেই। বরং সেখানে আছে শিশুদের স্বাভাবিক আনন্দ-কোলাহল ও চঞ্চল বিচরণ। সমস্ত ক্লাশ ধরে নিরর্থক পুনরাবৃত্তির দ্বারা সেখানে শিক্ষক পড়া শেখান না। সেখানে শিশু আপন খুসীতে কেউ ছবি আঁকছে, কেউ বা গল্পের বই পড়ছে, কোন দল বা ঘরবাড়ী গড়ছে, কোন দল বা নাটকের মহড়া দিচ্ছে। শিক্ষক তাদের প্রত্যেকের ক্রিয়াকেই উৎসাহিত করছেন—তাদের ক্রিয়া যাতে কেন্দ্রীভূত ও ফলপ্রসূ হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখছেন। অর্থাৎ সর্বদাই চেষ্টা হয় ব্যক্তিগত উদ্যম ও কৌতূহলকে উদ্বুদ্ধ করা, এবং বিদ্যালয়টিকে একটি আনন্দময় ও কর্মমুখর সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা।

প্রথম তিনি যখন এ পরীক্ষা সুরু করেন, তখন অভিভাবক এবং শিক্ষাব্রতী—এ দুই পক্ষ থেকেই প্রবল প্রতিবাদ সুরু হয়। তার ফলে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পরীক্ষাগারটি বন্ধ হবার উপক্রম হয়। কিন্তু তিনি তাঁর বিশ্বাস হারান নি। সমস্ত জীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন তাঁর সত্য আদর্শ

প্রতিষ্ঠার জন্যে। ক্রমে ক্রমে তাঁর শিক্ষানীতির কথা দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ল এবং সর্বত্র শিক্ষায় প্রগতিবাদীরা তাঁর বৈপ্লবিক শিক্ষাদর্শকে রূপ দিতে চেষ্টিত হলেন। তিনি নিতান্ত শান্ত নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন, কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই ছিলেন অগ্রগামী চিন্তানায়ক।

অন্যান্য অনেক দার্শনিকের মত তিনি জীবনের কর্ম-কোলাহল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন নি। তাঁর মতে দার্শনিকের চিন্তার উৎস জগতের বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টা। তাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করাই দার্শনিকের কাজ নয়; তাঁর দায়িত্ব আরো অনেক বেশী, গুরুতর। দার্শনিকের চিন্তার প্রধান উদ্দেশ্য আত্মতুষ্টি নয়, জগতের বিবিধ সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ। তিনি বললেন—"As the philosopher has received his problem from the world of action, so he must return his account there for auditing and liquidation." নীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রেও তিনি নিষ্ক্রিয়, নির্বিরোধী 'ভালোমানুষ' কে কোন মর্য্যাদা দিতে প্রস্তুত নন। তিনি বলেন, "সাধু ব্যক্তিরা তাঁদের গজদন্ত নির্মিত উচ্চ মিনারে বসে থাকেন, আর এদিকে ষণ্ডা বদমাইসেরা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করে।" ডিউই নিজে সর্বদাই-অবিচারের বিরুদ্ধে এবং ন্যায় ও প্রগতির পক্ষে লড়াই করেছেন। এজন্যে অনেক সময় তিনি বিরাগভাজন হয়েছেন, কিন্তু তার জন্য কখনো পিছু-পা হন নি। তিনি শ্রমিকদের দাবী সমর্থন করেছেন, স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। ১৯২৬ সালে তিনি স্যাক্কো ও ভ্যানজেট্টির প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল, তার পুনর্বিচার যাতে হয়, সেজন্য সংগ্রাম করেছেন। ১৯৩৭ সালে মস্কোতে ট্রট্স্কির যে বিচারের প্রহসন হয়, তার তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন, এবং একটি আইনজ্ঞদের কমিশন গঠন করে তার সভাপতিত্ব করেন। এ কমিশন সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার করে, এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, ট্রট্স্কি নির্দোষ ছিলেন।

ডিউই বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। যখন তিনি চীন দেশে যান, তখন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর (Rector) তাঁকে 'দ্বিতীয় কনফ্যুসিয়স্' বলে সম্মান প্রদর্শন করেন। তুরস্ক সরকার তাঁকে শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রণালয়ের প্রধান উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, এবং লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী তাঁকে রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণের কাজে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

নানা দেশ ভ্রমণ করলেও মনে প্রাণে তিনি ছিলেন আমেরিকান। তাঁর নিজদেশের কথাই তিনি ভেবেছেন, সমস্ত জীবন ভরে। আমেরিকার চিন্তাধারাকে তাঁর চিন্তা ও আদর্শ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছেন, এবং গণতন্ত্রকে সমস্ত প্রকার একনায়কত্বের বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যে আজীবন চেষ্টা করে গেছেন।

তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন এবং শেষজীবন পর্য্যন্ত কর্মঠ ছিলেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার বহু বৎসর পর বৃদ্ধ বয়সে তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। তাঁর নিজের পাঁচটি ছেলেমেয়ে, তদুপরি তিনি পিতৃমাতৃহীন দুটি ছেলেমেয়েকে মানুষ করার ভার নেন। পক্ককেশ এই দয়ালু মানুষটি ছেলেমেয়েদের বড় প্রিয় ছিলেন, এবং তাঁর সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়াতে নিজ বিস্তৃত খামারবাড়ীতে ছেলেপিলেদের সঙ্গে মিশে খেলাধূলা করা। তাঁর নব্বই বছর বয়সে নিউইয়র্কে তাঁকে যে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়, তাতে সেখানকার স্কুলের ছেলেমেয়েরা প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ৯৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে জগৎ একটি শ্রেষ্ঠ শিশুদরদী মহাপ্রাণ মানুষকে হারিয়েছে।

শিক্ষাবিদ জন ডিউই—জীবনী

জন্ ডিউই ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় ভারমণ্ট এর অন্তর্গত বার্লিংটনে গ্রাম্য পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল ও কৈশোরে বিদ্যালয়ে তাঁর প্রতিভার কোন স্ফুরণ লক্ষিত হয়নি। বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি ভারমণ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে থাকতে জীববিজ্ঞানে ডারুইনের ক্রম বিবর্ত্তনবাদ সম্বন্ধে টি এইচ হাক্সলের বিজ্ঞান বিষয়ক একটি পাঠ্যপুস্তকে পাঠ করে, তাঁর ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়। ডারুইনের সাবধান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পদ্ধতি তাঁকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। ধার্মিক খৃষ্টান পরিবারে তাঁর জন্ম। বাইবেল বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব ও ডারুইনের বিবর্ত্তন বাদের মধ্যে যে বিষম অসামঞ্জস্য আছে, তা তাঁর চিন্তাকে উদ্‌বুদ্ধ করে। জীবনের গতি কি কোন ঐশী বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত, না ইহা জড়শক্তি দ্বারাই চালিত? এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য

তরুণ ডিউই জীববিদ্যা ও দর্শন সম্বন্ধে পুস্তকাদি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করতে সুরু করেন। এর ফলে উনিশ বছর বয়সেই দার্শনিক বলে তাঁর কিছু খ্যাতিলাভ হয়।

তিনি কিছুদিন এক গ্রাম্যস্কুলে মাষ্টারী করেন। কিন্তু তাঁহার জাগ্রত জ্ঞানস্পৃহা তাঁকে বল্টিমোরের নূতন গবেষণা মূলক বিশ্ববিদ্যালয় জনস্ হপকিন্‌সে আকর্ষণ করে। এখানে তিনি প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্ ষ্ট্যান্‌লীহল্ ও খ্যাতিমান্ দার্শনিক চার্লস্ পিয়ার্স্ এর সংস্পর্শে আসেন। ষ্ট্যান্‌লী হলের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পিয়ার্সের প্র্যাগ্‌মাটিক্ মতবাদ তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। জি এস মরিস্ নামে আর একজন দার্শনিকের সংসর্গ তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে এবং তিনি হেগেলের, জড় ও জীবন, অচেতন ও চেতন একই মূলীভূত চিদ্‌শক্তিরই প্রকাশ (Absolute Idealism) এই মত বাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর মনে যে সংশয় ও দ্বন্দ্ব জেগেছিল তার সমাধান এতে খুঁজে পান। কিন্তু এই ভাববাদী মতবাদ তিনি স্থায়ীভাবে গ্রহণ করেন নি। বরং এ মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী প্র্যাগ্‌ম্যাটিজম্ই তিনি পরবর্তীকালে তাঁর দর্শনের মূল ভিত্তি বলে গ্রহণ করেন। ভাববাদীরা (Idealist) বলেন, সত্য স্থির, সনাতন, অপরিবর্তনীয়। প্র্যাগ্‌ম্যাটিজম বলে, সত্য জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে সংযুক্ত। যা জীবনের সমস্যাসমাধানের অনুকূল তাই সত্য, তাই তা পরিবর্তনশীল, গতিশীল ও পরীক্ষাদ্বারা আবিষ্কার সাপেক্ষ (Experimentalism)। জ্ঞান হচ্ছে জীবনের বিস্তার ও জীবনের সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার (instrumentalism)। জীবনের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য জ্ঞানের কোন মূল্য নাই।

জনস্ হপকিনস্ থেকে ডিউই মিশিগান্ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক হয়ে যান। সেখান থেকে যান মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবার মিশিগান ফিরে আসেন। সেখান থেকে শিকাগোতে যান। এ সময় তাঁর প্রথম মনোবিজ্ঞান মূলক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়—তখনও ভাববাদী প্রভাব তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

কিন্তু এ সময় উইলিয়ম্ জেমস্ এর মতবাদ তাঁর মনে পরিবর্তন আনতে সুরু করে। উইলিয়ম্ জেমস্ হেগেলের তীক্ষ্ণ সমালোচক। হেগেলের মতে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পরিবর্তনই ভগবানের চিন্তার মধ্যে সম্পূর্ণ। তাই বাস্তবিক পক্ষে নূতন কিছুই ঘটে না। কিন্তু এ সময় আমেরিকায়, বিশেষ করে মধ্যপশ্চিম

রাজ্যগুলিতে (Midwestern states) বিপুল পরিবর্ত্তন চলছিল। দেশের উদ্যোগী ও সাহসী লোকদের কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা দেশের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধিসাধন ঘটছিল। সমাজ জীবনেও বিপুল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। ডিউইর মত তীক্ষ্ণধী মানুষের মনে এ বিপুল পরিবর্ত্তনের তাৎপর্য সহজেই প্রতিভাত হোল। তিনি বুঝলেন এ সৃষ্টি ভগবানের চিন্তার মধ্যে সম্পূর্ণ একটি ভাবাবেগ মাত্র নয়। মানুষ নিজ উদ্যমের দ্বারা নিত্যই নূতন সৃষ্টি করে। মানুষের সৃষ্টির সফলতা নির্ভর করে, পরীক্ষার উপরে। সামাজিক জীবনের মধ্যেই মানুষের প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা চলে এবং সৃষ্টি নূতন উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। তাই উদ্যম ও সাফল্যের আশায় যে বিপুল উদ্যম, তার কুফলটাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি দেখেছিলেন যে বহু ব্যর্থতা ও অশ্রুজলের মূল্য দিয়ে এ সাফল্য ক্রয় করতে হয়। যারা এ সংগ্রামে হেরে গেল, যারা নিষ্পেষিত হয়ে গেল, তাদের কথা তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। যারা নীচে পড়ে রইল শিক্ষার দ্বারা তাদের জীবনকে কি করে সার্থক করে তুলতে হবে, তাদের জীবন বিকাশের সুযোগ কি করে বাড়াতে হবে, এসব কথা তিনি ভাবতে সুরু করলেন। বাস্তবিক পক্ষে তখন থেকে তাঁর মনে এই কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে দর্শন বিশুদ্ধ আকাশ-বিহার নয়, মানুষের ও সমাজের সমস্যা থেকেই দর্শনের সৃষ্টি, ও সামাজিক ও সাংসারিক সমস্যা ও সংঘর্ষের মীমাংসাই দর্শন, তথা সমস্ত জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য। যে তিনটি শক্তি থেকে সামাজিক সংঘর্ষের উদ্ভব, তা হচ্ছে বিজ্ঞান, শ্রম ও গণতন্ত্র (Science, industry, and democracy). এই শক্তিত্রয়ের সামঞ্জসীকরণই সমস্ত দর্শনের উদ্দেশ্য।

শিকাগোতে থাকা কালে সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারেই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ফ্লোরা কুকের (Flora Cook) নতুন ধরনের বিদ্যালয়ের প্রতি। ১৮০৬ সালে তিনি তাঁর স্ত্রীর সহযোগিতায় নতুন একটি বিদ্যালয় খোলেন। তার নাম দিলেন ল্যাবরেটরী স্কুল। এটিই বাস্তবিকপক্ষে প্রথম আধুনিক গবেষণামূলক বিদ্যালয়। এখানেই তাঁর শিক্ষাদর্শ ও পদ্ধতিগুলির বাস্তব পরীক্ষার সুযোগ তিনি পান। প্রথম মাত্র ১৬টি ছাত্র ও দুইজন শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়ে বিদ্যালয় সুরু হয়। প্রথম সাতবৎসর বহু ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে স্বামী-স্ত্রী এ বিদ্যালয়টিকে বাঁচিয়ে রাখেন ও সযত্নে একে পোষণ করেন। পরে আর একজন উৎসাহী শিক্ষিকা এলা ফ্ল্যাগের (Ela Flagg) সহায়তা তিনি পান। তিনিই বহু বৎসর এ বিদ্যালয়ের

অধ্যক্ষ (Principal) ছিলেন। ডিউই ছিলেন সঞ্চালক (Director)। ডিউই পত্নী ১৯০১ সাল থেকে ভাষা শিক্ষাবিভাগের প্রধান (Head of the Department) ছিলেন। ১৯০২ সালেই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসংখ্যা বেড়ে হয় ১৪০, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট দশজনকে সহকারী শিক্ষক হিসাবে লওয়া যায়। এ বিদ্যালয় এখন সমস্ত আমেরিকায় খ্যাতিলাভ করেছে এবং এর নাম এখন ডিউই বিদ্যালয়।

এখানে বিদ্যার্থীদের বয়স চার থেকে চৌদ্দ। হার্বার্টের নিতান্ত বাঁধা ধরা পদ্ধতি এখানে অনুসৃত হয় না। ছাত্রছাত্রীরা এখানে বিভিন্ন কাজ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়েই শিক্ষালাভ করে (activity programme)। পড়া লেখা অঙ্ক সবই শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ (interest) অনুসরণ করে। তার জীবনের সমস্যা-সমাধানের সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষা দেওয়া হয়, কাজেই আগের থেকেই নির্দিষ্ট করা অপরিবর্তনীয় পাঠ্যসূচী এখানে অনুসৃত হয় না। বিদ্যালয়টি একটি সজীব সামাজিক সংস্থা। শিক্ষক ছাত্র সকলেই যেন একটি বৃহৎ সংসারের অঙ্গ। শিক্ষাটা সেই জীবন্ত গোষ্ঠিজীবনেরই ক্রিয়া,—ভবিষ্যৎ অনির্দ্দিষ্ট জীবনের জন্য প্রস্তুতি নয়। এখানে শিশু নিষ্ক্রিয়,গ্রহীতা মাত্র নয়। শিক্ষক এখানে উঁচু থেকে বিদ্যাবর্ষণ করেন না, ছাত্র শিক্ষক মিলে জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে আগ্রহ ও ক্রিয়ার ভিত্তিতে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়, ভাগ করে ক্লাস নেওয়া হয় না। সেখানে শিশুর শিক্ষা হচ্ছে কি করে সমাজ জীবনের কুশল কর্মী হওয়া যায়। এখানে প্রতিযোগিতা ও ব্যক্তিগত উৎকর্ষলাভের চেষ্টা গৌণ। গোষ্ঠিজীবনে সহযোগিতাদ্বারা সমস্যার সমাধান এবং বাস্তবের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য। বিদ্যালয় এখানে সমাজ জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। এখানে গঠন-মূলক ক্রিয়া ও আলোচনাতে শিশুকে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং সমাজের ঐতিহ্য ও ধারাকে অস্বীকার না করে, তাকে বর্তমানের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করবার শিক্ষাই, সমষ্টিগত উদ্যমের মধ্য দিয়ে লাভ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। এ বিদ্যালয়ের মধ্যদিয়েই নীতি ও গণতন্ত্রের শিক্ষায় শিশুরা বিশ্বাসী হয়ে ব্যক্তি ও সমাজ, শ্রম ও সৃষ্টি, শিশুর মনোবৃত্তি ও পাঠ্যবস্তুর মধ্যে এভাবে সমন্বয় ঘটবে ডিউই আন্তরিক ভাবে এ আশা পোষণ করেন। শুধু মাত্র শিক্ষাতত্ত্বে ডিউইর আগ্রহ নেই। তিনি এ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার মধ্য দিয়েই প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালীর অনুসন্ধান করেছেন। মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাসী,

গোষ্ঠিজীবনে বিশ্বাসী, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুশলী স্বাধীন মানুষ সৃষ্টিই তার শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য।

বহু পুস্তক তিনি রচনা করেছেন। তাঁর বইগুলির মধ্যে Reconstruction in Philosophy, Democracy and Education, Education Today ও Experience and Education সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর নূতন শিক্ষানীতি দেশে ও বিদেশে বহু শিক্ষাব্রতীকে নূতন পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

১৯৫২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

(G. H. Thompson এর A Modern Philosophy of Education হইতে ডিউইর জীবনীর অধিকাংশ উপাদান গৃহীত হইয়াছে।)

আদর্শবাদী প্রগতিপন্থী শিক্ষাব্রতী উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিক্

শিক্ষায় 'প্রোজেক্ট মেথড' (উদ্দেশ্যমুখী কর্মভিত্তিক শিক্ষা)-এর সঙ্গে কিলপ্যাট্রিকের নাম জড়িত। এঁর চিন্তাধারার সঙ্গে ডিউইর চিন্তাধারার অনেক বিষয়ে মিল আছে। আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে দুজনের নামই সুপরিচিত। তবে ডিউইর প্রভাব অনেক গভীরতর ও বিস্তৃততর। কিলপ্যাট্রিক ডিউইর (১৮৫৯—১৯৫২) বারো বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর চিন্তা ডিউইর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। ডিউইর লেখা সুখপাঠ্য নয় কিন্তু কিলপ্যাট্রিকের লেখক হিসাবে সুখ্যাতি আছে। তার লেখা বইগুলির মধ্যে 'ফাউণ্ডেশনস্ অব মেথড্', 'এডুকেশন ফর এ চেঞ্জিং সিভিলিজেশন', 'এডুকেশন এ্যাণ্ড দি সোশ্যাল ক্রাইসিস্' এবং 'দ্য এডুকেশনাল্ ফ্রন্টিয়ার' শিক্ষাব্রতীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ১৯৩১ সাল থেকে প্রকাশিত 'ফ্রন্টিয়ারস্ অব ডেমোক্রেসী' নামক শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতি ও গণতন্ত্রের সমর্থক পত্রিকার তিনি সম্পাদক। তা ছাড়া প্রোগ্রেসিভ্ এডুকেশন অ্যাসোসিয়েসন, জন ডিউই সোসাইটি ফর দি ষ্টাডি অব দি স্কুল এ্যাণ্ড কালচার ইত্যাদি প্রগতিশীল শিক্ষা সমিতির পরিচালনার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৯ সাল থেকে টিচার্স কলেজে অধ্যাপনা করেছেন এবং ১৯৩৮ সালে সেখান থেকে

অবসর গ্রহণ করেন। তিনি সুপুরুষ, সুলেখক ও সুবক্তা। প্রগতিশীল শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখবার জন্যে তার উৎসাহ ও উদ্যম অপরিসীম ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪—১৯১৮) পর ইয়োরোপের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বিধ্বস্ত হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর বিষময় প্রভাব বিস্তৃত হয়। বিশেষতঃ শিক্ষাক্ষেত্রেই ক্ষতি হয় সব চেয়ে বেশী। বহু বিদ্যালয় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, শিক্ষকেরা অনেকে যুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন, ছাত্রছাত্রীরা যুদ্ধের ধাক্কায় নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া দারুণ অর্থাভাবে ইয়োরোপের সর্বত্র শিক্ষার গতি খুবই ব্যহত হয়। কিন্তু সে দেশের পুরুষকারে বিশ্বাসী মানুষেরা হাল ছেড়ে দেন নি। শিক্ষার বুনিয়াদ নূতন ভিত্তির উপর তারা গড়ে তুলতে চেষ্টিত হন কারণ এটা তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছেন যে, কোন জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করে সে দেশের শিশুদের সুশিক্ষার ব্যবস্থার উপরে।

প্রথম যুদ্ধের পর অনেক বৎসর পর্যন্ত আমেরিকায় সমৃদ্ধির জোয়ার বেগে বইছিল। কিন্তু বর্তমানকালে সমস্ত পৃথিবী অর্থনীতির এক অচ্ছেদ্যসূত্রে আবদ্ধ। তাই কোন একটি দেশে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সে দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; সে দুর্ভাগ্যের ভাগ অন্য দেশকেও নিতে হয়। তাই ১৯২৯ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপযয়ের প্রবল ঢেউয়ে আমেরিকার অর্থনৈতিক ভিত্তিও টলে উঠল। বহু ব্যবসায় ফেল পড়ল, বহু ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বালাল, দেশব্যাপী দুর্ভাগ্যে সমস্ত মানুষ বিভ্রান্ত হল, বিচলিত হল। ১৯৩১ সালে এ মন্দার ফলে শিক্ষা এবং অন্যান্য সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিই সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হল। শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়বরাদ্দ অনেক কমিয়ে দেওয়া হ'ল, শিক্ষকদের মাইনে ছাটাই হ'ল, নতুন বিদ্যালয় গড়বার সব প্ল্যান বন্ধ হয়ে গেল, শিক্ষকদের কাজের সময় বেড়ে গেল, অথচ ক্লাশগুলো আগের চেয়ে বড়ো হতে লাগলো, স্কুল টার্ম দশ মাস থেকে কমিয়ে ছ'মাস করা হল। কিন্তু তার চেয়েও ক্ষতির কারণ হল যে শিক্ষাব্যবস্থাই বিষম সমালোচনার বিষয় হল। রাজনীতিবিদ, জনসাধারণ, এমন কি অনেক শিক্ষাবিদ্‌ও বলতে সুরু করলেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে বহু অপব্যয় ঘটছে, সুন্দর দামী দামী স্কুলের দালান কোঠা, নানা সরঞ্জাম, খেলাধুলার প্রচুর ব্যবস্থা এর অনেকটাই বিলাসব্যাসন মাত্র। এতে শিক্ষার্থীদের উপকার না হয়ে অপকারই হচ্ছে।

শিক্ষার এই দুর্দিনে শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং জীবনে শিক্ষার স্থান কি তা

নিয়েই একটা অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তা গড়ে উঠতে লাগলো। শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত প্রগতিবাদই যেন সন্দেহের চোখে দেখা হতে থাকলো। কিন্তু এই অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসের আবহাওয়ার মধ্যেও কিল্‌প্যাট্রিক প্রমুখ প্রগতিবাদী ডিউইর অনুগামীরা বিশ্বাস হারালেন না। শিক্ষার সংকট ধীর মস্তিষ্কে আলোচনা এবং এই সংকটে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করবার জন্যে ১৯৩২ সালে ন্যাশন্যাল এডুকেশন এসোসিয়েসন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে একটি যুক্ত কমিশন নিযুক্ত করলেন। এর উদ্দেশ্য হোল যাতে বিনামূল্যে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত না হয় বরং যাতে বিদ্যালয় ও কলেজগুলির উন্নতির কাজ আরো সক্রিয় ও জোরদার করে তোলা যায় সে জন্যে লক্ষ লক্ষ শিক্ষক এবং ততোধিক অভিভাবকের শিক্ষিত মতকে কেন্দ্রীভূত করে তোলা। এর ফলে শিক্ষানুরাগী বহু ব্যক্তিই শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকেন। ফলে নানা বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত হতে থাকে যাতে করে সমস্যার প্রকৃতিটি বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনার সহায়ক হয়। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বরে ন্যাশনাল এডুকেশন এ্যাসোসিয়েসন এবং ডিপার্টমেণ্ট অব সুপারিনটেণ্ডেন্স-এর সংযুক্ত চেষ্টায় পাঁচ বছরের জন্যে একটি শিক্ষানীতি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন সভা, সমিতি, আলোচনা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদি দ্বারা সমগ্রভাবে সমস্ত সমস্যাটি অনুধাবন করতে চেষ্টা করলেন এবং দীর্ঘকালস্থায়ী কার্যকরী সমাধান খুঁজতে লাগলেন। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল—

(১) শিক্ষাব্রতীদের সুচিন্তিত, সময়োপযোগী দীর্ঘ ভবিষ্যৎ উপযোগী প্ল্যানিংএ উদ্বুদ্ধ করে তোলা যাতে সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষা সুসমঞ্জস ও কার্যকরী হতে পারে।

(২) শিক্ষার বর্তমান অবস্থা অপক্ষপাত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আলোচনা করে তার স্বরূপ নির্ণয় এবং তার উপযুক্ত উন্নতি বিধানের জন্য কি ভাবে শিক্ষার আদর্শ, প্রণালী, সংগঠন ইত্যাদির পরিবর্তন করা উচিত সে সম্বন্ধে ধীর বিবেচনা।

(৩) শিক্ষার উন্নতির জন্যে বিভিন্ন দিক থেকে উৎকৃষ্ট সমস্ত সুপারিশ কি করে কার্যকরী করা যায় সে সম্বন্ধে বিবেচনা।

(৪) শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ প্রণালী ও সংগঠনের বিষয় যাতে দেশে বহুল প্রচারিত হয় সে ব্যবস্থা করা।

(৫) শিক্ষার উন্নয়ন কার্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা আকর্ষণ।

১৯১৫ সাল থেকেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতির সমর্থনে 'দি নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ' প্রতিষ্ঠান কাজ করে আসছিলেন। আমেরিকায় 'প্রগ্রেসিভ এডুকেশন মুভমেণ্ট' আন্তরিকভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক অনেক পরীক্ষামূলক কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের পরীক্ষা অনুযায়ী কিছু কিছু বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা বেশ সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। ক্রমে কিলপ্যাট্রিক্‌ ইত্যাদির প্রগতিবাদী আন্দোলন বেশ প্রবল হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধপন্থীরাও সরব হয়ে ওঠেন। ১৯৩৮ সালে এই দুই দলের ('প্রোগ্রেসিভস্‌' ও এসেন্সিয়ালিষ্টস্‌') মতের বৈপরীত্য প্রবল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। 'প্রোগ্রেসিভস্‌' দল ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ, শিক্ষায় গণতন্ত্রের ও মানবতার আদর্শ—ইত্যাদির উপর জোর দিতেন কিন্তু এসেন্সিয়ালিষ্টরা সরকারী নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষকের পরিচালনাধীন শিক্ষার্থীর বিকাশ, বিশিষ্ট আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ইত্যাদি সংকীর্ণতর আদর্শের সমর্থক। কিলপ্যাট্রিক্‌কে প্রথম দলের নির্ভীক প্রতিনিধি এবং উইলিয়ম ব্যাগুলার ব্যাগ্‌লী দ্বিতীয় মতের দৃঢ় প্রচারক।

শিক্ষায় প্রগতিবাদ আন্দোলন—শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী। একই সঙ্গে এই শিক্ষাদর্শ প্রাচীন পন্থার প্রতিবাদ ও নূতন দিনের স্বপ্ন ("is at once a protest and a vision")।

এ 'বাদে'র দিকে প্রথম যাঁরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর স্বাধীন ইচ্ছার মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী। তাঁরা শিশুকে অতিরিক্ত শাসন নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে। সহজেই বুঝা যায় এঁরা রুশো, পেসতালৎসী, ফ্রোএবেল এবং ষ্টান্‌লী হলের চিন্তা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। অবশ্য এঁদের চিন্তার মধ্যে গভীর সত্যের অঙ্কুর নিহিত আছে এবং বর্তমান কালে মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের অনেকেই শিশুর আত্মবিকাশের ধারায় বিশ্বাসী। তবে এ মতের বাড়াবাড়িও যথেষ্ট কুফলের জন্য দায়ী হতে পারে। শিশুর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার তাকে স্বৈরাচারী হবার অধিকার দেয় না। শিক্ষক শুধু দ্রষ্টা ও সাক্ষী হিসাবেই শিক্ষার্থীর মনস্তুষ্টি করে চলবেন এ আদর্শ সত্য হতেই পারে না। ডিউই ও কিল্‌প্যাট্রিক প্রগতি শিক্ষাবাদের এ বিপদ সম্পর্কে সচেতন নহেন বলা যায় না।

পূর্বের শিক্ষা ব্যবস্থায় অল্প কয়টি বিদ্যা ও কৌশলই শুধু ছাত্রদের শিক্ষাদানের বিষয় ছিল। শিক্ষার প্রণালীও ছিল নিতান্ত একঘেয়ে ও ধরাবাঁধা। সেখানে শিশুর বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অস্বীকৃত ছিল। কিন্তু প্রগতিবাদ শিশুর সামগ্রিক সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশেই বিশ্বাসী। তাই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে শিশুর শিক্ষার বিষয়বস্তু অনেক বেশী বিস্তৃততর এবং শিশুর ক্ষমতা ও আগ্রহের সঙ্গে তা যুক্ত। আর ব্যক্তিও একটি বিচ্ছিন্ন কেন্দ্র নয়। সমাজ জীবনের মধ্যেই তার সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব। কাজেই এ শিক্ষা কেবলই ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। সমাজ-ভিত্তিকও বটে। কিলপ্যাট্রিক ডিউইর মত এ সত্যটির উপর খুব জোর দিয়েছেন।

অর্থনৈতিক মন্দার ফলে দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দুর্গতি দেখা দিয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা জড়িয়ে পড়লে সে সঙ্কট তীব্রতর হয়ে পড়ে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিক সরকারী নিয়ন্ত্রণের (totalitarianism) দাবী প্রবলতর হতে থাকে। এ অবস্থায় ১৯৪১ সালে প্রোগ্রেসিভ এডুকেশন এ্যাসোসিয়েশন শিক্ষার উদ্দেশ্য আবারও স্পষ্ট করে প্রকাশ করে একটি রিপোর্ট ছাপেন (Progressive Education : Its Philosophy and challenge)। এই রিপোর্টে শিশুর নিজস্ব আগ্রহ, ক্ষমতা এবং বিকাশের স্বাভাবিক ধারাকেই একমাত্র শিক্ষার ভিত্তি বলে স্বীকার করা হয় নি আবার অন্য দিকে সুপরিকল্পিত ও পূর্ব নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোর মধ্যে কি করে শিশুর শিক্ষাকে সীমিত করা যায় সে চেষ্টাকেই শিক্ষা বলেও তাঁরা গ্রহণ করেন নি। অর্থাৎ একদিকে অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং অন্যদিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তির পরিপূর্ণ পরিচালন—এই দুইটি চরম উদ্দেশ্যকেই তাঁরা অস্বীকার করে এই দুই আদর্শের সুষ্ঠু সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পুষ্টিই শিক্ষা এবং অন্যান্য সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে গণতন্ত্র মানে এ নয় যে ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং নিজের খুসীমত যে যেমন ভাবে ইচ্ছা গড়ে উঠবেন। উল্লেখযোগ্য সুস্থ ব্যক্তিত্ব এমন ভাবে কেবল মাত্র ভিতর থেকে গড়ে ওঠে না। তা গড়ে ওঠে বহু ব্যক্তির সামাজিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে প্রাণপূর্ণ এবং ক্রমশঃ পরিপূর্ণতর সক্রিয় সহযোগিতা দ্বারা। সমস্ত ব্যক্তিই একই বৃহৎ উদ্দেশ্যে সামাজিক সংহতি ও পুষ্টি গড়ে তোলার জন্যে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে যখন উদ্যমশীল সহযোগিতায় রত হয় তখনই উল্লেখযোগ্য

ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সামাজিক উন্নতিও ঘটে। গণতান্ত্রিক সামাজিক ক্রিয়ার মাধ্যমেই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠে। তাই এ শিক্ষার দুটি দিক। একটি, ব্যক্তিত্ব বিকাশের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা, দ্বিতীয়টি, সহযোগিতাপূর্ণ সামাজিক ক্রিয়া ও উদ্যম। ব্যক্তিকে অস্বীকার করে বা পঙ্গু করে সুস্থ সমাজ গড়ে উঠতে পারে না, আবার সামাজিক দায়িত্ব ও সংহতি অস্বীকার করে বা বিঘ্নিত করে সুস্থ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বও গড়ে উঠতে পারে না। সবল ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যই সমস্ত সামাজিক আয়োজন। আর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ফল সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও বিকাশ।

যে শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবনের সুষ্ঠু ও সুসমঞ্জস বিকাশ হয় না তা সার্থক নয় এবং এমন শিক্ষায় সমাজেরও সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হয় না। সক্রেটিস থেকে ডিউই পর্যন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত পথিকৃৎই তাই শিক্ষার কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশকেই স্থান দিয়েছেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ শক্তি ও সামর্থ্যের সম্পূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ পাবে সার্থক শিক্ষাপদ্ধতিতে। সার্থক শিক্ষা তাই সম্পূর্ণ ব্যক্তিটিরই সম্যক প্রস্ফুটন। এ শিক্ষায় ব্যক্তির দেহ, মন, অনুভূতি, বুদ্ধি ও মূল্যবোধের বিশিষ্ট বিকাশ ঘটবে।

এ শিক্ষায় তাই সর্বপ্রকার গঠনমূলক শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবহার স্বীকৃত হয়েছে। শুধু মাত্র বুদ্ধির চর্চা বা দেহের চর্চাই নয়, সমগ্র ব্যক্তিত্বেরই চর্চা চাই। ব্যক্তির চর্চা সমাজের সাংস্কৃতিক কর্ম ও চিন্তার মধ্যেই সম্ভব। একক ও বিচ্ছিন্নভাবে তা সম্ভব নয়। সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক বিরোধের নয়, সহযোগিতার। সমাজের মধ্যে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল সমস্ত কর্ম ও চেষ্টাকেও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সমাজ মৃত ও স্থাণু নয়; তারও বিকাশ ও পরিবর্তন আছে। সেই পরিবর্তনশীল জীবন্ত সমাজজীবনের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

প্রগতিশীল শিক্ষাবাদীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুভূতি ও সৌন্দর্য, বুদ্ধি ও সুকুমার বৃত্তির বিকাশের উপর বুদ্ধিবৃদ্ধির বিকাশের মতই জোর দেন। বাস্তবিক পক্ষে দেহের বিকাশ, বুদ্ধির বিকাশ, অনুভূতির বিকাশ, স্বাধীন ইচ্ছা ও সামাজিক কর্তব্য বুদ্ধির বিকাশ—সবই এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে, গ্রন্থিতে আবদ্ধ। শিক্ষা তাই জীবনের একটা বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র নয়; এ সমগ্র বিকাশমান জীবনেরই বিচিত্র রূপ।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থোৎপাদনের সহায়করূপে বুদ্ধি, ক্ষমতা ও নিপুণতা বিকাশের যেমন মস্ত স্থান আছে তেমনি প্রয়োজন আছে খেলাধূলার, মানুষের সঙ্গে সানন্দে মেলামেশার, বিভিন্ন সৃজনকামী শিল্পকর্মে উৎসাহ ও অবসর বিনোদনের বিভিন্ন 'হবি'র চর্চার। তাই প্রগতিবাদী শিক্ষায় পড়া ও ছুটির মধ্যে কোন ব্যবধান কল্পনা করা হয় না। যেমন যত্ন করে ছাত্রদের লেখা পড়া শিখতে হয়, তেমনি যত্ন করেই শিখতে হয় কেমন করে ছুটি উপভোগ করতে হয়। দুটাই শিক্ষার অঙ্গ। এক অন্যের পরিপূরক। তাই প্রগতিবাদীদের শিক্ষার সংজ্ঞা এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু প্রচলিত 'শিক্ষা'র সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু থেকে অনেক বেশী ব্যাপক।

প্রগতিবাদীরা সক্রিয়তায় (dynamism) বিশ্বাসী। নিষ্ক্রিয় আনন্দলাভ (Passive enjoyment)-এর চেয়ে আরো আনন্দ দশজনের সঙ্গে সহযোগিতায় ; নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করতে হয় তাকে। ডিউই ও কিলপ্যাট্রিকের অনুগামীরা এর উচ্চতর মূল্য দেন। কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয় মুখস্থ করিয়ে দেওয়া বা কতকগুলি বাঁধাধরা অভ্যাস গঠন করিয়ে দেওয়াকেই তাঁরা শিক্ষা মনে করেন না।

শিক্ষার বিষয়বস্তু তাঁদের কাছে শুধুমাত্র বইপুস্তক নয়, জীবনের সমগ্র প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতাই শিক্ষার বিষয়বস্তু। শিক্ষায় যা শেখা হল তা জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে সক্রিয়ভাবে ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার পথকে প্রভাবিত করবে, তাকে সুগম করে তুলবে, সমৃদ্ধতর করবে।

কাজেই প্রাচীন পুস্তকপন্থীদের সঙ্গে এদের বিভেদ মৌলিক। প্রগতিবাদীরা বলেন শিক্ষার ক্ষেত্রে আগের থেকেই কতগুলি পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রম নির্দিষ্ট থাকবে, শিক্ষকেরা সেই বিষয়গুলিই ছাত্রদের কাছে পরিবেশন করবেন এবং ছাত্রেরা সে 'পড়া' কণ্ঠস্থ করে শিক্ষককে ফিরিয়ে দেবে। এই যে প্রাচীন শিক্ষারীতি এতে শিক্ষা ছাত্রদের নিজস্ব জিনিষ হতে পারে না। তাদের জীবনের সঙ্গে এমন শিক্ষার কোন সজীব যোগ থাকে না। ফলে পড়া শেখানোটা হয় পাখী পড়ানোর মত প্রাণহীন, পড়া শেখাটাও হয় নিতান্ত নীরস ও প্রাণহীন। কিলপ্যাট্রিক বলেন শিক্ষার বিষয়বস্তু জীবনের প্রবহমান ধারার সঙ্গে যুক্ত করেই শিশুর প্রকৃত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির রসে সজীব করে তুলতে হবে। তার মধ্যে থাকবে আবিষ্কারের বিস্ময়, আত্মানুশীলনের গৌরব এবং বহমান জীবন স্রোতের

উল্লাস। "The curriculum consists of both richness of living and all-aroundness of living. It includes 'distinction made, knowledge used, consideration for others sensed, responsibilities accepted."

প্রগতিবাদীরা শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য কখনও বিস্মৃত হন না; কাজেই শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে কতগুলি বিষয়ের (যেগুলি সকলের পক্ষেই উপযোগী) উপর জোর দেন; যথা, সাধারণ অঙ্ক, সাধারণ বিজ্ঞান, সাধারণ ভাষাশিক্ষা। প্রাথমিক স্তরে যে বিষয়গুলি নিতান্ত অপরিহার্য (Core Subjects) সেইগুলিই শুধু ছাত্রদের শেখান হয়। এর সবগুলি বিষয়ই সমাজের নিত্যপ্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত। মাধ্যমিক স্তরে নিত্য প্রয়োজনীয় সাধারণ বিষয়গুলি ছাড়াও ছাত্রদের আগ্রহ অনুযায়ী ঐচ্ছিক বিষয়ও থাকবে।

শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, আগ্রহ, রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী তার পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রম তৈরী করতে হবে, সেটা ধরাবাঁধা হবে না। যখনি শিক্ষার্থী কোন বিষয়কে আয়ত্ত করে তার জীবনের অঙ্গীভূত করে নেয় তখনই তাকে ভিত্তি করে নূতন বিষয়ক ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সে অগ্রসর হয়। কাজেই তার শিক্ষা কতগুলি বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়--তাদের মধ্যে একটি ঐক্য (continuity) এবং সমগ্রতা (relevency) থাকবে। শিশুর জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতাই কেন্দ্রীভূত ও মঙ্গল উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হবে।

কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষাই সবল ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব গঠনের পক্ষে যথেষ্ট নয়; বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যান্য সামাজিক, সাংস্কৃতিমূলক', অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার দ্বারাই এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। আমেরিকায় ছেলেদের অবসর সময় বিনোদন এবং অন্যান্য ধর্ম ও সাংস্কৃতিমূলক ক্রিয়া ও উদ্যমের কেন্দ্র হিসাবে Y. M. C. A. (Young Men's Christian Association) Y. W. C. A (Young Women's Christian Association) ইত্যাদি সুপরিচিত। ১৯৩৩ সালে আমেরিকায় কেন্দ্রীয় সরকার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্মহীন ছাত্রদের গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে সাহায্য ও দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করবার উদ্দেশ্যে C. C. C. (Civilian Conservation Corps) প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপ ভাবে দরিদ্র ছাত্রদের অবসর সময়ে কিছু কিছু কাজ দিয়ে তাদের পড়াশুনার

খরচ যাতে তারা চালাতে পারে সেজন্য ১৯৩৫ সালে N. Y. A. (National Youth Administration) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রগতিবাদী শিক্ষাবিদেরা এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা যাচ্ঞা করেন।

কিন্তু এ শিক্ষাবিদেরা জানেন প্রগতিবাদের সত্যে বিশ্বাসী সুশিক্ষিত শিক্ষক না পাওয়া গেলে সুশিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উপর তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে একটি আন্তরিক আদর্শবাদ আছে, তাই দেখা গেছে আমেরিকায় যখন শিক্ষকদের মাইনে কমিয়ে দেওয়া হ'ল ও কাজ বাড়ানো হ'ল, অধিকাংশ শিক্ষক এসব দুঃখ কষ্টের মধ্যেও শিক্ষার কাজ পরিত্যাগ করে যাননি। এমন কি এই দুর্দিনে শুধু তাঁরা কাজ চালিয়েই যান নি—এর মধ্যেও কি করে শিক্ষার আরো উন্নতি হতে পারে সে জন্য চিন্তা করেছেন।

প্রোগ্রেসিভ এডুকেশন এ্যাসোসিয়েশন অনেক বছর ধরেই শিক্ষকদের জন্য গ্রীষ্মের বন্ধে 'Summer workshop'-এর ব্যবস্থা করেছেন। এসব workshop-এ বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষকেরা একত্র হয়ে শিক্ষাসম্বন্ধীয় নির্দিষ্ট সমস্যার আলোচনা করেন এবং মতবিনিময় দ্বারা উপকৃত হন; শিক্ষকদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং শিক্ষকতা সম্পর্কে মর্যাদাবোধও বৃদ্ধি পায়।

সমস্ত দেশেই আজকাল শিক্ষার বিভিন্ন স্তর স্বীকৃত হয়। বিভিন্ন কর্তৃত্বাধীনে বিদ্যালয়ের কিণ্ডারগার্টেন, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কলেজ, ইউনিভারসিটি প্রভৃতি বিভাগ কতগুলি কারণে অনিবার্য হয়েছে। কিন্তু একটা বিপদ হয় এই যে, বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ছেদ থেকে যায় এবং শিক্ষার্থীকে এক স্তর থেকে নূতন আর এক স্তরে গিয়ে কিছুটা বিভ্রান্ত হতে হয়। প্রগতিবাদীরা শিক্ষার স্তরবিভাগ মোটামুটি স্বীকার করে নিলেও একথাটা স্মরণ করতে বলেন যে, শিশুর মনের বিকাশে এ রকম স্পষ্ট স্তর বিভাগ নেই। বিশেষ করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার কথা তারা বলেন। তা না হলে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। শ্রীযুত সুধীরঞ্জন দাস অনুরূপ কারণেই ভবিষ্যৎ বিশ্বভারতীর সঙ্গে শিক্ষাভবন, পাঠভবন ইত্যাদি প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের বিচ্ছেদে আপত্তি জানিয়েছেন; তাতে আদর্শের ও ঐতিহ্যের ঐক্য বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকে। এ নিয়ে প্রোগ্রেসিভ

এডুকেশন এ্যাসোসিয়েসন ১৯৩২ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত কতগুলি পরীক্ষা করেন ; তাতে এ জাতীয় স্পষ্ট বিচ্ছেদের পরিবর্তে অধিকতর স্বাধীনতায় বেশী ভাল ফল দেখা গিয়েছে।

প্রগতিবাদীরা বিদ্যালয়কে সমাজজীবনের অচ্ছেদ্য অংশ বলেই মনে করেন। সুতরাং সমাজজীবনের সঙ্গে বিদ্যালয় যাতে ঘনিষ্ঠতর বন্ধনে যুক্ত হয় সে চেষ্টা তারা করে থাকে, এজন্যে তারা 'কম্যুনিটি স্কুল'—গঠনের পক্ষপাতী। সমাজের সকলেরই স্কুলের সঙ্গে কিছু না কিছু যোগ থাকেই এবং নিজেদের সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাবকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। শিক্ষক ও অভি-ভাবকের সহযোগিতা বৃদ্ধি শিশুশিক্ষার পক্ষে সবদাই মঙ্গলজনক। এতে শিশুর জীবনে 'স্কুল' ও 'বাড়ী' এই দুইয়ের বিভেদ ও বৈরিতা দূর হয়ে তার শিক্ষার কাজ সহজতর হয়।

শিক্ষার প্রণালীর বেলায় আলাদা আলাদা করে ছাত্রদের পড়া ও কাজ বিচ্ছিন্ন করা হয় না। গোড়া থেকেই দল বেধে কাজ করার মধ্য দিয়েই ছাত্রদের শিক্ষায় উৎসাহী করে তোলা হয় ; এর মধ্য দিয়েই বিভিন্ন ছাত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবার অবসর পায়। দশটি ছেলেমেয়ের উপর বাগান করার ভার দেওয়া হ'ল। জমি তারাই বাছল, পরামর্শ করে বাগানের আকার, কি কি গাছ হবে ইত্যাদি তারা ঠিক করবে। শিক্ষক মহাশয় থাকবেন তাদের একজন বন্ধু হিসাবে—তিনি পরামর্শ দেবেন, এ বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন বই থেকে তাদের পড়ে শোনাবেন, বিভিন্ন গাছ, ফল ইত্যাদির ছবি দেখাবেন বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার তাদের শেখাবেন, বিভিন্ন সারের কোনটায় কি কাজ তা বুঝিয়ে দেবেন তবে বাগানটি মাষ্টারমশাই করে দেবেন না, এটা ওই ছাত্রদলেরই বিশেষ সম্পত্তি হবে। এ হচ্ছে (প্রজেক্ট মেথড)—কর্মকেন্দ্রিক উদ্দেশ্যমুখী শিক্ষা। এতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যেমন স্থান আছে, তেমনি সংঘবদ্ধতারও প্রয়োজন আছে। সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুসমন্বিত সমাজচেতনতা সম্পন্ন সজীব ব্যক্তিত্ব গঠন।

কিল্‌প্যাট্রিক্‌ বলেন শিক্ষা একটি অবিভাজ্য অভিজ্ঞতার জীবন্ত বিকাশ ও পুষ্টি (Learning is one whole experience, a single thing that branches and grows)। অভিজ্ঞতা জীবনকে সমৃদ্ধতর করবার কাজেই লাগাতে হবে। প্রত্যেক অভিজ্ঞতা পূর্বের অভিজ্ঞতার ফলকে বহন করে এবং নূতনতর অভিজ্ঞতার দিকে ব্যক্তিকে অগ্রসর করিয়ে দেয়। আগ্রহ ও উৎসাহ

যেখানে নেই সেখানে অভিজ্ঞতাও অপুষ্ট! শিক্ষার ক্ষেত্রে তার দাম নেই। শিক্ষার্থীর উৎসাহ সৃষ্টি দ্বারা তার অভিজ্ঞতাকে সতেজ ও উদ্দেশ্যমুখী করার দায়িত্ব শিক্ষকের। উদ্দেশ্যমুখী সামাজিক অভিজ্ঞতা দ্বারাই চরিত্র সৃষ্টি হয়। এটা শুধু বাইরের উপদেশ থেকে হতে পারে না। কিল্‌প্যাট্রিক্‌ তাই বলেন "I learn each response in the degree that I feel it or count important, and also in those that it inter-relates itself with what I already know. All that I thus learn I build at once into character..........The presence of interest or purpose constitutes a favourable condition for learning. Interest and felt purpose mean that the learner faces a situation in which he is concerned. The purpose as aim guides his thought and effort. Because of his interest and concern he gets more wholeheartedly into action ; he puts forth more effort ; what he learns has accordingly more importance to him and probably more meaningful connections. From both counts he is better learned. "*

প্রগতিশীল শিক্ষায় শিক্ষকের শিক্ষার্থীর মনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা অপরিহার্য। তার ব্যক্তিত্বের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল বলেই তার অভিজ্ঞতা যাতে সার্থক কেন্দ্রীভূত ও মঙ্গলাভিমুখী হয় সেদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। এ শিক্ষায় বাইরের থেকে চাপানো শাসন তাড়নের স্থান নেই। সমাজ-কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করাটাই শিক্ষকের কাজ; সে সচেতনতাই শিক্ষার্থীকে অশুভ থেকে রক্ষা করবে। সে কাজ অন্য দশ জনের কাছে বিরক্তিকর ও ক্ষতি-কর তার জাগ্রত সামাজিক বুদ্ধিই তাকে তেমন কাজ থেকে বিরত করবে। ছাত্রেরা যাতে এই আত্মশাসনে অভ্যস্ত হয় শিক্ষক সেদিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখেন। কাজেই শিক্ষকের দায়িত্ব এখানে সাধারণ বিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক বেশী। শুধু কিছু পড়া বলে দিয়ে এবং শাস্তি দিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ হয় না। তাঁকে সর্বদাই দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে ছাত্রেরা এমন অভিজ্ঞতাই শুধু লাভ করে যা সার্থক শিক্ষার উপাদানে পরিণত হতে পারে।

---

* W. H. Kilpatrick—"The Case for Progressivism in Education," The Journal of the National Education Association, Vol. 30, Nov. 8, No. 1941. P. P. 231-32.

এ প্রবন্ধের প্রায় সমস্ত উপাদানই E. H. Wilds এর "Foundations of Modern Education" গ্রন্থ হইতে নেওয়া হইয়াছে।

কিল্‌প্যাট্রিকের শিক্ষানীতি প্রত্যেক প্রগতিশীল শিক্ষকের শ্রদ্ধা ও গভীর অভিনিবেশের বিষয় হওয়া কর্তব্য।

এটা সহজেই বোঝা যায় এ প্রগতিশীল আদর্শবাদ অনুযায়ী শিক্ষা সহজ নয়। উপযুক্ত দায়িত্বশীল ও মমত্ববোধপূর্ণ শিক্ষক এ শিক্ষা পরিচালনায় না থাকলে এ শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাবে। ছাত্রদের স্বাধীনতা ও দায়িত্ব দিয়ে শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে গণতন্ত্রে বাস্তবিক বিশ্বাসী হতে হবে এবং শিক্ষককে ছাত্রদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধালাভ করতে হবে। শিক্ষক উপযুক্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন না হ'লে ছাত্রদের স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হতে পারে এ আশংকা সর্বদাই থাকে।

শিক্ষক ভুলিও না—প্রাচীন ভারতের শিক্ষক কুলের অপূর্ব ঐতিহ্যের তুমি অধিকারী, জাতিগঠনের যে গুরু দায়িত্ব তুমি স্কন্ধে লইয়াছ শত অভাব অনটনের মধ্যেও নিষ্ঠার সহিত তাহা পালন কর। বিশ্বাস কর, স্বাধীন ভারতে আজ তোমার ত্যাগের উপযুক্ত মূল্য ও মর্যাদা প্রদানের দিন আসিয়াছে।

মানুষ ইমান্যুয়েল কাণ্ট

সম্রাট শাহ্‌জাহানকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছিলেন "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"। কিন্তু অধিকাংশ লেখকদের সম্বন্ধে ইহার বিপরীতটাই সত্য। বহু লেখক তাঁহাদের লেখনী মুখে যে উচ্চভাব প্রচার করেন, তাহা তাঁহাদের জীবনে প্রায়শঃ প্রতিফলিত হয় না। মুষ্টিমেয় সামান্য কয়েকজন মানুষের সম্পর্কেই এ কথা বলা চলে, "আমার জীবনই আমার বাণী"। সকলেই জানেন একথা মহাত্মা গান্ধীজীর। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আবার বিপরীত করিয়াই বলা চলে "আমার বাণীই আমার জীবন"—অর্থাৎ কবি তাঁহার জীবনে তাঁহার কাব্যকেই যেন মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। বর্তমান যুগে ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমান্যুয়েল কাণ্ট সম্পর্কেও একথা বলা চলে, তাঁহার দর্শনের মূর্ত্ত রূপ, তাঁহার জীবন।

কাণ্টের মতে মানুষের স্বরূপ হইতেছে যে সে বুদ্ধি ও বিচারচালিত জীব। অন্ধ আবেগ আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি মানুষের একটি ইতর সত্তার প্রকাশ। মানুষ সেই পরিমাণেই সত্যিকারের মানুষ, যেই পরিমাণে বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা সে নিজ বাক্য, চিন্তা ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। বুদ্ধি ও বিচার মানুষের স্ব-ভাব। যেখানে মানুষ আবেগ দ্বারা চালিত, সেখানে সে অসুস্থ,—আপন স্ব-ভাব হইতে বিচ্যুত। প্রত্যেক বস্তুর আদর্শ নিজ স্ব-ভাবে পূর্ণ বিকশিত হওয়া। জলের আদর্শ যে তাহা স্বচ্ছ, সুশীতল ও সুপেয় হইবে। আর আগুনের আদর্শ তাহা আলো দিবে, দহন করিবে, নির্মল করিবে। বাঘের জন্য অহিংসার আদর্শ নির্দেশ বৃথা। সেই আদর্শ বাঘ, যে জীবিত পশুর সন্ধানে রক্তলোলুপ হইয়া অরণ্যে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে। তাহাকে বন্দী করিয়া, নগরের সজ্জিত পশুশালায়, জনগণের করুণাদৃষ্টির বস্তু করিলে তাহার আদর্শের অবমাননাই করা হয়! তেমনি, মানুষের ইহাই শ্রেষ্ঠ পরিচয়, যে সে বুদ্ধিদ্বারা নিজ কর্তব্য স্থির করিয়া, তাহা অবিচল চিত্তে পালন করিবে। এই কর্তব্য পালনে কর্তব্যবুদ্ধিই তাহাকে চালিত করিবে—Duty for duty's sake। নিজ স্বার্থ, লাভের প্রলোভন, ক্ষতির আশংকা, এই সমস্তের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া অবিচল চিত্তে কর্তব্য করিতে হইবে।—'বিশ্বজগৎ যদি চূর্ণ হইয়াও যায়—তবুও তোমার কর্তব্য করিয়া যাও কারণ ইহাই তোমার স্ব ভাব, স্বরূপ।' ইহাই হইতেছে—কাণ্টের নীতি-চিন্তার (ethical thought) মূল কথা। যাহা কর্তব্য, তাহাই সত্য—কারণ মানুষের স্বরূপ যে বুদ্ধি ইহা তাহারই অমোঘ আদেশ (categorical imperative)। আর যাহা সত্য, তাহা সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস, ধ্রুব, সর্বজনগ্রাহ্য। ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই (it knows no exceptions)। কোন ছল ছুতা দ্বারাই ইহাকে লংঘন করা চলিবে না। কাণ্টের চিন্তানুযায়ী,—যাহা সত্য, তাহাই শিব—যাহা শিব, তাহাই সত্য।

মানুষ কাণ্টের জীবন তাঁহার দর্শনেরই প্রতিফলন। তাঁহার একটি সম্পূর্ণ দিনের দিনপঞ্জী আলোচনা করিলেই এ কথাটি পরিস্ফুট হইবে। তাঁহার দীর্ঘজীবনের প্রতিটি দিন তিনি এই একই দিনপঞ্জী অনুসরণ করিয়াছেন—ইহার কোন ব্যতিক্রম কখনো ঘটে নাই। অদ্ভুত এই জ্ঞান-তপস্বীর নিয়ম-নিষ্ঠা—পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।

ইমানুয়েল কাণ্ট জার্মানীর অন্তর্গত ছোট সহর কোয়েনিৎসবার্গে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অগাধ ছিল তাঁহার পাণ্ডিত্য, বিশ্ববিশ্রুত তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই সহর ছাড়িয়া ত্রিশ মাইলের বেশী দূরে তিনি কোথায়ও কখনও যান নাই। তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন না, রোগা, খাটো—তাঁহার উচ্চতা পাঁচ ফিটের বেশী ছিল না। অথচ এমনি ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব, যে তিনি সকলের সম্ভ্রম আকর্ষণ করিতেন। তিনি কোনদিন বিবাহে প্রলুব্ধ হন নাই। তিনি মনে করিতেন বিবাহ করিলেই নানা আবেগ আকাঙ্ক্ষা মানুষের বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বভাবগত স্বাধীনতা বিপন্ন করে। তাঁহার গৃহকর্ম পরিচালনের জন্য ছিল তাঁহার পুরাতন ভৃত্য ল্যাম্পে (Lampe)। এই প্রভুভক্ত ভৃত্যটি আপনভোলা দার্শনিকের সুখ সুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত এবং সমস্ত বিপদ আপদ হইতে প্রভুকে রক্ষা করিত। এমনি আবেগশূন্য ও নিয়মিত ছিল কান্টের জীবন, যে স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁহাকে বলিত 'কোয়েনিংস্‌-বার্গের নির্ভুল ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ঘড়ি।' জার্মানীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি হাইনে (Heine) লিখিয়াছেন "আমি বিশ্বাস করি না কোয়েনিংসবার্গ ক্যাথিড্রালের ঘড়িটি তাহার স্বদেশবাসী ইম্যানুয়েল্ কান্টের চেয়ে অধিকতর নিস্পৃহ ও নির্ভুলভাবে নিয়মিত কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিত।" বাস্তবিক পক্ষে কিম্বদন্তী আছে যে যখন কান্ট সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইতেন তখন তাঁহাকে দেখিয়া কোয়েনিংস্‌বার্গের অধিবাসীরা ঘড়ির সময় মিলাইয়া নিতেন।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সমস্ত ঋতুতেই বিশ্বস্ত ভৃত্য ল্যাম্পে ঠিক ভোর পাঁচটা বাজিবার পাঁচ মিনিট আগে চীৎকার করিয়া তাঁহার প্রভুকে ডাকিয়া বলিত, "অধ্যাপক মহাশয়, সময় হইয়াছে।" তৎক্ষণাৎ কান্ট শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িতেন এবং কাঁটায় কাঁটায় ঠিক পাঁচটার সময় তিনি প্রাতঃকালের জন্য টেবিলে আসিয়া বসিতেন। তাঁহার খাদ্য ও পানীয় ছিল নিতান্তই সাদাসিধে ধরণের। সকালে তিনি এককাপ কফি ও সামান্য কিছু খাবার খাইতেন। এবং তার পর পাইপে ধূমপান করিতেন। এ সময় তিনি নিঃসঙ্গ থাকিতেই ভালবাসিতেন। একদা তাঁহার প্রিয়ছাত্র ওয়াসিয়ানস্কির (Wasianski) মনে হইল প্রাতরাশের সময় তিনি উপস্থিত থাকিলে অধ্যাপক মহাশয়ের হয়তো কিছু ভাল লাগিবে। এই মনে করিয়া তিনি একদিন প্রাতে দার্শনিকপ্রবরের প্রাতরাশের টেবিলে তাঁহার কাছে বসিলেন। কিন্তু কান্ট ইহাতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন এবং শেষে বলিয়াই ফেলিলেন, "দেখ, তুমি

কিছু মনে করিও না, কিন্তু অর্ধশতাব্দীর উপরের আমার এই অভ্যাস, প্রাতরাশ কালে নিঃসঙ্গ থাকিয়া চিন্তায় মগ্ন থাকা। এই অভ্যাস পরিবর্তন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার কথায় মনে দুঃখ পাইও না, কিন্তু তোমার উপস্থিতি আমার নীরব চিন্তায় বিঘ্ন ঘটাইতেছে। কাজেই তোমাকে বিনীত অনুরোধ করি, তুমি বাবা, চলিয়া যাও।" ওয়াসিয়ানস্কি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলেন। ভৃত্য ল্যাম্পেও পাশের ঘরে প্রচ্ছন্ন রহিল এবং অল্পকালের মধ্যেই দার্শনিকের মানসিক প্রশান্তি ফিরিয়া আসিল।

প্রাতরাশের পরেই কাণ্ট তাঁহার পড়ার ঘরে গিয়া বসিতেন এবং সাতটা বাজিবার পাঁচ মিনিট আগে পর্যন্ত নিবিড় অধ্যয়নে মগ্ন থাকিতেন; স্বভাবতই দর্শনবিষয়ক পুস্তকেই তাঁহার অধিক রুচি ছিল। কিন্তু তিনি বিজ্ঞান, ইতিহাস ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বিষয়ও গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কখনও কখনও তিনি আবার আবৃত্তি করিতেন। ইহা খুব আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁহার রুচি ও মানসিক গঠনের সম্পূর্ণ বিপরীত আবেগ-প্রধান রুশোর (Rousseau) শিক্ষা সম্পর্কে বিখ্যাত গ্রন্থ 'Emile' তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। সমস্ত বিষয়ে নির্ভুলতা তিনি দাবী করিতেন। কাজেই ভুল উচ্চারণ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। কাণ্ট 'হারটুঙ্গ্‌স্ জার্নাল' নামে একটি দ্বিসাপ্তাহিক পত্রিকা রাখিতেন। পত্রিকাটি আসিলেই ভৃত্য ল্যাম্পে ক্যাণ্টের হাতে পত্রিকাটি দিয়া বলিত, "হার্টম্যানস্ জার্নাল্ আসিয়াছে, নিন্।" ইহাতে কাণ্টের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত, তিনি বলিতেন" "তুমি এটা কি বলিতেছ? এ পত্রিকার নাম হারটুঙ্গ্‌স্ জার্নাল—'হার্টম্যানস্ জার্নাল' নয়।" তিন-বার তাহাকে দিয়া বলাইতেন, 'হারটুঙ্গ্‌স্ জার্নাল' 'হার্টম্যানস্ জার্নাল' নয়'। কিন্তু বুদ্ধিহীন ল্যাম্পে তিনদিন পরে আবার যখন পত্রিকাটি আসিত তখন তাহা কাণ্টের হাতে দিয়া বলিত "হার্টম্যানস্ জার্নাল আসিয়াছে,' নিন্।" আবারও কাণ্ট বিরক্ত হইয়া তাহার ভুল সংশোধন করিতেন। কিন্তু ফল একই হইত। কাণ্টও কখনও ভুল সংশোধনে নিরস্ত হইতেন না। বৎসরে ১০৪ বার এই নাটকীয় দৃশ্য পুনরাবৃত্ত হইত! ঠিক সাতটার সময় তিনি নিজ পাঠগৃহ ছাড়িয়া সোজা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিয়া যাইতেন। সেকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যূষেই পঠন পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। ঠিক ৯টা পর্যন্ত কাণ্ট তর্কশাস্ত্র ও অধিবিদ্যা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। উঁচু ডেস্কের সামনে দাঁড়াইয়া

তিনি পড়াইতেন। ছোট মানুষটি, কেবল তাঁহার মাথাটুকুই ছাত্রেরা দেখিতে পারিত। তাহা ছাড়া তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল ক্ষীণ, আর আবেগ ও বাগ্মিতার ঔজ্জ্বল্যও ছিল না তাঁহার বক্তৃতায়। কিন্তু এমনি ছিল তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি, যে ছাত্রেরা তাঁহার এই সকল দোষ সত্ত্বেও অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে তাঁহার বক্তৃতা নীরবে শুনিত। কাণ্ট নিজ শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বলিতেন "আমার বক্তৃতার উদ্দেশ্য মাঝারী বুদ্ধি সাধারণ ছাত্রের দল। যাহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাহারা নিজের চেষ্টায়ই বিষয়টি আয়ত্ত করিতে পারে আর যাহারা নিতান্তই ক্ষীণবুদ্ধি, তাহাদের জন্য চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম।" অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষেই কিন্তু কাণ্টের আলোচনা অধিগত করা সম্ভব হইত না। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে একজন বলিয়াছেন "তিনি আমাদের তটরেখাহীন অসীম সমুদ্রের উপর পালহীন তরণীতে বহন করিয়া নিতেন।" আর একজন বলিয়াছেন "গভীর হইতে গভীরতর বিষয়ে তিনি কম এবং আরো কম আলোচনা করিতেন এবং সামান্য হইতে সামান্যতর বিষয়ে ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন।"

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি লেখার টেবিলে বসিতেন এবং বেলা ১টা অবধি তিনি তাঁহার দার্শনিক চিন্তা লিপিবদ্ধ করিতেন।

ইয়োরোপের দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি যুগান্তর আনিয়াছেন এবং তিনি নিজে ইহাকে জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে কোপার্নিকাসের মতবাদ যে বিপ্লব (Copernican revolution) সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। পূর্বপ্রচলিত টলেমীর (Ptolemy) মতানুসারে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে; কিন্তু কোপার্নিকাস্ প্রমাণ করিলেন যে, পৃথিবীই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। বস্তুবাদী সাধারণ মানুষের মতে বহির্জগৎই আমাদের জ্ঞানের রূপ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। গাছের পাতায় সবুজ রং আছে বলিয়াই আমাদের জ্ঞান জন্মে যে গাছের পাতা সবুজ। কাণ্ট উল্টাইয়া বলিলেন আমাদের বোধির নিজস্ব ও জন্মগত কতগুলি আকার ও গুণ (forms and categories) আছে, তাহার মধ্য দিয়াই বহির্জগতের বিচ্ছিন্ন সংবেদনকে (the manifold of intuitions) সে একত্র ও তাৎপর্য্যপূর্ণ করিয়া দেখে। রং সম্বন্ধে অপৃথক সংবেদন গাছের পাতা হইতে পাই বটে, কিন্তু আমাদের বোধির চশমার মধ্য দিয়া তাহাকে আমরা রাঙাইয়া দেখি। তাই তিনি বলিলেন বহিঃপ্রকৃতিকে রূপ দেয়

অন্তরের বোধি—understanding maketh nature। ক্যাণ্টের পূর্বে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ প্রচলিত ছিল। প্রথমটি ছিল এই যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ (a priori), সমস্ত সত্য ও সার্বভৌমিক জ্ঞানের মূল বোধিজনিত ভাব বা idea। সমস্ত জ্ঞান অন্তর হইতেই উৎসারিত। এই অন্তঃস্থিতভাব-বাদের (doctrine of innate ideas) প্রচারক ছিলেন দেকার্তে, যাহার পরিপূর্ণ বিকাশ পরবর্তীকালে বার্কলের বিজ্ঞান বাদে (Subjective Idealism)। এই মতবাদ বহির্জগতের নিজস্ব অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বলে যাহা জ্ঞাতার জ্ঞান বা ভাবের মধ্যে নাই, তাহার কোন অস্তিত্বই নাই (esse est percipi)। ইহার বিপরীত মতবাদের স্রষ্টা হইলেন লক্ (Locke)। তিনি বলিলেন সমস্ত জ্ঞানের মূল হইতেছে বহির্জগৎ-নির্ভর অভিজ্ঞতা,—'there is nothing in the mind which was not previously in the sense': all knowledge is a posteriori.' আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে মন গ্রহীতামাত্র (a passive receipient)। মন বা বোধি নিজে কোন জ্ঞান দান করে না। লক্ ও বার্কলের চিন্তার সূত্র ধরিয়া হিউম্ এক বিষম সিদ্ধান্তে পৌছিলেন। তাহা হইল যে বস্তুজগতের যেমন কোন অস্তিত্ব নাই, তেমনি মনেরও কোন অস্তিত্ব নাই। অস্তিত্ব আছে শুধু বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা স্রোতের! এই সন্দেহবাদ (utter scepticism) সত্য হইলে জ্ঞান অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। যদি জ্ঞাতা (subject) এবং জ্ঞেয় (object) এই দুইই মিথ্যা হয়, তবে কে বা জানিবে, কীই বা জানিবে? এ বিষম মতবাদ যখন ইয়োরোপের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়াছে, তখন ত্রাণকর্তারূপে দেখা দিলেন কাণ্ট। তিনি এই দুই বিপরীত মতবাদের সমন্বয় করিলেন। তিনি বলিলেন জ্ঞান নিরালম্ব হইতে পারে না, তাহার বস্তুগত ভিত্তি (material basis) চাই। জ্ঞানের এই উপাদান অভিজ্ঞতা দ্বারাই আহৃত, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে না কারণ জ্ঞানের আকারগত ভিত্তি (formal basis) ও চাই। জ্ঞানের যে আকার (যেমন দেশকাল সম্বন্ধ, দ্রব্যগুণসম্বন্ধ, কার্যকারণ সম্বন্ধ) তাহা অভিজ্ঞতা-লব্ধ নয়, তাহা নিতান্তই বোধির নিজস্ব ও অন্তঃস্থিত (subjective and innate)। অভিজ্ঞতা যে রূপহীন বিশৃংখল উপাদান (raw materials) আনিয়া দেয় বোধি তাহাকে দেশ, কাল, দ্রব্য, গুণ, কার্য, কারণ ইত্যাদি নিজস্ব ছাঁচে ফেলিয়া সুশৃংখল ও তাৎপর্যপূর্ণ করিয়া তোলে। কাজেই জ্ঞান হইতে

হইলে একদিকে অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুপুঞ্জ চাই; অন্যদিকে শৃংখলাপটু, শিল্পী গৃহিণী মনও চাই। এইভাবে তিনি হিউমের সম্পূর্ণ অবিশ্বাসবাদকে পরাভূত করিয়া দুইটি বিপরীত মতবাদের সমন্বয় সাধন করিলেন, এবং জ্ঞানের সম্ভাব্যতা প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু তাঁহার মতবাদ পার্থিব জ্ঞান সম্ভব বলিয়া প্রমাণ করিলেও, বহির্জগৎ, আত্মা ও ভগবান সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান (philosophical knowledge) অসম্ভব বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া নূতন এক অবিশ্বাসবাদের ভিত্তি স্থাপন করিল। তাহার মতে জ্ঞান হইতে হইলে আমাদের বোধির নিজস্ব ছাঁচে অভিজ্ঞতার উপাদানকে ঢালিয়া সাজিতে হইবে। কিন্তু দেশ, কাল, দ্রব্য-গুণ, কার্য্য-কারণ, এ সম্বন্ধগুলি তো বোধির নিজস্ব সৃষ্টি (subjective), এগুলি তো বস্তুগত (objective) নয়। দেশ-কাল ইত্যাদি সম্বন্ধ-বাস্তব জগতের সম্বন্ধ নয়। কাজেই বোধি-আরোপিত এই সমস্ত সম্বন্ধ-ব্যতিরিক্ত জগৎ, আত্মা, ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জানিবার কোন উপায় আমাদের নাই। বিশুদ্ধ বোধি (pure understanding) দ্বারা অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত সৎ বস্তুর (Reality) স্বরূপ নির্দেশের চেষ্টা করিলে আমরা কেবলই অন্তহীন স্ববিরোধিতার (antinomies) মধ্যে জড়াইয়া পড়িব। কাজেই বুদ্ধির দ্বারা জগৎ, আত্মা ও ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ কখনও জানা যাইতে পারে না। কাণ্ট তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত ও বিষম দুর্বোধ্য গ্রন্থ Critique of Pure Reason এ উপরোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি অনেক সময় তাহার দার্শনিক চিন্তার বিষয় তাঁহার ভৃত্য ও সহচর ল্যাম্পের কাছে বলিতেন। তাঁহার এই পুরাতন ভৃত্যের বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল, এমন খ্যাতি নাই। কিন্তু সাধারণ মানুষের সহজ বুদ্ধি দিয়া এটুকু সে বুঝিয়াছিল যে তাহার প্রভুর চিন্তার নির্গলিতার্থ ইহাই দাঁড়ায় যে জগৎ, আত্মা ও ভগবান নাই। আর থাকিলেও তাহা জানিবার উপায় মানুষের নাই। ইহাতে এই প্রাচীনপন্থী সরল মানুষটি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল যে এতবড় বিদ্বান ব্যক্তি হইয়া এমন অসম্ভব সিদ্ধান্ত তাহার প্রভু কি করিয়া করিলেন? জনশ্রুতি আছে বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্যের এই ক্ষোভ পণ্ডিত কাণ্টকে বিচলিত করিল এবং তিনি নূতন চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন, যাহার ফল তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থ Critique of Practical Reason। ইহাতে তিনি পূর্ব চিন্তার ধারা অনুসরণ করিয়া বলিলেন যে শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা আমরা জগৎ, আত্মা ও

ভগবানের স্বরূপ জানিতে পারি না। কিন্তু বিশুদ্ধ বুদ্ধির চেয়েও উচ্চতর এক বৃত্তি বা সংস্কার আমাদের মজ্জাগত, এবং সেই সংস্কার আমরা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না। ইহার নাম Practical Reason এবং তাহা আমাদের জগৎ, আত্মা ও ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য করে। নীতি-বুদ্ধি আছে বলিয়াই মানুষ পশু হইতে পৃথক, এবং এই নীতিবুদ্ধির উৎস ও আধার হিসাবে, সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ এক ভগবৎসত্তায় আমাদের বিশ্বাস করিতেই হইবে। ইহাও যুক্তিরই নির্দেশ; যদিও এ যুক্তি বা বুদ্ধি নীরস তর্কসর্বস্ব নয়। এ যুক্তির স্থান মস্তিষ্কে নয়, মানুষের হৃদয়ে। জনশ্রুতি সত্য হইলে ইহা বলিতে হইবে যে, ল্যাম্পে পৃথিবীর একটি মহদুপকার সাধন করিয়া গিয়াছে। ল্যাম্পের ক্ষোভের তাড়না পিছনে না থাকিলে দার্শনিক কাণ্টের এই নূতন ও উর্বর চিন্তাধারা হইতে পৃথিবী বঞ্চিত হইত।

কিন্তু নিজ বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে কাণ্ট অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। তিনি ছাত্রদের বলিতেন "দর্শন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শিক্ষাদান আমার কর্তব্য নয়, আমার কর্তব্য কি ভাবে দার্শনিক চিন্তা করিতে হয়, তাহাই শিক্ষা দেওয়া। তোমরা আমার চিন্তার পুনরাবৃত্তি করিবে তাহা আমি চাই না। তোমরা নিজে চিন্তা কর, স্বাধীনভাবে নিজ পায়ের উপর দাঁড়াও।"

আবার আমরা দার্শনিক কাণ্টের অভ্যস্ত জীবন যাত্রায় ফিরিয়া যাইতেছি। ঠিক একটার সময় তিনি পড়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্বিপ্রহরের আহারে বসিতেন। এই একবারই তিনি পরিপূর্ণ আহার করিতেন। আহারের পর বিকাল ৪½ টা পর্যন্ত তিনি আর লেখাপড়া করিতেন না। ইহা ছিল তাঁহার বিশ্রামের সময়। তাঁহার অভ্যাস ছিল, এই দ্বিপ্রহরের আহারের সময় পাঁচ-জন অতিথিকে খাবার টেবিলে নিমন্ত্রণ করা। যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইতেন তাঁহাদের মধ্যে সরকারী কর্মচারী, অধ্যাপক, ধর্মযাজক, ছাত্র, লেখাপড়া বিষয়ে আগ্রহশীল ব্যবসায়ী ইত্যাদি জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রের মানুষই থাকিতেন। একই অতিথি প্রত্যহ নিমন্ত্রিত হইতেন না। কাজেই পালাক্রমে ছোট্ট সহর কোয়েনিৎসবার্গের সমস্ত সভ্য ব্যক্তিই কাণ্টের গৃহে নিমন্ত্রিত হইতেন। কাণ্ট ভদ্র ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন এবং অতিথিরা যাহাতে নিঃসঙ্কোচে এবং তৃপ্তিপূর্বক আহার করেন, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। এ সময়ে নানা গল্পগুজব হইত। কিন্তু যে জন্য তাঁহার অতিথিরা এই নিমন্ত্রণকে দুর্লভ সম্মান বলিয়া গণ্য করিতেন তাহা হইতেছে,—এ সময়ে কাণ্ট নানা বিষয়ে

আলোচনা করিতেন এবং এ আলোচনা অনেক সময়ই অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও বুদ্ধিদীপ্ত হইত। কিন্তু দুইটি ব্যক্তিগত বিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল, এক হইল তাহার নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ, আর দ্বিতীয় হইল তাঁহার চিরকৌমার্য। আর এক বিষয়েও তিনি কড়া ছিলেন। অতিথিদের ঠিক সময়ে আসা চাই। যে কোন অতিথি যথাসময়ে না আসিলে ভবিষ্যতে তাহার জন্য কাণ্টের গৃহের দ্বার চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইত। অনিয়ম তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না।

ঠিক সাড়ে চারিটা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ছিল তাঁহার নিয়মিত ভ্রমণের সময়। এ সময়ে তিনি কাহারও সঙ্গ পছন্দ করিতেন না। নীরবে চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। তাঁহার ভ্রমণের পথ ও দূরত্ব সুনির্দিষ্ট ছিল। হাইনে ইহার বিবরণ দিয়াছেন "যখন প্রতিবেশীরা দেখিত ধূসর রংয়ের কোট পরিয়া হাতে বেতের লাঠি নিয়া কাণ্ট তাঁহার দরজা হইতে বাহির হইলেন, তখনি তাঁহারা জানিতেন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটা বাজিয়াছে।" তিনি ধীরে অগ্রসর হইয়া লাইম্‌গাছ আচ্ছাদিত রাস্তা দিয়া হাঁটিতে সুরু করিতেন। সে রাস্তাটি তাঁহার স্মৃতি বহন করিয়া দার্শনিকের ভ্রমণপথ (the philosopher's walk) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে দিন আবহাওয়া প্রতিকূল থাকিত সে দিন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভৃত্য ল্যাম্পে একটি বৃহৎ ছত্র নিয়া উদ্বিগ্ন মুখে, বিধাতা পুরুষের প্রতিমূর্তি-সম প্রভুকে অনুসরণ করিত। রোদ, ঝড়, বৃষ্টি কিছুতেই তাঁহার এই নিয়মিত ভ্রমণ রোধ করিতে পারিত না। তিনি এ সময়ে এমন গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন যে তাঁহার চারিপাশে কি ঘটিতেছে সে সম্বন্ধেও অচেতন থাকিতেন। এ রকম গল্প আছে, একদিন এক দস্যু তাঁহাকে নির্জনে পাইয়া হত্যা করিবার সংকল্প করিয়া, তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া দেখিল রুগ্ন, কৃশ মানুষটি তাহার উপস্থিতি সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অচেতন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সে বিরত হইয়া চলিয়া গেল। চিন্তামগ্ন দার্শনিক জানিতেও পারিলেন না, তিনি কি ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। ভ্রমণ শেষ করিয়া ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ফিরিয়া আসিয়া কাণ্ট আবার পড়ার টেবিলে বসিতেন এবং রাত্রি পৌনে দশটা পর্যন্ত পড়াশুনায় নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি এই সময় এক ঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টা পরের দিনের পড়া ঠিক করিয়া নিতেন। সন্ধ্যার সময় যখন আলো কমিয়া আসিত তখন তিনি বই হইতে মুখ তুলিয়া জানালা দিয়া দূরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, পুরাতন লোবেরনিক্‌ট্

(Lobernicht) গীর্জার চূড়ার দিকে তাকাইয়া যেন অন্য এক লোকের সঙ্গীত শ্রবণে নিমগ্ন থাকিতেন। ইহাতে তিনি অন্তরে এক গভীর প্রশান্তি লাভ করিতেন। এক বৎসর গীর্জার সামনের একটি বাড়ীর বাগানের পপ্‌লার গাছগুলি বাড়িয়া গীর্জার চূড়াটি তাঁহার দৃষ্টি হইতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ইহাতে তিনি এতই মানসিক ক্লেশ বোধ করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার সান্ধ্যধ্যান বিঘ্নিত হইতে লাগিল। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি বাগানের মালিককে সবিনয়ে বিষয়টি লিখিয়া জানাইলেন। তাঁহার প্রতি স্থানীয় অধিবাসীরা এমনই শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন যে পরদিনই সেই গাছের মালিক গাছটিকে ছাটিয়া দিয়া দার্শনিকের দৃষ্টিকে আবার অবারিত করিয়া দিলেন। কাণ্টের মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়া আসিল।

দশটা বাজিবার পনেরো মিনিট আগে কাণ্ট তাঁহার রাত্রের পড়াশুনা সমাপ্ত করিয়া ১৫ মিনিট মন হইতে সমস্ত চিন্তা দূর করিয়া সম্পূর্ণ শান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেন। ঠিক দশটায় তিনি শয্যাগ্রহণ করিতেন এবং অনতি-বিলম্বেই নিদ্রামগ্ন হইতেন। প্রত্যুষে ঠিক পাঁচটা বাজিবার পাঁচ মিনিট আগে ভৃত্য ল্যাম্পে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিত "অধ্যাপক মহাশয়, সময় হইয়াছে।" পাঁচটার সময় দার্শনিক কাণ্ট শয্যাত্যাগ করিতেন এবং আর একটি দিনও ঘড়ির কাঁটার মত পুরাতন দিনের কর্মসূচীর পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিত।

কাণ্ট যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাঁচজন দার্শনিকের মধ্যে একজন বলিয়া খ্যাতি-লাভ করিয়াছেন তাহার কারণ, দার্শনিক কাণ্ট আর মানুষ কাণ্ট ছিলেন অভিন্ন। তাঁহার জীবন ও দর্শনের মধ্যে কোথায়ও কোন ছেদ ছিল না। বার ঘণ্টা অধ্যয়ন অধ্যাপনা, সাড়ে তিন ঘণ্টা আহার গ্রহণ এবং তৎসঙ্গে মন খুলিয়া নানা বিষয়ে আলাপ, একঘণ্টা ভ্রমণ, দৈনন্দিন অন্যান্য কর্মের জন্য আধঘণ্টা, এবং সাতঘণ্টা নিশ্চিন্ত নিদ্রা,—ইহাই ছিল দার্শনিক কাণ্টের ব্যতিক্রমহীন, বৈচিত্র্যহীন দৈনিক জীবনযাত্রার চিত্র। ইহার নাম কি জ্ঞানের জন্য তপস্যা নয়?

রোম্যাণ্টিক রবীন্দ্রনাথ ?

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী মহাসমারোহে উৎসব আয়োজন চলছে। এ উপলক্ষে এ প্রশ্ন হয়তো রূঢ় ঠেকবে কেন আমরা কবিকে স্মরণ করবো? রবীন্দ্রনাথ এমন কিছু কি আমাদের দিয়েছেন যা আমাদের যুগ ও জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়? না কি, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আমাদের জীবনে নিঃশেষিত? আমাদের যুগের সমস্যা, বেদনা বা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে রবীন্দ্র জীবন বা সাধনার কোন যোগ নেই? রবীন্দ্রনাথের মূল্য আমাদের কাছে ম্যুজিয়মে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথির মত, শুধুই ঐতিহাসিক! রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে এ প্রশ্ন তুলেছিলেন 'কল্লোল' ও 'কালি কলম' গোষ্ঠির তৎকালীন নবীন কতিপয় লেখক। তাঁদের অভিযোগ ছিল বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ বড় বেশী দীর্ঘদিন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আসনটি দখল করে আছেন, তাঁর কাছে নূতন আর কিছু প্রত্যাশা করা যায় না, এবং তাঁর উচিত সাহিত্যের আসর থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে নূতন সাহিত্যিকদের পথ ছেড়ে দেওয়া। তাদের মতে 'পূরবী'ই রবীন্দ্রনাথের শেষ সার্থক কাব্য। এই আধুনিকদের চমকে দেবার জন্যই যেন, রবীন্দ্রকাব্যে দেখা গেল আবার নূতন দিকপরিবর্তন,— ভাষা ও ভাব দুদিব থেকেই। তিনি রচনা করলেন 'পরিশেষ', 'পুনশ্চ', 'পত্রপুট', 'শ্যামলী'র 'শেষ-সপ্তকে'র মত নূতন কাব্য: 'ল্যবরেটরী'র মত অত্যাশ্চর্য আধুনিক ছোট গল্প, 'চার অধ্যায়' 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা'র মত নূতন উপন্যাস। আধুনিকদেরও সেদিন মানতে হোল, যে রংছুট এ্যান্টিরোমান্টিক আধুনিকতার দৌড়েও রবীন্দ্রনাথ অতি নবীন সাহিত্যিকদের হার মানিয়ে ছিলেন। রবীন্দ্র-নাথ আধুনিক সাহিত্যিকদের স্পর্দ্ধিত প্রশ্ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই দেখি 'শেষের কবিতা'য় তিনি নিবারণ চক্রবর্তীর জবানীতে নূতনদের প্রতিবাদ ও স্পর্দ্ধাকে নিজেই প্রকাশ করেছেন, 'রবিবাবুর বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো নালিশ, এই যে বুড়ো ওয়ার্ডস্বার্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায় রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চৌকির পা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে, আমাদের কর্তব্য, ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা। রবি ঠাকুরের সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনা রেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মত গোল বা তরঙ্গ রেখা, গোল বা নারীর মুখ

বা চাঁদের ধরনে। নতুনের কাছে চাই কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুর্যাল্জিক্ ব্যথার মতো, খোঁচাওয়ালা, কোনওয়ালা—গথিক-গীর্জার ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়, এমন কি যদি চটকল, পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট্ বিল্ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই। এখন থেকে ফেলে দাও মন-ভোলানো ছলা-কলা ছন্দোবন্ধ,—মন কেড়ে নিতে হবে, যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন যদি কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায়, তবুও তাকে যেতেই হবে।'

'রবীন্দ্রনাথ ধনীর দুলাল, বিলাস ও ঐশ্বর্যের মধ্যে আবাল্য তিনি লালিত, তাই তাঁর জীবনে দুঃখের ছোঁওয়া লাগেনি। তাঁর কাব্য তাই শুধু ললিত ও কোমলের। জীবনের রুদ্র ও ভয়াল দুই সুর তাই তাঁর কাব্যে বাজেনি। তাই তাঁর কাব্য শুধুই সৌন্দর্যবিলাস,—তাতে আছে শুধু চাঁদের জ্যোৎস্না, ফুলের লাবণ্য, বাঁশীর সুর,—এই রকম ধারণা কবি সম্বন্ধে সাধারণের মনে রয়েছে। কবি নিজেই নবীন যৌবনে ভর্ৎসনার সুরে এই প্রশ্ন করেছিলেন নিজেকে, 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়—

> সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত
> তুই শুধু ছিন্ন বাধা পলাতক বালকের মতো
> মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ন বনচ্ছায়ে
> দূর-বন-গন্ধবহ মন্দ গতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
> সারাদিন বাজাইলি বাঁশী।

এ আত্ম-বিশ্লেষণ তাঁর অন্তরে জাগিয়েছে অনুতাপ ও কঠিন সংকল্প—

> এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
> হে কল্পনে, রঙ্গময়ী, দুলায়ো না সমীরে সমীরে
> তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়
> বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জ ছায়ায়
> রেখো না বসায়ে আর।

এবং নিজেকে আহ্বান করে উদাত্তকণ্ঠে কবি বললেন—

> কী গাহিবে, কী শুনাবে, বলো মিথ্যা আপনার সুখ
> মিথ্যা আপনার দুঃখ, স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
> বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।

মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে বহি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে জীবন সর্বস্ব অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

রবীন্দ্রনাথ কি সত্যই শুধু স্বপ্নবিলাসী কবি ছিলেন? তিনি কি কল্পনার গজদন্ত-নির্মিত মিনারে চড়ে শুধুই রঙীন চোখে পৃথিবীকে দেখেছেন? কঠ বাস্তবের কঠিন আঘাত এড়াবার জন্যে অলীক স্বপ্নের মায়ায় নিজেকে ভুলিয়েছেন, অন্যকে বিভ্রান্ত করেছেন;—তিনি ভীরু, এস্কেপিষ্ট? রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাধনার সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন এ অভিযোগ কত অসার। তিনি ধনীর দুলাল সত্য, কিন্তু বিলাস ও আলস্যের মধ্যে তিনি লালিত হননি। ব্যক্তিগত জীবনের কঠিন দুঃখকে তিনি নিবিড়ভাবেই জেনেছিলেন। যৌবনেই তিনি স্ত্রীকে হারিয়েছিলেন। তারপর অল্পদিনের মধ্যে তিনি দুটি সন্তানকেও হারান। সংসারের কর্তব্যকে তিনি ফাঁকি দিয়ে বেড়াননি। যেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি কাব্যসাধনা করেছেন, তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সংসার ও সমাজে বহুবিধ কর্তব্য পালন করেছেন। কি সাহিত্যসেবায়, কি সংসারের কর্তব্যসাধনে, কোথায়ও তাঁর পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বহু উপহাস, নিন্দা, প্রতিকূলতা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। নিজের অন্তরে যাকে সত্য বলে জেনেছেন, যা কর্তব্য বলে জেনেছেন, তা সম্পাদনে তিনি কখনো পরাভূত হননি। অর্থকষ্ট তাঁকে ভোগ করতে হয়েছে, আত্মীয় ও দেশবাসীর বহু গঞ্জনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। ভীরুতা ও অলসতাকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেছেন, ঘৃণা করতে আমাদের শিখিয়েছেন। সমস্ত বিপদ ও বাধার মধ্যে শান্ত ধৈর্য ও পৌরুষের সঙ্গে কি করে অবিচলিত থাকতে হয় সে অভয়মন্ত্র তাঁর পিতার কাছ থেকে তিনি শিক্ষা করেছিলেন। যা ক্ষুদ্র যা তুচ্ছ, যা স্থূল, তাঁকে তিনি কখনও শ্রদ্ধা করেন নি। উপনিষদের শিক্ষাকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি আমৃত্যু সচেষ্ট ছিলেন। সে শিক্ষা হচ্ছে, সমস্ত সুখ ও দুঃখের মধ্যে শান্ত ও ধীর, থাকা। তিনি সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন না। এই ধরণীর রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন। বৈরাগ্য

সাধনে মুক্তি খোঁজেন নি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য তিনি ভোগবাদী বিলাসবিমগ্ন সৌন্দর্য-পিপাসু এস্থেট্ ছিলেন না। জীবনের দুঃখ হলাহলকেও তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী শিবের মত নিঃশেষে পান করেছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয় যে তিনি সৌন্দর্যের মুগ্ধ কবি, অন্য দিকে এ কথাও সমান-ভাবে সত্য যে, তিনি বীর্য্যের সাধক, ভৈরবের উপাসক। তাই মধুর ও কান্ত রস যেমন তাঁর কাব্যে সুর বেঁধেছে, তেমনি রুদ্র ভৈরবের ডমরুধ্বনিও তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে। তাই মধুর ও ভয়াল এ দুই বিপরীত চিত্র তাঁর কাব্যে পাশাপাশি স্থান পেয়েছিল। দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক,—

নূতন জাগা কুঞ্জবনে কুহরি উঠে পিক
বসন্তের চুম্বনেতে বিবশ দশ দিক।
বাতাস ঘরে প্রবেশ করে ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে,
নবীন ফুল-মঞ্জরীর গন্ধলয়ে আসে।
জাগিয়া উঠি বৈতালিক গাহিছে জয়গান,
প্রাসাদ দ্বারে ললিত স্বরে বাঁশীতে উঠে তান।
শীতল ছায়া নদীর পথে কলসে লয়ে বারি,
কাঁকন বাজে, নূপুর বাজে, চলিছে পুরনারী।
কানন পথে মর্মরিয়া ধ্বনিছে গাছপালা,
আধেক মুদি নয়ন দুটি ভাবিছে রাজবালা
'কে পরালে মালা!'

তারি পাশে

দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী
পদ্মাসনে বস আসি রক্তনেত্র তুলিয়া ললাট,
শুষ্ক জল নদীতীরে শস্যশূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে,
উদাসী প্রবাসী
দীপ্তচক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী।
জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নি শিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর—
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার

তিনি দুঃখ, মৃত্যু ও রুদ্রের আহ্বানে নির্ভীক চিত্তে সাড়া দেবার বল চেয়েছেন—

হে রুদ্র তব সংগীত আমি
কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী
মরণ নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয় ডমরু বাজাব।
ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে
তোমার অর্ঘ্য সাজাব।
এসেছে প্রভাত এসেছে,
তিমিরান্তক শিব শংকর
কি অট্ট হাস হেসেছে!
যে জাগিল তার চিত্ত আজিকে
ভীম আনন্দে ভেসেছে॥
জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর
পেতে হবে তব পরিচয়
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি জয়॥

অভয় মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন বলেই কবি সাহস করে বলতে পেরেছেন—

'দুখের বেশে এসেছো বলে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় ক'রে ধরিব হে।

তিনি বিপদ থেকে পালিয়ে যান নি, বিপদকে জয় করবার শক্তিই কামনা করছেন,—

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপ ব্যথিত চিতে, নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥

তাঁর নিবেদন সুখের জন্য নয়, আরামের জন্য নয়, বীর্যের জন্য—

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন—
সকল দীনতা মম করহ ছেদন
দৃঢ় বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
প্রভু মোর। বীর্য দেহো সুখেরে সহিতে
সুখেরে কঠিন করি। বীর্য দেহো দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহো
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি। বীর্য দেহো ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীনজ্ঞান, বলের চরণে
না লুটিতে। বীর্য দেহো চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।
বীর্য দেহো তোমার চরণে পাতিশির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির ॥

আজ আমাদের জীবন নানা দুঃখ, বেদনা, আশঙ্কা ও সংগ্রামে বিপর্যস্ত,কিন্তু সকলের চেয়ে বড় ক্ষতি যে আমরা আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছি; সুখকে আরামকে অতি উচ্চ মূল্য দিয়েছি। কবি আমাদের অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন, সে মন্ত্র স্মরণ করে আবার কি আমরা মরণজয়ের সাহস অর্জন করব? সাহসের সঙ্গে এ প্রার্থনা কি আমরা করতে পারবো?

মোর মরণে তোমার হবে জয়
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল।
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।

মহারুদ্রকে আহ্বান করে বলতে পারবো?

দূর কর মহারুদ্র যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র—
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ ॥
দুঃখের মন্থন বেগে উঠিবে অমৃত,
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।

যদি এ বিশ্বাস, এ গভীর আত্মপ্রত্যয় লাভ করতে পারি, তবে দেখব আজও রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমস্যাজর্জর জীবনে প্রকাণ্ড শক্তি সঞ্চার করতে পারবেন। সমস্ত লোকসানের ভাঙা দরজায় দাঁড়িয়েও আমরা নিঃশঙ্ক আশার সুরে গাইতে পারবো।

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়॥
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে—
জীর্ণ আবেগ কাটো সুকঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক ক্ষয়॥

[রবীন্দ্র জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে নয়া দিল্লী ঈষ্ট প্যাটেল নগর মজলিসে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ]

এ্যারিষ্টোক্র্যাট্ রবীন্দ্রনাথ ?

মার্কস্‌বাদীদের মতে মানুষের দুটি শ্রেণী,—শোষণকারী ধনীর দল, আর বঞ্চিত শ্রমিকের দল। এ দুই শ্রেণীর মধ্যে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে ক্ষমাহীন সংগ্রাম। এই শ্রেণীসংগ্রামই হচ্ছে সমস্ত সাহিত্য, দর্শন, মানুষের সমগ্র চিন্তার পটভূমিকা। প্রত্যেক কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিকই এই শ্রেণীযুদ্ধে কোন না কোন পক্ষ-সমর্থনকারী। বুর্জোয়া সাহিত্যের লক্ষণ হচ্ছে, তা অলীক কল্পনাবিলাসী, রোমান্টিক, অলস আদর্শবাদী। এ সাহিত্যের মুখ অতীতের দিকে ফেরানো, এ সাহিত্য মরণোন্মুখ, বুর্জোয়া স্বার্থের অনুকূল। আর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হচ্ছে বাস্তবানুগ, সংগ্রামী জনতার আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপোষক,—তা গতিবাদ ও শ্রমিকের চূড়ান্ত জয়ে বিশ্বাসী। এ সংজ্ঞার ছকে ফেলে একদিন মার্কসপন্থীরা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এ্যারিষ্টোক্র্যাট্, রোমান্টিক, আকাশচারী। তাঁর সাহিত্য অবাস্তব, জনতার সুখ দুঃখের কাহিনী তাতে স্থান পায় নি। সংগ্রামের সুর তাতে ধ্বনিত হয়নি। কথাটা কি সত্য? রবীন্দ্রনাথ কি জনগণের জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন? তাদের দুঃখ বেদনা ও সংগ্রামে তিনি কোন অংশগ্রহণ করেন নি? এ কথা সত্য যে বাল্যে ও

কৈশোরে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় তাঁর সামান্যই ঘটেছে। জোড়াসাঁকোর ক্ষীয়মান-ঐশ্বর্য বনেদী পরিবারে, প্রাসাদকারার অন্তরালে তাঁর বাল্যজীবন ভৃত্যরাজতন্ত্রের শাসনে অনেকটা নিঃসঙ্গ ভাবেই কেটেছে। সেখানে নিষেধের বেড়াগুলি যথেষ্ট উচ্চ ছিল, তাই জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়েই ঘটেছিল তার বাইরের জগতের সঙ্গে কৃপণ পরিচয়। এত বাধানিষেধ ছিলো বলেই তাঁর কবি মনে জেগেছিল অদম্য কৌতূহল, বাইরের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে। তাই সেই বয়সে প্রকৃতিকে তিনি কল্পনার রঙে রাঙিয়ে দেখেছেন। কিন্তু পিতা দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে বিজ্ঞান চর্চায় রত হয়ে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের রীতিতেও তিনি অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁর পরিবারে সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চার যে আবহাওয়া ছিল তা তাঁর স্ফুটোন্মুখ প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু মানুষের প্রীতির বৃহৎ পরিবেশের একটা প্রকাণ্ড অভাব ছিল। তাঁর বুভুক্ষিত হৃদয় পারিবারিক সম্বন্ধের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে পরিপূর্ণ পুষ্টির প্রাণরস খুঁজে পাচ্ছিল না। কিন্তু এই শৃংখলিত বাল্যকালেও তাঁর স্বভাবজ মানবপ্রীতির পরিচয় মেলে তাঁর পরিবারের ভৃত্যদের সঙ্গে তাঁর প্রীতিস্নিগ্ধ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। এ নগণ্য মানুষদের কথা কতখানি আত্মীয়সুলভ দরদের সঙ্গে তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলায়'। তাঁদের সম্বন্ধ প্রভুভৃত্যের হৃদয়হীন সম্বন্ধ ছিল না। এই অশিক্ষিত বেতনভুক্ ভৃত্যদের শিশু রবি একান্ত আপন জন বলেই জেনেছিলেন।

কৈশোরে কলকাতার স্কুলে ভর্তি হয়ে তিনি কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বাদ পেলেন না। মুখচোরা লাজুক কিশোরটি প্রাণ খুলে অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে পারলেন না। শিক্ষকদের কাছেও তিনি পেলেন না উষ্ণ প্রাণের স্পর্শ বা আদর্শ জীবনের ইঙ্গিত। তাঁকে লেখাপড়ার জন্য বিলেতে পাঠানো হ'ল। যদিও বিদ্যালাভের দিক দিয়ে তিনি খুব লাভবান্ হলেন না কিন্তু মানুষকে একটি বৃহত্তর পটভূমিকায় তিনি দেখলেন। কিন্তু সে দেখার মধ্যেও রইল অপরিচয়ের দূরত্ব। দেশে ফিরে আসার পর পিতার নির্দেশে তিনি বিস্তৃত জমিদারী দেখাশোনা করবার জন্যে পদ্মার তীরে শিলাইদহে গিয়ে রইলেন। এইবার ঘটলো তাঁর জীবনে সত্যিকার প্রকৃতি ও মানুষের অন্তরঙ্গ সঙ্গ। একদিকে খরস্রোতা পদ্মা যেমন তার মনভোলালো, তেমনি জমিদারীর অন্তর্গত সরল গ্রাম্য মানুষগুলিও তাঁর হৃদয়কে প্রবলভাবে আকর্ষণ করলো। তিনি

সাধারণ মানুষের অনাড়ম্বর অথচ বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে একটা নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করলেন। তিনি তাঁদের হৃদয়ের কাছে এগিয়ে গেলেন, জানলেন তাঁদের দুঃখ সুখের কাহিনী, প্রত্যক্ষ করলেন তাঁদের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, মূঢ়তা, অসহায়তার মধ্যেও তাঁদের অকৃত্রিম প্রীতি, স্নেহ, স্বার্থত্যাগ ও মহত্ত্ব। তিনি চাইলেন তাঁর প্রজাদের মধ্যে আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা জাগিয়ে তুলতে; চেষ্টা করলেন তাঁদের সমবেত চেষ্টায় গ্রাম পরিবেশকে সুস্থ, পরিচ্ছন্ন রুচিসম্মত করে গড়ে তুলবার আগ্রহ জন্মাতে। একদিকে অনুপম কাব্যসৃষ্টি, আর একদিকে শুভ কর্মোদ্যমে জীবনকে তিনি প্রসারিত করে দিলেন। এই সময়ই সৃষ্ট দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের নিয়ে রচিত, মানুষের প্রতি অসীম মমতাপূর্ণ তাঁর গল্পগুচ্ছ—পোষ্ট মাষ্টার, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, হালদার গোষ্ঠি, মধ্যবর্তিনী, জীবিত ও মৃত ইত্যাদি।

শিলাইদহে থাকা কালীনই, তিনি একথা খুব ভালকরে বুঝতে পারেন যে দেশের দুদশার একটি মূল কারণ, শিক্ষার অভাব। নিজ দুঃখময় অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি আরও বুঝেছিলেন যে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত প্রাণরস জোগাতে পারছে না, এ শিক্ষা সুন্দর মানুষ গড়ে তুলবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এ শিক্ষা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, আনন্দহীন এবং শিশুমনের স্বাভাবিকসৃজনীস্পৃহাকেউদ্বুদ্ধ করে না। তাঁর বড ছেলে রথীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য সন্তানদের শিক্ষার সমস্যা তাকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে ভাবিত করে। এবং শিলাইদহে নিজে শিক্ষকতার ভার নিয়ে নিজের সন্তানদের সঙ্গে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে আনন্দময় শিক্ষার নূতন পরীক্ষায় তিনি রত হন। এ পরীক্ষাই ভবিষ্যতে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের সূচনা। এই সূচনা সম্বন্ধেই পরে এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "কোন জিনিসের আরম্ভ কি করে হয় তা বলা যায় না। সে আরম্ভ কালটি রহস্যে আবৃত থাকে। আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পদ্মার বোটে কাটিয়েছি, আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের চক্র-বাকের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। হয়তো চিরকাল এই ভাবেই কাটাতুম। কিন্তু মন হঠাৎ কেন বিদ্রোহী হল, কেন ভাবজগৎ থেকে কর্ম জগতে প্রবেশ করলাম?......আমি বাল্যকালে শিক্ষা ব্যবস্থায় মনে মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত, আঘাত করত, যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় আমি ভুলতে পারিনি। কারণ, প্রকৃতির পক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে

বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশু চিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। আমরা যাদের শিশু প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে আর মাষ্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে, আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাষ্টারেরা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত। প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে বিদ্যালাভ করা যায়, এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।......আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকারদান করার জন্যে আমি নিজেই কৃতসংকল্প হলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা হল, আমি ছেলেদের খুশি করব, প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে, এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণনিকেতন নীড় তৈরী করে তুলব।" তাঁর এ সংকল্পকেই তিনি বাস্তবরূপ দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়। এটা নিছক কাব্যিয়ানা ছিল না। দেশকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন বলেই এই অভিনব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলবার মস্ত দায় তিনি স্বেচ্ছায় ঘাড়ে নিয়েছিলেন। অনেকখানি স্বার্থত্যাগ তাকে করতে হয়েছিল, কিন্তু সে কথাটা আমাদের দেশের অনেক মানুষই জানেন না। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে লিখেছেন "তখন আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল।...সে দেনার পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রী কিছু কিছু সওদা করে অসাধ্য সাধনে লেগে গেলাম। আমার ডাক দেশের কোথাও পৌছায়নি।" এমন কি এই বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয় বহন করবার জন্যে স্ত্রীর অলঙ্কারও তিনি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে যখন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁর পুস্তকের সমস্ত উপস্বত্ব তিনি বিশ্বভারতীকে দান করেন। কেন তিনি এতবড় দায়িত্ব নিয়েছিলেন? এ কি বড়লোকের ক্ষণিক খেয়াল মাত্র? না, এ ছিল তাঁর জীবনের সাধনারই অঙ্গ। দেশকে বড়ো করে ভালবেসেছিলেন বলেই তিনি চেয়েছিলেন দেশের ছেলেমেয়েদের একটা বৃহৎ আদর্শ অনুযায়ী সম্পূর্ণ মানুষ করে নিজ সাধ্যানুযায়ী গড়ে তুলতে। তাঁর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন "আমাদের দেশবাসীরা 'ভূমৈব সুখম, এই ঋষি-বাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং, তাই জ্ঞান তপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার

করেও উত্তরমেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে, আফ্রিকার অভ্যন্তর প্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করেছে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম জ্ঞান ও ভাবের সাধন পথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা জেনেছেন যে ভূমৈব সুখং দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। আজ আমরা সে কথা ভুলেছি, তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবন যাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই দিন কাটছে। বিদ্যালয় স্থাপন করবার সময়ে প্রথমেই আমার একথা মনে হল যে আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে, ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে হবে।" শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের একজন হয়ে তাদের মধ্যেই সপরিবারে বাস করেছেন। এ ছাত্রদের জন্য তাঁর দরদের অন্ত ছিল না। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন "আমি পাঁচ ছয়টি ছেলে নিয়ে জামগাছ তলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশি বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি, তাই করেছি। সেই ছেলে কয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে, ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি, তাদের হাসিয়েছি, কাঁদিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের মানুষ করেছি। ১৩৪২ সনে ৮ই পৌষ আশ্রমের প্রার্থনান্তে উপদেশে বলেছেন, "ছেলেদের জন্যে নতুন রকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্যে নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায়, এজন্যে তাদের চিত্ত বিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি, তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। তাদের আপন অন্তরের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কোন নিয়ম দ্বারা পিষ্ট না হয় এই আমার মনে অভিপ্রায় ছিল।" এই যে ছাত্রগত-প্রাণ দরদী শিক্ষক, তাঁকে কি ধনমদমত্ত দরিদ্রের শোষক এ্যারিষ্টোক্র্যাট্ বলে আমরা ঘৃণা করব?

লর্ড কার্জন যখন প্রবল জনমতকে উপেক্ষা করে বঙ্গদেশ বিভাগ করলেন তখনই অত্যাচারী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংঘবদ্ধ সংগ্রাম বাংলা দেশে দেখা দিল। বাংলার বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদকে ভাষা দিলেন কবি; স্বদেশী আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর প্রাণমাতানো গান দিয়ে বাংলা দেশের দিকে দিকে দেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিলেন। বাংলাদেশের আবেগ চঞ্চল মানুষদের ক্রুদ্ধ শাসকের সমস্ত অত্যাচার লাঞ্ছনা সহ্য করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। এক নূতন আত্মমর্যাদায় জাগ্রত হয়ে দেশ

স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেদিন কবি দূরে সরে থাকেন নি, পিককুহরিত কাব্যকুঞ্জে আত্মগোপন করে থাকেন নি। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে লক্ষ লক্ষ প্রাণ দেশ-মাতৃকার আবাহন সঙ্গীত গাইল,

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

আবার গাইল,

ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা

তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে, বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।

সংগ্রামী জনতা দেশের স্বাধীনতার জন্যে মরণ পণ করল,

আমি ভয় করব না, ভয় করব না।

দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না॥

তরীখানা বাইতে গেলে, মাঝে মাঝে তুফান মেলে—

তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না॥

শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে—

সহজপথে চলব ভেবে, পড়ব না, পাঁকের পরে পড়ব না॥

ধর্ম আমার মাথায় রেখে, চলব সিধে রাস্তা দেখে—

বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না॥

কিন্তু শুধুই উত্তেজনা, শুধুই আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথের স্বভাব বিরোধী ছিল। তিনি চাইলেন দেশ-প্রেমের এ গভীর আবেগকে গঠনাত্মক রূপ দিতে। দেশের সকল সম্প্রদায়কে হৃদয়ে হৃদয়ে এক করবার জন্যে করলেন রাখীবন্ধন উৎসব প্রবর্তন। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধলো,—তারা চাইল ইংরেজের দুষ্টভেদনীতিকে বিকল করতে

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে?

দেশের মরণোন্মুখ শিল্পগুলি যাতে পুণরুজ্জীবীত হয়, স্বদেশী জিনিষ যাতে দেশের মানুষ ব্যবহারে উৎসাহিত হয়, তাই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী মেলার আয়োজন করলেন। অবশ্য স্বদেশী যুগের অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের পরিবারে স্বদেশী মেলার অনুষ্ঠান হয়ে ছিল। গ্রাম সংস্কার ও সংগঠনের কথা রবীন্দ্রনাথ এ সময় থেকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে থাকেন। পরবর্তীকালে তা রূপ নেয়, সুরুলে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠায়। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন

ক্রমেই হিংসা ও গোপন হত্যার বাঁকা পথে চলল। এখানে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ ঘটলো। রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন উদ্ধত শাসকের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তেমনি আবার জোর করে ব্যবসায়ীদের বিলিতী কাপড় পোড়ানো লবণধ্বংস, দেশসেবার নামে পিস্তল দিয়ে ইংরেজ হত্যা ও স্বদেশী ডাকাতিরও নিন্দা করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক মতামত 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম,' 'স্বদেশ ও সংকল্প' ইত্যাদি প্রবন্ধে স্পষ্টই তিনি প্রকাশ করেছেন। 'গোরা' 'ঘরে বাইরে' ইত্যাদি উপন্যাস ও পরবর্তী কালে লেখা 'চার অধ্যায়' এই স্বদেশীযুগের পটভূমিকায় লেখা। এ নিয়ে তিনি বিপ্লবী ও উগ্রপন্থীদের কাছে বহু গালাগাল খেয়েছেন, কিন্তু যা সত্য, বলে জেনেছেন, তার থেকে তিনি কখনও বিচলিত হন নি। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নি সত্য কিন্তু এ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন কখনই ছিলেন না। কুখ্যাত রাউলাট এ্যাক্ট যখন দেশের রাজনৈতিক নেতাদের বিহ্বল করেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথই সাহস করে কলকতার টাউনহলে প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন। জালিনওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড তাঁকে এতই বিচলিত করেছিল যে, তিনি বড় লাটের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ইংরেজ শাসকের দেওয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করলেন। সেই অগ্নিস্রাবী ঐতিহাসিক পত্র তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেমের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এটাও আমরা বুঝতে পারি প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার ঘৃণা কত প্রবল ছিল, এবং বুঝতে পারি মনুষ্যত্বের অবমাননায় তাঁর গভীর অন্তর্বেদনা। এই ধীর শান্ত মানুষটির ধৈর্য সীমা হারিয়েছিল যে দিন বক্সা বন্দীশালায় পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে এক তরুণ অন্তরীন প্রাণ হারায়। সেদিন এই ভগবদ্ভক্ত অন্তহীন ক্ষোভে প্রশ্ন করেছেন—

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি, প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু, তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশী সঙ্গীত হারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে ;
তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?

তিনি ছিলেন বীর্যের সাধক, তাই অক্ষমতা, ভীরুতা, দুর্বলতাকেও তিনি প্রশ্রয় দেন নি। যেমন প্রতিবাদ করেছেন প্রবলের অত্যাচারের, তেমনি নিন্দা করেছেন কাপুরুষতাকে। তিনি তাই বলেছেন—

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

দেশের বীর নেতাদের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধার অকৃত্রিম প্রকাশ 'শিবাজী উৎসব', 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহো নমস্কার' 'গান্ধীজি' ইত্যাদি বিভিন্ন কবিতায় ও প্রবন্ধে। ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শকে দেশ ও বিদেশে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর চেয়ে বেশী প্রচেষ্টা কে করেছেন ? শুধু বীর কেন, সমস্ত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাই তাঁর কাছে ছিল স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম। তাই বিশ্বভারতীতে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সমস্ত বিশ্বকে। বিশ্বভারতীর আদর্শ ছিল জ্ঞানে, প্রেমে, শুভকর্মে সমস্ত বিশ্বকে একতার বন্ধনে যুক্ত করা। বিশ্বভারতীতে তাই সমগ্র বিশ্ব খুঁজে পেয়েছে এক নীড়—'যত্র বিশ্বম্ভবত্যেকনীড়ম্! আজ যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী শতবার্ষিকী উৎসব সমস্ত দেশে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এমন আনন্দের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তার কারন কি এই নয় যে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে তিনি তাঁর জীবনে ও কাব্যে উপযুক্ত মর্যাদার আসনে স্থান দিতে প্রয়াস পেয়েছেন ? তবু কি মানতে হবে রবীন্দ্রনাথ গর্বিত এ্যারিষ্টোক্র্যাট ?

হ্যা, রবীন্দ্রনাথ এ্যারিষ্টোক্র্যাট। কিন্তু সে এ্যারিষ্টোক্র্যাসী ধনের নয়, ঐশ্বর্যের নয়। রবীন্দ্রনাথ এ্যারিষ্টোক্র্যাট্ তাঁর প্রতিভার দীপ্তিতে। পৃথিবীর মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধরদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার, অঙ্কনবিদ্! প্রতিভার এত বিচিত্র বিকাশ পৃথিবীর আর কোথাও দেখা গেছে কিনা সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথ এ্যারিষ্টোক্র্যাট্, তাঁর সূক্ষ্ম পরিমিতি বোধে, তাঁর শোভন

রুচিতে। সত্য ও সুন্দরের সাধনা তাঁর জীবনে এক হয়ে মিশেছিল। তিনি লিখেছিলেন—

'সত্য তার সীমা ভালবাসে
সেথায় সে মিলে আসি
সুন্দরের পাশে।'

নারীর সৌন্দর্য ও প্রেম সমস্ত কাব্যেরই প্রধান উপজীব্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যেও তাঁর স্থান সংকীর্ণ নয় কিন্তু তাঁর কাব্য কোথায়ও সুরুচির সীমা অতিক্রম করেনি। তাঁর 'উর্বশী' কবিতা নারী সৌন্দর্য্যের অপূর্ব প্রকাশ। পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতে পৃথিবীর প্রেমের কাব্যে এ কবিতার তুলনা নেই।

সুর সভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্য শীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা,
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে॥

'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা' অনিন্দিতা স্বর্গের অপ্সরার অসম্বৃত মদির রূপ বর্ণনায়ও তিনি অসামান্য সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। যে প্রেম দেহ সম্পর্কের স্থূল সীমার মধ্যে আবদ্ধ, 'যে প্রেম সম্মুখপানে চালাতে চলিতে নাহি জানে'—যে প্রেম ধুলার মাঝে, পঙ্কের মাঝে, মানুষকে টেনে নামায়,—সে প্রেম রবীন্দ্র-সাহিত্যে ধিক্কৃত। তাই 'মহুয়া'তে তেজস্বিনী নারী বলছে—

শ্লথ প্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না।
লোলুপ সে লালায়িত ; প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা
ক্লেদঘন চাটুবাক্যে ; বাষ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তার,
কলুষ কুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার ;
আলোকবঞ্চিত তার অন্তরের কাণায় কাণায়
দুষ্ট ফেন উঠে বুদ্‌বুদিয়া,—ফেটে যায়, দেয় খুলি,

রুদ্ধ বিষ বায়ু। গলিত মাংসের যেন ক্রিমিগুলি
কল্পনা বিকার তার শিথিল চিন্তার তলে তলে
আকুলিতে থাকে কিলিবিলি। যেন প্রাণপণ বলে
মন তারে করে কশাঘাত। জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ্য করে, লজ্জিত দেবতা তারে দূষে
অসহ্য সে অপমানে। নারী সে যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।

নারীর দুই রূপ,—মোহিনী ও পূজারিণী। এই দুই রূপেরই বর্ণন. দিয়েছেন কবি 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতায়, কিন্তু শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিলেন তিনি কল্যাণী পূজারিণীকে—

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে॥

'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে মণিপুর রাজকন্যা বীর অর্জুনের প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় মদনের কাছে প্রার্থনা করলেন বরতনু। মদন সে প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। দেহের সে রূপের কাছে অর্জ্জুন আত্মবিক্রয় করলেন,—বিহ্বল অর্জ্জুন বললেন—

লহো মোর খ্যাতি
লহো মোর কীর্তি
লহো পৌরষ গর্ব
লহো আমার সর্ব।

অর্জুন ভুললেন, সব বিসর্জন দিলেন রূপসী রাজকন্যার পায়—

নিজের এই ছলনায় চিত্রাঙ্গদার নারীত্ব ক্ষুন্ন হল। মদনের কাছে প্রার্থনা করলেন তার মিথ্যা রূপের এ বর ফিরিয়ে নিতে। নারীত্বের তেজে মহিয়সী, রূপহীনা চিত্রাঙ্গদা নিজ রূপে অর্জুনের সামনে এসে বললেন,

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্র-নন্দিনী
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।

পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে, সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে, সে নহি নহি,
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন,—
আমি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্র নন্দিনী।

রবীন্দ্রনাথ নারীকে দিয়েছেন পুরুষের মত সমান মর্যাদা, দিয়েছেন তাকে শুচিতার আবরণ, দিয়েছেন তাকে বীর্যবতীর মহিমা। নারীর সম্পর্কে এ শ্রদ্ধা কবির এ্যারিষ্টোক্র্যাট্ মনের পরিচায়ক সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথ এ্যারিষ্টোক্র্যাট্, তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদা বোধে। তিনি ভদ্র, সদাশয়, মিষ্টভাষী, সুরসিক ছিলেন কিন্তু তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল এক দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্ব, নিঃসঙ্গ একাকীত্ব যা অতিক্রম করে, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার সাহস ও সাধ্য খুব অল্প কয়েকজনেরই হয়েছে। মানুষকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেন কিন্তু গলাগলি ঢলাঢলি তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি জানতেন তাঁর এই দূরত্ব তাঁকে সরিয়ে রেখেছে যাঁরা কাজ করে তাদের কাছ থেকে। এ নিয়ে তাঁর মনে বেদনা ছিল,

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক

* * * * *

সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবন যাত্রার।
চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—

বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গনের ধারে ;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা।
না হ'লে, কৃত্রিমপণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে, হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

কিন্তু এ বেদনা সত্ত্বেও যে শ্রমিকদের জীবনকে তিনি সত্য করে জানেননি, যাদের সুখদুঃখের ভাগ নেন নি, তাদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করে 'শৌখিন মজদুরী'র সস্তাভঙ্গী তাঁর এ্যারিষ্টোক্রাটিক্ রুচিতে বেধেছে। তিনি স্বাগত অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন অনাগত যুগের সেই অখ্যাত জনের নির্বাক মনের কবিকে—

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন।
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারিনি দিতে, নিত্য আমি থাকি তার খোঁজে।
মূক যারা দুঃখে সুখে'
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাদের বাণী যেন শুনি
আমি বারে বার
তোমারে করিব নমস্কার।

রবীন্দ্রনাথ এ্যারিষ্টোক্র্যাট, কারণ তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতায় প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাসী। তাই সস্তা হাততালির লোভে তিনি জনগণের পূজার মন্ত্রে যোগ দেন নি, জনতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারেন নি। অসহযোগ আন্দোলনের তীব্র উত্তেজনার মুখে তিনি মহাত্মা গান্ধীর মত ও পথের বিরুদ্ধে সাহস করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন দেশের বিদ্যালয়গুলিকে গোলামখানা বলে ভেঙ্গে দেবার আন্দোলন প্রবর্তন করলেন, তাঁর মন তাতে সায় দেয় নি। তিনি বাধা দিয়েছিলেন। দেশের লোকের কাছে সে জন্যে গাল যথেষ্ট পেয়েছেন কিন্তু নিজ স্বাধীন মতে অবিচল থেকেছেন। যা শুধুই উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যা নেতিবাচক যা ধ্বংসাত্মক, তাকে কল্যাণকর বলে তিনি কখনও স্বীকার করতে পারেন নি। তিনি রাশিয়ায় গিয়ে সেখানে রাষ্ট্র মানুষকে কী অসামান্য মর্যাদা দিয়েছে, সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষা ও জীবিকার সমস্ত দ্বার অবারিত করে তাদের জীবন যাত্রার কেমন কী অভূতপূর্বভাবে উন্নত করেছে, তা নিজ চোখে দেখে এসে সে বিপুল সাহসী পরীক্ষাকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন, কিন্তু মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও তার প্রকাশ সঙ্কোচনের যেখানে চেষ্টা হয়েছে, তার নিন্দা করতেও তিনি পশ্চাৎপদ হয় নি।

মজার কথা এই, একদিন যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে এ্যারিষ্টোক্র্যাট বলে অপাংক্তেয় করবার চেষ্টা করেছিলেন আজ তাঁরাই রবীন্দ্রনাথকে জনগণের শ্রেষ্ঠ কবি বলে সম্মান দিচ্ছেন, তাঁর সাহিত্যে শ্রেণী-সংগ্রামের সুর আবিষ্কার কচ্ছেন। সোভিয়েট রাশিয়ায় রবীন্দ্র জন্ম শত-বার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহের সঙ্গে উদযাপিত হচ্ছে। ৫ই মে থেকে মস্কোর লেনিন্ লাইব্রেরীতে কবির সমস্ত বই ও ছবির প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে, তাতে ইতিমধ্যে বহু সহস্র লোক কবির শিল্পীকর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছেন। ৫ই থেকে ৭ই মে ক্রেম্লিন জাতীয় নাট্যশালায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য 'চিত্রা' ব্যালে নৃত্য মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে, শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালনীর সাহচর্যে। রাশিয়াতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ ৩০ লক্ষ খণ্ড বিক্রী হয়েছে। বার খণ্ডে কবির সমগ্র লেখার নূতন রাশিয়ান অনুবাদ ছাপা হচ্ছে, আঠারটি বিভিন্ন ভাষায়। কোন বিদেশী লেখক রাশিয়ায় ইতিপূর্বে এতখানি সম্মান লাভ করেন নি। দেশের শ্রেষ্ঠ কবি নিকোলাই টিখিনভ্ রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের সভাপতি হিসাবে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। তিনি বলেছেন "বহু দূরবর্তী রহস্যময় ভারতবর্ষ

সম্পর্কে রাশিয়ার জনগণের কৌতূহল খুব সামান্যই পরিতৃপ্ত হয়েছিল। অবশেষে আসলেন এ মানুষটি, যিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, নাট্যকার, দার্শনিক, এবং জননেতা,—যিনি যুদ্ধকরে গেছেন শান্তির জন্য এবং যিনি ছিলেন সেভিয়েট জনগণের প্রকৃত বন্ধু। উপসংহারে তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ আমাদের এমন এক জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন যা ছিল আমাদের অজ্ঞাত। আমরা জানলাম ভারতবর্ষের মহৎজীবন ও ভাবাদর্শকে। পূর্বে ও আমরা জানতাম এ বিরাট দেশের প্রাচীন সুমহান ঐতিহ্যের কথা। কিন্তু এবার এই দেশের অন্তরকে জানলাম,জানলাম এর উদার, উৎসুক, সত্যসন্ধিৎসু অপার করুণাময় হৃদয়ের তীব্র আকুলতাকে,—সে দেশের শ্রেষ্ঠ চারণ, মহত্তম সন্তানের কাব্য কীর্তির মধ্য দিয়ে।" হয়তো বা অতঃপর আমাদের দেশের মার্কস্ বাদীদের কাছে রবীন্দ্রনাথের বুর্জোয়া এ দুর্নাম ঘুচবে এবং তিনি শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবির সম্মানলাভ করবেন।